মিলন-মন্দির।

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন-ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

সন ১৩১৭

মূল্য ১৷৷০ [illegible]

কলিকাতা,
শ্যামবাজার, ৫ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য-প্রতিভার পুণ্য-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মিলন-মন্দির" উপন্যাসখানির প্রকাশক। তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুন্দর করিয়া উপন্যাস-খানিকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি নিজে যেমন কোন গ্রন্থেরই প্রুভ দেখিতে পারি নাই, এ গ্রন্থেরও তেমনই পারি নাই;—সেই জন্য এবং বহুবিধ অনিবার্য্য কারণে ইহাতে কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করি। ইতি—

অনন্তপুর,
১৩১৭ বঃ, ২রা পৌষ। } শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

Emerald Printing Works.

মিলন-মন্দির।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"বাবা. একটা কথা বলিব বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি"—এই বলিয়া মাতা পার্শ্বোপবিষ্ট প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র যতীশচন্দ্রের মস্তকে হস্তামর্শন করিলেন।

সে গৃহে আর কেহ ছিল না। তখন রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত। পিত্তল-পিলসুজে মৃণ্ময়-প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এবং একটা ক্ষুদ্র ঘটিকা টীক্‌টীক্ করিতেছিল।

যতীশচন্দ্র মাতার মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কি ?"

পুত্র যে প্রকার স্বরে উত্তর করিলেন, মাতা সেরূপ প্রত্যাশা করেন নাই। সেই স্বর-বিভঙ্গীতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, যাহা বলিবার জন্য পুত্র-সকাশে আগমন করিয়াছেন, পুত্র মনে মনে তাহার বিপরীত ভাব পোষণ করিতেছে। তিনি নিরস্ত হইলেন না। বলিলেন,—"তোমাদিগকে নিতান্ত নাবালক রাখিয়া কর্ত্তা স্বর্গারোহণ করেন। সেই হইতে কত কষ্ট—কত পরিশ্রমে, কত লোকের তোষামোদ

করিয়া—কতদিন পেটে কিছু না দিয়া, কত রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া যে, তোমাদিগকে বড় করিয়াছি,—তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু নগরে উঠিতে মুগুরের বাড়ী পড়িল।

নবীন আমাকে ফাঁকি দিল। তোমরা চারি রত্ন আছ—ভগবান্ তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন,—তোমাদের কাছে অনুরোধ, আমি যে কয়দিন পৃথিবীতে থাকি, তোমরা পৃথক্ হইও না। আমি পাতা কুড়াইয়াছি—আগুন পোহাই নাই।”

যতীশচন্দ্র বলিলেন,—“কে পৃথক্ হইতে চাহিতেছে? তবে তোমার ছেলেরা বারমাস বসিয়া খাইবে, আর ভাই ভাই যদি কোন একটা কথা বলিবে—তবেই বধূমাতারা একবারে তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিবেন, সেটা'ত ভাল নয়।”

মাতা করুণ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—“বাবা, এখন তুমিই সকলের বড়। তুমিই সকলের মুরুব্বি—তুমিই মাথাধরা,—তুমি স্থির না হইলে কে স্থির হইবে? বুঝিতেছি, একা রোজগার করিয়া কর্ত্ত করিবে খরচও অত্যন্ত—কিন্তু ক্ষিতীশকে চাষ-বাসের কাজ করিতে আদেশ করিয়াছ, সে তাহাই আরম্ভ করিয়াছে—যদি সুবিধা হয়, সাহায্য পাইবে। দীনেশকে লেখাপড়া শিখাইতেছ—সে প্রাণপণে তাহাই করিতেছে। তবে পাঁচকড়ি—সে সকলের ছোট—তুমিই তাহাকে আদরযত্নে করিয়া এখনও পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতে দাও নাই—কখনও কোন কাজ-কর্ম্মও করিতে দাও নাই—কাজেই সে সেইরূপেই বেড়ায় এতদিন যদি সহিয়া আসিয়াছ, আরও কিছুদিন সও। শীঘ্রই উহারা তোমার হাতধরা হইয়া উঠিবে।”

যতীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,—“না মা, আমি অর্থের জন্তে ভাবি না। যেমন রোজগার হইবে, তেমনই সকলে খাইবে

অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই,—কিন্তু কথা জন্মায় কেন? একটা লোককে অমন করিয়া জ্বালান হয় কেন?

'একটা লোক' অর্থে, যতীশচন্দ্রের গৃহিণী শ্রীমতী মৈত্রাঙ্গিনী দেবী। মাতা সে অর্থ সহজেই বুঝিলেন। বলিলেন,—"মেজ বউমাও একটু খিট্‌খিটে আছেন,—ধাঁ করিয়া সকলকে যথেচ্ছা তাই বলেন। [illegible] কার বউ ঝি কি এত সয়?"

যতীশ। না সহিলে চলিবে কেন মা? যে খিট্‌খিটে আমার তা'র খোসামোদ করিয়া চলিলে দোষ কি?

মা। তা' কি বাবা একজন যে, বুঝিয়ে রাখিব! পাঁচজনের পাঁচ মুখ। যাহি হোক্ বাবা, তুমি কোন রকমে বিচলিত হইও না। মেয়ে মানুষ কত কথা বলে,—কত হয়, তুমি আমার বাসুকী—তুমি নড়িলে সব রসাতলে যাইবে।

যতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,—"আমি বাপু বাড়ীও থাকি না, তোমাদের গোলযোগের মধ্যেও নহি। তবে বাড়ী আসিলে নানারকম শুনিতে পাই, কাজেই মনে বড় অশান্তি জন্মায়।"

মা। তা আমি বুঝি—কিন্তু তুমি জানিও, আমি যখন আছি তখন কাহারও প্রতি অন্যায়—অবিচার হইতে পারিবে না। সকল ভার আমার স্কন্ধে দিয়া তোমরা অর্থ ও বিদ্যা-অর্জ্জন চেষ্টা কর। সব সংসারের খুঁটি-নাটিতে তোমরা মাথা দিবে কেন?

যতীশ। সেজো বৌমা নাকি কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন?

মা। হাঁ,—তা' তিনি যাহাতে শান্ত হন, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছি। তোমাকে এ সকলের কোন বিষয়েই নজর দিতে হইবে না।

যতীশ। শুনিলে যে রাগ হয়।

মা। মেয়ে মানুষের সব কথা আবার সত্যিও নয়; তা শুনিয়া রাগ করাও উচিত নয়।

যতীশ। তা কি আর আমি জানি না। আমরা মানুষ চরাইয়া খাই।

মা। তাই বাবা, যাতে মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে—যাতে পাঁচজন মানুষ বলিয়া মান্য করে, তাহাই করিও। তুমি বুদ্ধিমান্,—তুমিই আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা।

যতীশ। না না,—আমি কি আর সহজে ওসব কথা কাণে করি? যাক্, আমি কাল ভোরেই বাড়ী হইতে যাইব,—খোকার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। শুনিয়াছি নাকি, কাজ লইয়া থাকাতে খোকার খোয়ার হয়।

মা। সেও কি একটা কথা? খোকার খোয়ার হইবে! আমার বংশের তিলক—কুলের বাতি, আমি থাকিতে তাহার খোয়ার! না বাবা, সে কথা তুমি কাণেও তুলিয়ো না। একেত' মেজবৌমা সংসারের কাজেতে বড় একটা যান না; তা'র উপর খোকা সকলের যত্নের ধন—বিশেষতঃ পাঁচকড়ির গলার হার। সে বুক হইতে একদণ্ডও নামায় না। হাঁ বাবা, তোমার কাল না গেলে হয় না?

যতীশ। না মা, পরের চাকুরী করিলে কি নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করা যায়! বিশেষতঃ এখন কিস্তীর সময়—লাট সম্মুখ।

এই সময় শ্বেতাঙ্গিণী দেবী গৃহমধ্যে আগমন করিয়া সুখ-সুপ্ত খোকা ওরফে শ্রীমান্ শচীশচন্দ্রকে খট্টার উপরে শায়িত করিয়া প্রদীপের হীনজ্যোতি সলিতা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন. এবং আড়ালে থাকিয়া যে শ্বশ্রূ ও স্বামীর কথা শুনিয়াছেন এবং শুনিয়া যে, কিঞ্চিৎ রুষ্টা হইয়াছেন, তাহা তাঁহার গর্ব্বিত গমনে মাতা-পুত্র উভয়কেই জানাইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুপ্তোত্থিত বালক শচীশচন্দ্র বায়না লইল,—"ছোট কাকার কাছে যাব।"

তখন রাত্রি অনেক। চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিস্তব্ধ পল্লী ধীর নৈশ-সমীরে সুশীতল। ক্বচিৎ আম্রশাখাসীন পাপিয়াবধূ এক একবার চীৎকার করিয়া তাহার বাঞ্ছিত-পাশে প্রিয়কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। গৃহে গৃহে নর-নারী নিদ্রা যাইতেছিল।

শচীশচন্দ্রের আব্দার থামিল না। স্বামী স্ত্রীতে কত বুঝাইলেন,—কত ভুলাইলেন—কত খেলানা—খাবার দেখাইলেন, কিন্তু বালক বুঝিল না। শেষে রোদন আরম্ভ করিয়া দিল,—কিছুতেই সে রোদনের নিবৃত্তি হইল না।

যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"এমন ছেলেত' দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে কি এইরূপই করে?

বিরক্তিস্বরে শ্বেতাঙ্গিনী বলিলেন,—"মধ্যে মধ্যে কি, রোজ রাত্রেই একবার যাওয়া চাই-ই। এক এক দিন তার কাছেই পড়িয়া থাকে।"

যতীশ। এখন উপায় কি?

শ্বেতাঙ্গিনী ডাকিয়া ছেলে দাও।

যতীশ। পাঁচকড়ি বুঝি চণ্ডীমণ্ডপে শোয়?

শ্বেতাঙ্গিনী। হাঁ।

যতীশচন্দ্র তখন দরোজা খুলিয়া বাহির হইলেন, এবং বহির্ব্বাটীতে যাইয়া পাঁচকড়িকে ডাক দিলেন। পাঁচকড়ি তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, দাদার ডাক শুনিয়া উঠিয়া বসিল—তারপরে দাদার

মুখে খোকার কান্নার কথা শুনিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে গমন করিল।

গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল,—ছোট কাকাকে দেখিয়া শচীশচন্দ্রের কান্নার পরিবর্ত্তে হাসি ফুটিল। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্কন্ধের উপর মুখ গুঁজিল। পাঁচকড়ি তাহাকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

যতীশচন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। মৃদুহাসিয়া বলিলেন,- শচীশচন্দ্র কি আর এখানে আগমন করিবেন না?

শ্বেতাঙ্গিনী। না।

যতীশ। তবে ত ভাল। পাঁচকড়িও খোকাকে অত্যন্ত ভালবাসে।

শ্বেতাঙ্গিনী। হাঁ, তা বাসে।

যতীশ। এখন পাঁচকড়ির একটা বিবাহ না দিলে নয়। বয়স প্রায় আঠার-উনিশ হইল।

শ্বেতাঙ্গিনী ব্যঙ্গ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"দাও!"

যতীশচন্দ্র সে স্বর চিনিতেন। বলিলেন,—"অমনভাবে বলিলে যে?"

শ্বেতাঙ্গিনী। কেমন ভাবে আবার বলিলাম? তোমার টাকা আছে,—ভাইয়ের বিবাহ দিবে, তা' আর আমি কি বলিব?

যতীশ। টাকা কি আর আছে,—

শ্বেতাঙ্গিনী। তবে কর্জ্জ করিও।

যতীশ। অগত্যা তাহাই করিতে হইবে। বোধ হয় টাকা শো চারিকের গহনা হইলেই হইবে। আর যাহা পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারাই কোন রকমে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইবে।

শ্বেতাঙ্গিনী কোন কথা কহিলেন না; কিন্তু যতীশচন্দ্র দেখিলেন, আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত সেই নথচক্র বিশোভিত মুখখানা

অত্যন্ত ভার হইয়া পড়িয়াছে। বলিলেন,—"যাহা না করিলে নয়, তাহা করিতেই হইবে।"

শ্বেতাঙ্গিনী অধিকতর গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"না করিলে ত সবই চলে না। কিন্তু ঐ যে ছেলে টুকু হইয়াছে, উহার উপায় কিছু ভাব কি ?"

যতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন,—উহার উপায় ? উহার উপায় আট পয়সার দুধ, আর দুই পয়সার সন্দেশ।"

শ্বেতাঙ্গিনী। ওগো তা সব জানি। এই ষেঠের কোলে তিন বৎসরে পড়িয়াছে,—এখন উহাতেই হয়, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ না করিলে, শেষে ফল বিষম হয় ! তা' ভালই বল—আর মন্দই বল, উহার জন্য এখন হইতে কিছু কিছু সংস্থান করিতেই হইবে। মরা-বাঁচা মানুষের হাত নয় - যদি হঠাৎ আমাদের কোন ভালমন্দ ঘটে—খোকা কি আমার শেষে ভিক্ষা করিয়া খাইবে ?

যতীশ। ভিক্ষা করিতে যাইবে কেন,—আমি যদি না বাঁচি—কাকারা ওর সকল ভার লইবে, উহাকে মানুষ করিবে।

মুখ ঘুরাইয়া, নথচক্র দুলাইয়া শ্বেতাঙ্গিনী বলিল,—

"তা নেবে গো নেবে। কাকায় যত প্রতিপালন করে, তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই- তোমার পায়ে পড়ি,—আমি কখনো তোমার নিকটে গহনা চাহি নাই--ভাল কাপড় চাহি নাই—কিন্তু এখন- আমার নিজের জন্য নহে—তোমার স্নেহের পুত্রের জন্য বলি যে এখন হইতে তোমাকে তাহার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা সংস্থান করিতেই হইবে। আমার মাথায় হাত দিয়া দিব্বি কর, আমার এই অনুরোধটী রাখিবে।"

যতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন,—তারপর প্রতিশ্রুত হইলেন,

যাহা মাসিক আয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক খোকার জন্য সংস্থান করিব,—আর অর্দ্ধেক সংসারে দিব।

শ্বেতাঙ্গিণী বলিলেন,—"আর একটি অনুরোধ।"

যতীশচন্দ্র। কি?

শ্বেতাঙ্গিণী। ঋণ করিতে পারিবে না। "ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু-" খোকার আমার শত্রু হ'ও না।

যতীশচন্দ্র। না,—কখনই ঋণ করিব না।

আকাশ মেঘমুক্ত হইল,—শ্বেতাঙ্গিণীর মুখভাব প্রসন্ন লাভ, অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ীর নিকটেই রেলওয়েষ্টেসন। বেলা আটটার সময় যতীশ চন্দ্র আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে এক কলশী গুড়, দুইটা কাঁটাল ও একটা ব্যাগ যাইবে।

পাঁচকড়ির উপরে মুটিয়া ডাকিবার ভার ছিল।—পাঁচকড়ি বলিয়া ও আসিয়াছিল, কিন্তু গাড়ীর সময় হইয়া আসিল, তথাপি মুটিয়া আসিল না।—অধিক লাভের প্রত্যাশায় সে অপর কার্য্যে গমন করিয়াছিল।

যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গাড়িরত আর সময় নাই।—কৈরে, মুটে কোথায়?

পাঁচকড়ি বলিল,'তা— কিজানি! আমিত বার বার করিয়া বলিয়া আসিয়াছি! বোধহয় আসিবে এখন।

যতীশচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"আর আসিবে কখন? গাড়ী বোধহয় ষ্টেসনে আসিল। ঐযে শব্দ হইতেছে।

পাঁচকড়ি। না,—ওখানা মালগাড়ী।

যতীশচন্দ্র। এখন আবার মালগাড়ী কোথায়?

শ্বেতাঙ্গিনী ওরফে মেজ বউ মুখভঙ্গী করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন— যখন পরের কাজ করিতে যাইতেই হবে তখন নিজে গিয়া একটা মুটে-ডাকিয়া আনিলেইত হইত। সকল কাজেই পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকা!

যতীশচন্দ্র গাড়ী পাইবেন না ভাবিয়া অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেজো বউয়ের কথায় নিজের ভ্রম ও পাঁচকড়ির অপরাধ পূর্ণ-মাত্রায় অনুভবকরিলেন। বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—"তাকিজানি যে,

অতবড় মিন্সেদ্বারা একটা মুটে ডাকা হইবে না। এখন আমি কি করি মহা মুস্কিল দেখিতেছি! আর কিছু না, জিনিষ গুলা লওয়া হইল না! হায়, কে বুঝিবে, চাকুরী করিতে হইলে, কতপ্রকারে কতজনের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। ম্যানেজার গুড়ের কথা বলিয়াছিলেন; দিতে পারিলে একটু সন্তুষ্ট থাকিতেন।"

এই সময়ে তৃতীয় ভ্রাতা ক্ষিতীশচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কে, পাঁচকড়ি মুটে ডাকিয়া দিবে? কেন আমাকে বলিলেই ত হইত।"

পাঁচকড়ির বড় দুঃখ হইল। সে কি কাজ অবহেলা করিয়াছে? মুটে যদি আসল না, তবে সে কি করিবে? মুটেত আর তাহাদের বেতনভোগী ভৃত্য নহে! দুঃখের সহিত যথোচিত অপ্রতিভও হইল। ক্ষুব্ধ-সঙ্কুচিত-স্বরে বলিল,—"চলুন, আমিই গুড় পঁহুছিয়া দিয়া আসিতেছি।"

যতীশচন্দ্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"শুধু কি গুড়, তাই তুমি লইয়া যাইবে?

পাঁচকড়ি। "সেজদাদা, আপনিও চলুন। আমি গুড় ও একটা কাঁঠাল লইতেছি। আপনি একটা কাঁঠাল লউন—মেজদাদা ব্যাগটা হাতে করিয়া লউন।"

যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"অগত্যা তাহাই হউক। গাড়ী আসিয়া পড়িল।"

পাঁচকড়ি গুড়ের কলসী বামস্কন্ধে লইয়া কাঁঠালের বোঁটা দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া গমনোদ্যত হইয়াছে, এমন সময় শচীশচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"আমি যাব।"

তার পর তিন ভ্রাতায় ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলেন—১১ পৃষ্ঠা

The Emerald Printing Works

তাহার ঠাকুরমাতা আসিয়া টানিয়া লইলেন; কিন্তু সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

তখন পাঁচকড়ি হস্তের কাঁঠাল মাটিতে নামাইয়া শচীশচন্দ্রকে দক্ষিণ ক্রোড়ে লইল, এবং মেজদাদাকে বলিল,—"কাঁঠালটা থাক, আপনি গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে আমি দৌড়িয়া আসিয়া কাঁঠাল লইয়া, গাড়ীতে তুলিয়া দিব।"

ক্ষিতীশচন্দ্র অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে কাঁঠালটাও লইলেন। তার পর তিন ভ্রাতায় ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঁচকড়ি যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক। ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, একখানা মালগাড়ী আসিয়া প্লাটফরমে দাঁড়াইল। যতীশচন্দ্র যে গাড়ীতে যাইবেন, সে গাড়ী আসিতে তখনও আধ ঘণ্টা বিলম্ব!

তাঁহারা ষ্টেসনে দ্রব্যগুলি রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একটী কুলী আসিয়া পাঁচকড়িকে সেলাম করিয়া বলিল,—"বাবু! মাল বুঝি সব আসিয়াছে? আমি ঘাটে গিয়াছিলাম, গাড়ীর এখনও অনেক সময় আছে,—এইবার আপনাদের বাড়ী যাইতেছিলাম।"

পাঁচকড়ি সে কথায় কোন উত্তর করিল না। কথা কহিবার সামর্থ্য তখন তাহার ছিল না। অৰ্দ্ধমণ গুড় স্কন্ধে করিয়া ও খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া ততখানি পথ আসিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল—চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। শচীশচন্দ্র তখনও তাহার ক্রোড়দেশে অবস্থান করিতেছিলেন।

মুটে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

যতীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও দুঃখিত হইলেন। ভ্রাতৃ-স্নেহ পূর্ণ প্রতাপে উচ্ছ্বাসিত হইয়া তাঁহার হৃদয় আপ্লাবিত করিল। বলিলেন,—

"সময় না বুঝিতে পারিয়া, আমিই একটা গোল পাকাইয়াছি। পাঁচকড়ি ঠিক কথাই বলিয়াছিল।"

ক্ষিতীশচন্দ্র দাদার পক্ষ সমর্থন করিলেন। বলিলেন,—"রেলগাড়ীর ব্যাপার ব্যস্ত হইবারই কথা!"

যতীশচন্দ্র নিজের দোষস্খালনার্থ সে কথা যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন না, এবং তাহার পুনরালোচনা করিবারও আবশ্যকতা বুঝিলেন না। পাঁচকড়িকে বলিলেন,—"এখন তোমার বয়স হইয়া উঠিয়াছে, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিবে। কিন্তু তাহা কর না কেন?"

পাঁচকড়ি কপালের ঘাম হস্তদ্বারা মুছিয়া বলিল—"সেজদাদা যাহা বলেন, তাহা'ত করি।"

যতীশচন্দ্র ক্ষিতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন।

যতীশচন্দ্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে বলিলেন,—"যাক্, যাহা পারে, তাহাই করুক। আর দিন কতক পরে উহাকে একটা যাহা হয়, ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিব। এখন উহাকে বিশেষ কিছু বলিও না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"কে কি বলে? তবে গ্রামে যখন সংক্রামকরোগ আরম্ভ হয়, তখন চাষাপাড়ায় গিয়া সেই সকল রোগী হাঁটকান আর সাধু-মহন্ত খুঁজে খুঁজে তাদের পাছ পাছ ঘোরা, গৃহস্থের ছেলের এ সকল ভাল নয়। আবার নাকি প্রাণায়াম শিক্ষা হচ্চে—শ্বাস-প্রশ্বাস টেনে টেনে শেষে একটা কঠিন রোগ জন্মিয়ে যাবে!—তাই সেগুলা নিষেধ করি।"

এই সময় ষ্টেসনে যাত্রার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীশচন্দ্র ব্যাগ হস্তে করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র ও পাঁচকড়ি দ্রব্যগুলি তুলিয়া দিল।

শচীশচন্দ্র তখনও পাঁচকড়ির ক্রোড়ে অবস্থিত।

যতীশচন্দ্র গাড়ীর দরজা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শচীর মুখচুম্বন করিতে গেলেন,—শচী তাহার ছোট কাকার গলা জড়াইয়া ধরিল।

পাঁচকড়ি মেজদাদাকে বলিল,—"খুচরা পয়সা আছে ?"

যতীশচন্দ্র। আছে,—কেন ?

পাঁচকড়ি। দুইটা দিন্'ত।

যতীশচন্দ্র। কি হইবে ?

পাঁচকড়ি। দিন্'ত।

যতীশচন্দ্র পকেট হইতে দুইটি পয়সা বাহির করিয়া পাঁচকড়ির হস্তে দিলেন।

এই সময় ঘণ্টাধ্বনি হইল। গাড়ীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তার-পরে কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গারণ করিতে করিতে গাড়ি ষ্টেসন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পাঁচকড়ি প্রাপ্ত পয়সা দুইটি দিয়া একটা সন্দেশ ক্রয় করিল এবং শচীর হস্তে প্রদান করিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে ষ্টেসনের বাহির হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যশোহর জেলায় শোনপুর এক ক্ষুদ্র পল্লী। এই পল্লীতে রায়বংশ পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত। যে কারণে বাঙ্গালার অধিকাংশ পুরাতন বংশ নির্ধন ও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, এই রায়বংশের অবস্থাও সেই কারণে দুঃস্থ ও হীন হইয়া পড়িয়াছে। সে কারণ, মোকদ্দামা। কয়েক খণ্ড ভূমি লইয়া জমিদারের সহিত হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা করিতে করিতে যদুনাথ রায় একবারে নিঃস্ব ও ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়েন। অবশেষে লাখরাজ প্রভৃতি যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, দেনার দায়ে তাহা বিক্রয় হইয়া গেল। তখন একটা গাঁতি জমার আয় ও কয়েক বিঘা চাষের জমির ফসল আদায় করিয়া যদুনাথ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুখ আর দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু যে একদিন রাজ-রাজেশ্বর ছিল, সে সহসা ভিখারী হইলে, এই অবস্থা-বিপর্য্যয় তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হয়,—জলের ফুল ডাঙ্গায় আনিয়া সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে সে মুহূর্ত্তেকও টীকে না।

পূর্ব্বে যদুনাথের যে আয় ছিল, তদ্দ্বারা বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। অতিথি অভ্যাগতের সেবা হইত। নিজে যানবাহনে গমনাগমন করিতেন। দাসদাসীতে বাড়ী পূর্ণ ছিল। কিন্তু মক-র্দ্দমায় সে সকলই শিশিস্থ কর্পূরের মত—গজভুক্ত কপিত্থের মত কোথায় চলিয়া গিয়াছে! এখন নিজে হাঁটিয়া, খাটিয়া প্রজার বাড়ী হইতে খাজানা আদায় করিতে হয়,—ধান সকল আদায় করিয়া আনিতে হয়, -তাহাও নিতান্ত অপ্রচুর! সাধারণ গৃহস্থের মত সংসার চালানও

তদ্দারা সুকঠিন। এই সকল নানা কারণে ও ভীষণ মনোকষ্টে যদুনাথের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তিনি রোগ শয্যায় প্রায় বৎসরাবধি পড়িয়া থাকিলেন। চিকিৎসার ব্যয় বাড়িয়া গেল পথ্যের খরচও বৃদ্ধি হইল; তখন আবার ঋণগ্রহণ করিতে হইল। ঋণও ক্রমে ক্রমে অনেক হইল। অথচ ব্যাধি আরোগ্য হইল না—যদুনাথ পাঁচটি নাবালক পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

যদুনাথের গৃহিণী নাবালক পুত্র কয়টি লইয়া অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হইলেন। কিন্তু সুদ-গ্রাহী উত্তমর্ণেরা তাঁহাদিগের অবস্থা বুঝিল না, অনাটনের দংশনজ্বালা অনুভব করিল না,—নাবালকগণের মুখের পানে চাহিল না—ভদ্র কুলবধূর হাহাকার মানিল না। তাহারা সুদে আসলে হিসাব করিয়া আদালতে নালিশ করিল,—এবং ডিক্রি জারি করিয়া গাতিজমা ও আবাদের জমি কয়বিঘা বিক্রয় করিয়া লইল। বিধবা, গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকলকেই জানাইলেন। তাঁহারা কি খাইয়া জীবন রক্ষা করিবেন বলিয়া দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া বেড়াইলেন,—কিন্তু স্বার্থপর বিশ্বে বক্তৃতায় বাহাদুরী অনেকেই লইতে পারে,—প্রকৃত আর্ত্তের চক্ষুর জল মুছাইতে কেহই অগ্রসর হয় না! এ ক্ষেত্রেও কেহই এই আর্ত্ত-বিপন্ন পরিবারের অশ্রুজল মোচনে অগ্রসর হইল না!

নবীন বড় ছেলে। রায় গ্রামের মাধব ঘোষের কন্যা জয়ন্তীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়াছিল। নবীনের শ্বশুর সংবাদ পাইয়া আসিলেন,—অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারও আর্থিক অবস্থা ততদূর উন্নত নহে। তথাপি তিনি যতদূর পারিলেন, করিলেন। মহাজনকে ধরিয়া জোতের জমি কয়বিঘা যে মূল্যে ডাকিয়া লইয়াছিল, সেই মূল্য দিয়া এবং লাভের

হিসাবে আরও কিছু দিয়া পুনরায় কবালা করিয়া লইলেন। আর ঐ জমিগুলির আবাদ করিবার খরচের জন্য এবং বর্ত্তমান সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নগদ টাকাও কিছু রাখিয়া গেলেন। অতঃপর মাসে মাসেও কিছু সাহায্য করিতেন।

নবীনের বয়স তখন পঞ্চদশের উপরে নহে। যতীশ, ক্ষিতীশ, দানীশ তখন আরও বালক। পাঁচকড়ি মোটে তিন মাসের শিশু।

নবীনই মাঠে গিয়া জমির উৎকর্ষ সাধন জন্য যত্ন করিত,—নবীনই মজুর ডাকিয়া ধান্যাদির বপনকার্য্য সমাধা করিত। নবীনই নিড়ান কাড়ানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিত,—নবীনই ধান্যাদি পাকিলে কাটাই মলাই করিয়া গৃহে আনাইত। যতীশ ক্রমে ক্রমে তাহার সাহায্য করিতে লাগিল। ক্ষিতীশ আর দানীশ তখন বালক—তাহারা খেলিয়া বেড়াইত। কদাচিৎ ভ্রাতৃ তাড়নায় মাঠে গিয়া হয়ত মজুরগণের "জল-খাবার" যোগাইয়া আসিত। আশৈশবের পিতৃহীন পাঁচকড়ি তখনও ভ্রাতৃ-স্নেহের পবিত্র হিল্লোলে ক্রোড়ে ক্রোড়ে ফিরিত।

কয়েক বৎসর এইরূপেই কাটিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে ভাগ্যলিপি অন্য পথে চালিত হইল। সেবারকার দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে বাটীর অধিকাংশ লোকই শয্যাশায়ী হইয়াছিল। নবীনও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল,—অনেকে সেই বঙ্গ-পল্লীধ্বংসকারী কালোপম ব্যাধির হস্ত হইতে অনেক কষ্টে নিস্তার পাইল,—অনেকে তাহার কালোদরে জীর্ণ হইয়া গেল। নবীনও সকলকে কাঁদাইয়া—নিঃসহায় পরিবারবর্গকে অকুলে ভাসাইয়া মরণ-পথের পথিক হইল।

দিনকতক সে পরিবারে বড়ই হাহাকার উঠিল। তারপর দিনে দিনে সকলেই একটু সাম্‌লাইয়া লইল। কিন্তু তাহাদের অর্থানটন আরও বাড়িয়া পড়িল। নবীন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া যাহা অর্জ্জন

করিত, তাহার পথ রুদ্ধ হইল,—অধিকন্তু নবীনের শ্বশুর মাসিক যাহা সাহায্য করিতেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। বালিকা কন্যা জয়ন্তী তখন শ্বশুরবাড়ী ছিল,—তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যতীশচন্দ্র অগত্যা সমস্ত ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু অর্থাভাবে সে কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রমে সকল দিক সঙ্কুলান করিতে পারিল না। নবীনের শ্বশুর মাসে মাসে যাহা সাহায্য করিতেন, তদ্দ্বারা চাষের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল,—কাজেই সে কার্য্যে কোন প্রকারেই সুবিধা হইল না।

তখন নিরাশ হইয়া যতীশচন্দ্র মায়ের নিকট পরামর্শ চাহিলেন. যতীশচন্দ্রের মাতা স্ত্রীলোক হইয়া যতদূর পারিতেন, পুত্রদিগকে সাহায্য করিতেন।

মাতা-পুত্রে পরামর্শ করিলেন। শেষে যতীশচন্দ্র বিদায় লইয়া অর্থান্বেষণে বাহির হইলেন। মাতা ক্ষিতীশকে লইয়া সংসারের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

দানীশের বয়স তখন প্রায় বার উত্তীর্ণ হইয়াছে। গ্রামের ভজহরি দত্ত কলিকাতার এক মার্চ্চেণ্ট আফিসের মুচ্ছুদ্দী। পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিলে যতীশের মাতা তাঁহার নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া ধরিলেন যে,—'দানীশকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, তোমার ভাত কত কুকুর বিড়ালে খাইতেছে,— যাহাতে উহার একটু পড়া-শুনা হয়, তাহা তোমায় করিতেই হইবে।' ভজহরি সেই বারই দানীশকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলেন,—এবং একটি স্কুলের অধিকারীকে ধরিয়া বিনা বেতনে পড়িবার সুবিধা করিয়া দিলেন। ক্ষিতীশ তখন বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিল। পাঁচকড়ি গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কোন দিন যাইত,—কোন দিন পাখীর ছানা পাড়িয়া, ডাংগুলি খেলিয়া কাটাইয়া দিত।

যতীশচন্দ্র এক জমিদারের বাড়ীতে গিয়া অনেক দিন শিক্ষানবীশের কার্য্য করিলেন। তারপরে ছয় টাকা বেতনে মুহুরীর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া যতীশচন্দ্র বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। সেই পাঁচ টাকা আবাদে ব্যয় করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র চাষকার্য্য করিতে লাগিল। ক্রমে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

যতীশচন্দ্র ক্রমশঃ একটি ভাল চাকুরী প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মাসিক আয় প্রায় পঞ্চাশ টাকা হইয়া উঠিল। ক্রমে নিজে বিবাহ করিলেন,—তারপরে ক্ষিতীশের বিবাহ দিলেন। দানীশের বিবাহে তাঁহার বড় ভাবিতে হয় নাই,—দানীশ তখন এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। শহর নগরের কৃষ্ণহরি মিত্রের বিধবা স্ত্রী তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বহুল যৌতুকের সহিত কন্যা শান্তিকে দানীশের সহিত বিবাহ দিলেন।

যতীশচন্দ্রের সংসার এখন আর নিতান্ত দরিদ্রের সংসার নহে। পল্লীগ্রামে—ক্ষেতের ধান, বাগানের লাউ-কুমড়া-শশা, পুঁই-পালম-ডেঙ্গ প্রভৃতি তরকারি-সব্জী; পুকুরের মাছ—আর মাসিক পঞ্চাশ টাকা, ইহা দ্বারা রায় পরিবারের এক প্রকার সচ্ছলেই দিন গুজরান চলিতে লাগিল। এতদিনে নবীনের স্ত্রী জয়ন্তী আসিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পিতা প্রথমে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু জয়ন্তী পিতার কথা শুনে নাই। সে বলিত, মানুষ জন্ম বৃথাই কাটিল, শাশুড়ী যতদিন জীবিত আছেন,—তাঁহার সেবাটাই বা না করি কেন? জয়ন্তী আসিয়া সংসারের কাজকর্ম্মের ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্ষিতীশ চাষ আবাদের কার্য্যই দেখিত, কিন্তু কয় বৎসর পর পর অজন্মাতে বড়ই লোকসান পড়িয়াছিল বলিয়া, জমিগুলি ভাগে বিলি করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি সংসারে কিছু অনাটনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাপড় যখন ছিন্ন হয়, তখন তাহার এক দিক সংস্কার করিতে গেলে অপর দিক বিখণ্ডিত হইয়া যায়। অর্থানটন কষ্ট কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইতে না হইতে,---পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাগম করিতে না করিতে, সংসারে কলহরূপ অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

মাসিক পঞ্চাশৎ মুদ্রা উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী স্বেতাঙ্গিনী ভাবিতেন, তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী বুঝি রমণীকুলে দুর্ল্লভ। তাই তিনি তাঁহার নাসিকালম্বিত বিলাতী মুক্তাদ্বয় গর্ভ রক্তপ্রস্তর-বিন্দু শোভিত অর্দ্ধগিনি বিনির্ম্মিত নথচক্র সময়ে অসময়ে সংসারের-উপরেই অত্যধিক মাত্রায় ঘুরাইতেন।

সেজবউ ক্ষিতীশের স্ত্রী,—তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। তিনি ভাবিতেন তাঁহাদের দুইটা পেট—কতই লাগে! কেন অন্যের অধীন হইবেন। তবে তাঁহার স্বামী নিতান্ত নির্ব্বোধ,—তিনি যে এত মাঠের খাটুনী খাটেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, এত কাজ করিয়া বেড়ান,—কৈ তাঁহার স্ত্রীর তদুপযুক্ত সম্মান কোথায়? কেন বাড়ী শুদ্ধ লোক সেজ বউয়ের আজ্ঞাকারী হয় না? তবে পৃথক্ হইতে দোষ কি? পৃথক্ হইয়া এত কাজ করিলে সেজ বউয়ের গায়ে যে অলঙ্কার ধরিত না!

দানীশের স্ত্রী তখন সংসারের তত খুটিনাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। সে যৌবন-হিল্লোলে হিল্লোলিতা ষোড়শী পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। তবে বড়বউ তাহাকে শিক্ষানবিশী করাইতেন।

পাঁচকড়ির তখন বিবাহও হয় নাই,—সে বড় কিছুর মধ্যেও থাকিত না। যেখানে রোগ-শোক, ব্যথা-জ্বালা, যেখানে আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন, যেখানে মৃত্যুর হাহাকার,—জাতি-ধর্ম্ম না দেখিয়া আত্মপর বিবেচনা না করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় সেই স্থানেই তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত

হইত। গ্রামে সাধু-মহান্ত আসিলে দুই একবার সেখানে ঘোরা ইহাই তাহার কার্য্য ছিল। আর নিশিশেষে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিত। এই সমস্ত কার্য্যের অবকাশকালে শ্রীমান শচীশচন্দ্রকে লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিত; যেখানে ফলটি পাইত, ফুলটি পাইত, মিষ্টান্নটুকু ক্রয় করিত, তাহা শচীশের সেবায় লাগাইয়া প্রীতিলাভ করিত।

তাহার এই সকল কার্য্যে সে মহা সন্তুষ্ট থাকিত, কিন্তু বুঝিতে পারিত না যে, বাড়ীর অনেকেই তাহাকে অপ্রীতির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে।

যিনি গৃহিণী—যাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূগণ সংসারে ক্রমে ক্রমে অশান্তির আগুণ জ্বালিয়া তুলিতেছিল, তিনি সে সকল জানিতে পারিয়াও যথোপযুক্ত ভাবে তাহার প্রতিকার-সাধনে সক্ষম হইতেছিলেন না। ইহার দুইটি কারণ ছিল। এক তিনি নিজে কিছু দাম্ভিকা,—দ্বিতীয় সংসারের খুটিনাঁটীতে তত সুনিপুণা নহেন।

দাম্ভিকা বলিয়া কাহাকেও বড় কিছু বলিতেন না। কেননা, যেরূপ কাল—দিন, যদি কেহ কিছু তাঁহাকে বলে, তিনি অভিমানে মরিয়া যাইবেন।

সংসারের খুটিনাঁটী বুঝিতেন না বলিয়া কে কি করিতেছে, কাহার মতিগতি কোন্ দিকে যাইতেছে,—কে কাহাকে কি কুশিক্ষা দিতেছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিতেন না,—কাজেই যথোচিত শাসনও করিতে পারিতেন না। হয়ত শ্যামের দোষ রামের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে ধমক দিতেন, নয় ত হরির দোষে মতি তাঁহার নিকট গালি খাইয়া মরিত। যখন যাহাকে প্রশ্রয় দিতেন, তখন তাহাকে একবারে সপ্তমস্বর্গে তুলিতেন,—আবার যখন হেনস্থা করিতেন, তখন

একবারে বলিরাজার বাড়ীর বারুণী পুকুরে নিক্ষেপ করিতেন। কাজেই তাঁহার দ্বারা সংসার-শাসনের সাংসারিক শৃঙ্খলা-সাধনের বড় কোন কাজ হইত না। যে গৃহে গৃহিণীর শৃঙ্খল-নিপুণ স্পর্শ নাই, সে গৃহ অনিন্দ্যসুন্দরী অন্ধ যুবতীর সহিত উপমেয়।

এমনি করিয়াই বুঝি বাঙ্গালীর গৃহ-বিবাদে পল্লীর সুখ-সম্পদ বিদূরিত হইতেছে! সময়ে সাবধান হইতে পারিলে বুঝি, তাহার প্রতিকার হইতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাস। সেবার মাসের শেষে পূজা, পূজার আর দিন নাই। শারদীয় শোভায় শারদার আহ্বান-লিপি লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতি তাহার শেফালি-মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া গন্ধপূর্ণ করিয়াছে। জলহারা মেঘ নিষ্ফল গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে। শিশিরসিক্ত বাতাস প্রবাহিত হইয়া হেমন্তাগমের সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে, বনে, বাগানে কুসুম; প্রান্তরে ক্ষেত্রে, ধান্য-জলাশয়ে; সরোবরে কুমুদ-কহ্লার,—গ্রাম-পথে গন্ধামোদিত।

বঙ্গের পল্লী শারদীয় মহোৎসবে মাতিয়া বৎসরান্তে একবার শ্রী-সম্পদে পূর্ণ হয়। এবারেও তাহা হইয়াছে,—ষষ্ঠীর দিন প্রবাসিগণ গৃহাগমন করিতেছে। নববস্ত্রে, নব পরিচ্ছদে, নবশোভায় এবং নবীন সমাগম উচ্ছ্বাসে পল্লী মুখরিত।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময় দানীশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। মধ্যাহ্নে যতীশচন্দ্র বাড়ী আসিয়াছিলেন।

দানীশ মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং মজঃফরপুরের সরকারী চিকিৎসালয়ের মাসিক দেড়শত মুদ্রা বেতনের চাকুরীর সনন্দ লইয়া আসিয়াছে। পূজান্তে সেখানে যাইয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিবে।

আসিবার সময় বিদেশবাসে যাহা কিছু প্রয়োজন, দানীশচন্দ্র সে সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে,—বিদেশে অবসরকালে চিত্ত বিনোদন জন্য এক বন্ধুর নিকট হইতে একটা হারমোনিয়মও চাহিয়া আনিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়,—গ্রামে পূজাবাড়ীতে বোধনের বাজনা বাজিতেছিল। শরৎ শশধর কর্পূর-কুন্দ-ধবল জ্যোৎস্নাবিলাইয়া সান্ধ্যধূসর মলিনতাকে বিদূরিত করিতেছিলেন।

দানীশচন্দ্রের দ্রব্যগুলি তখনও গৃহে উঠে নাই—দাবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কিন্তু প্রায় সমস্তগুলিই বস্ত্রাবৃত। দানীশ হাতপা ধুইতেছিলেন,—মাতাঠাকুরাণী সেখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে যতীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। দানীশ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শচীকে কোলে করিয়া পাঁচকড়ি আসিয়া ন'দাদাকে প্রণাম করিল। দানীশ শচীকে কোলে লইল, এবং একটা গাঁটুরী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে শচীর জামা, কাপড়, জুতা ও খেলনা বাহির করিয়া দিল। বালক সেগুলি হস্তগত করিয়াই ছোটকাকার কাছে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, দানীশ রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু শচী সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, তাহার ছোটকাকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন পাঁচকড়ি তাহাকে সেই নব-পরিচ্ছদগুলি পরাইয়া দিতে লাগিল।

যতীশচন্দ্র দানীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর শরীর ভাল ছিল ত?"

দানীশ। হাঁ,—ভালই আছে। আমার চাকুরী হইয়াছে।

যতীশ। কোথায়?

দানীশ। মজঃফরপুরে।

যতীশ। অনেক দূর।

দানীশ। আমি ইচ্ছা করিয়াই, সেখানে যাইতেছি।

যতীশ। কেন?

দানীশ। সেখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল।

ক্ষিতীশ। পশ্চিমদেশ—আমাদের দেশের মত ম্যালেরিয়ায় এখনও সে দেশ জীর্ণ-শীর্ণ করে নাই।

পাঁচকড়ি শচীর পায়ে জুতা পরাইতে পরাইতে পুলকপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কবে সেখানে যাইবেন?"

দানীশ। পূজার পরেই,—কেন?

পাঁচকড়ি। আমিও যাব।

ক্ষিতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"কেন, সেখানে সন্ন্যাসী মোহান্ত অনেক আছে নাকি?"

পাঁচকড়ি লজ্জিত হইল। যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"কথা মন্দ নয়, চাকুরী স্থায়ী হইলে পাঁচকড়িকে সেখানে লইয়া যাইও।"

ক্ষিতীশ। সেখানে গিয়া কি করিবে?

যতীশ। দানীশের ডাক্তারখানায় কিছুদিন থাকিয়া যদি একটু আধটু শিখিতে পারে,—তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ে থাকিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতে পারিবে।

ক্ষিতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"যত কাজ আছে, তার মধ্যে চিকিৎসা কাজ বড় কঠিন।"

যতীশ। তাহা জানি,—কিন্তু কত গোবেচারি কিছু না পড়িয়া শুনিয়া—কখনও কোন ডাক্তারের সহিত একটি কথাও না কহিয়া চিকিৎসা করিতেছে,—রোগীও সারে,—দু'পয়সা রোজগারও করে।

সে সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা কহিল না। ততক্ষণে শচীর জুতা পরান সমাপ্ত হইয়াছিল। পাঁচকড়ির দৃষ্টি তখন বস্ত্রাবৃত হারমোনিয়মের উপরে পতিত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা কি ন'দাদা ও হারমোনিয়ম নাকি?"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"হাঁ, হারমোনিয়ম; ডাক্তারী করিতে যাবে, তাই রোগীকে শুনাইবে বলিয়া সঙ্গে লইয়াছে।"

দানীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"হারমোনিয়মই বটে।"

পাঁচকড়ি ততক্ষণ গিয়া তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিতেছিল। আবরণ খুলিয়া, বাক্স বাহির করিল;—তারপরে চাবি খুলিয়া হারমোনিয়মটি বাহির করিয়া দীপালোকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল.—"বাহবা, এত খুব ভাল হারমোনিয়ম দেখিতেছি।"

শচী বলিল,—"ছোটকাকা—হামোনি বাজা।"

পাঁচকড়ি শচীকে ক্রোড়ে করিয়া হারমোনিয়মটিকে দক্ষিণ কক্ষে গ্রহণ করিয়া এবং আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বহির্ব্বাটী অভিমুখে গমন করিল।

বাজেয়াপ্তের ঘোর আশঙ্কায় দানীশচন্দ্র বলিলেন,—"ওটা পরের জিনিষ, চাহিয়া আনিয়াছি। এখনি আবার আনিস্।"

পাঁচকড়ি তখন প্রাঙ্গণ-প্রান্তে। ন'দাদার কথার উত্তরে বলিয়া গেল.—"এখনি আন্‌চি।"

মাতা সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ষষ্ঠীর কোলে শেয়ানা হ'ল, তবু তেমন বোধ-সোদ হ'ল না। ওকে নিয়েই আমার যা কিছু ভাবনা।"

যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন। পিতৃহীন একটুখানি শিশুকে মর্ম্মত্বক্ নিঃসৃত স্নেহ-করুণা দিয়া মানুষ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—"ও সকলের ছোট, তাই একটু আদুরে,—বড় হইলে একটু বোধ-সোধ হইলেই সারিয়া যাইবে। দানীশের সঙ্গেই উহাকে দিব। তবে দানীশ দুই একবার ঘুরিয়া আসুক।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মজঃফরপুর কি বাঙ্গালা মুলুকে নয়?"

যতীশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"না।"

মাতা। ওমা,—তবে সে কোন্ দেশে? বিলেতে নাকি? সে দেশে গেলে জাত যাবে না ত?

যতীশ। না মা,—মজঃফরপুর আমাদেরই বঙ্গদেশে—পশ্চিমে। তত বেশী দূরও নয়। টাকা পাঁচেক গাড়ীভাড়া। দু'দিনেই পঁহুছান যায়।

মাতা। মাইনে কত হইল?

দানীশচন্দ্র বলিলেন,—"আপাততঃ দেড় শো টাকা। তবে শীঘ্রই বাড়িবে।"

মাতা। মাসে দেড়শো টাকা?

দানীশ। হ্যাঁ।

মাতা। তুই ছেলে মানুষ—অত টাকা তোরে দেবে?

দানীশ হাসিল,—কিন্তু সে কথার কোন উত্তর করিল না। যতীশ বলিলেন,—"লেখাপড়া শিখিয়াছে, টাকা দিবে না কেন মা?"

মাতা। আমার কপালে সকলে বেঁচে-বত্তে থেকে রোজগার-পত্র কর,—মিলেমিশে থাক—আমি তাই দেখে জলতলে যাই। কা'ল সত্যনারায়ণের সিরূণি দিতে হবে। ঠাকুর আমার সকল দিক বজায় করুন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শারদীয় শুক্লা ষষ্ঠীর শশধর তখন অস্তমিত,—পূজার বাড়ীর উৎসব-কোলাহল নিস্তব্ধ, জনকোলাহল মুখরিত পল্লী সুখ-সুপ্ত,—পথিক পরিত্যক্ত গ্রাম্যপথ নৈশনিস্তব্ধতা বুকে করিয়া শায়িত,—কেবল কোন বেণববিটপী মধ্যে বসিয়া দধিয়াল এক আধবার রব করিতেছিল। ক্বচিৎ কোন সহকার-শাখাগ্রে বসিয়া পাপিয়া—"বউ কথা কও" বলিয়া সাধাগলায় সেই পুরাতন কথার আবৃত্তি করিয়া চিরসংস্কার সাধিতে অভিমানিনীর দুর্জ্জয় মানের পরিহার চেষ্টা করিতেছিল এবং দানীশের অসংস্কৃত জীবনকক্ষ হইতে হারমোনিয়মে বেহাগের স্বর উত্থিত হইতেছিল।

কক্ষমধ্যে কাচমণ্ডিত আধারে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল এবং দূরাগত সমীরে শেফালিকাগন্ধ অনুভূত হইতেছিল।

দানীশচন্দ্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া হারমোনিয়ম বেলো করিয়া বেহাগ রাগিণীতে 'সে কেন আমার পানে চুরি ক'রে চায়' গানের স্বরলিপি বাজাইতেছিলেন। তাঁহারই পার্শ্বে অনিন্দ-সুন্দরী ন'বউ একখানি সুশুভ্র চাদরে আপাদ-মস্তক আচ্ছাদন করিয়া সান্ধ্যফুল্ল-গোলাপ-কলিকার ন্যায় শায়িতা ছিল।

দানীশচন্দ্র বাজাইয়া বাজাইয়া যখন স্ত্রীর নিকট একটিও বাহবা বা প্রণয়ের হা-হুতাশ-সূচক কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, তখন বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়া ন'বউয়ের মুখের কাপড় ধরিয়া টান দিলেন। অনুকূল বাতাসে নীল মেঘমালা সরিয়া গেল, বসন্তে পূর্ণ চন্দ্র মেঘ মুক্ত হইল। তথাপি দানীশের ধৃষ্টতা থামিল না,—একেবারে চাদর খানিকে স্থানচ্যুত করিয়া তবে ছাড়িলেন। ন'বউ ওরফে শান্তি,

তখন মৃদু হাসিয়া উঠিয়া বসিল। সে হাসিতে অতুলনীয়-অপার্থিব কমনীয়তা অথচ ক্ষুতীক্ষ্ণ, ক্ষুতীব্র, হৃদয়স্তম্ভী সৌন্দর্য্য সম্পদ উচ্ছ্বাসিত হইয়া আসিল। শান্তির প্রসাধন-বর্জ্জিত নবোদ্ভিন্ন যৌবন-লাবণ্য তাহার আশে পাশে সর্ব্ব অবয়বে বিজড়িত ক্ষুব্ধ প্রহত ও সৌন্দর্য্যরসে বিপুলভাবে পরিপুষ্ট হইয়া পরিপূর্ণ বেগ সঞ্চয় করিল।

দানীশচন্দ্র সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁহার মর্ম্ম-ত্বক্ ভেদ করিতে পারিল না। কোন দিনই পারে নাই। সে রূপ দেখিয়া ক্ষণতরে তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু হৃদয়ের অতি গোপনপুরে ক্ষুব্ধ আত্মা, নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়া বিরলে ঝরিয়া মরিত! তিনি মনে মনে বলিতেন, এত রূপ! এত রূপের সহিত অণুমাত্রও গুণ নাই—যে বিধাতা সিমুলফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিধাতার অনিপুণ হস্তেই শান্তির সৃষ্টি! দানীশের নিকট, গুণ অর্থে নভেল পড়া, কবিতা লেখা, কার্পেট বোনা, হারমোনিয়ম বাজান, প্রেমের পত্র লেখা,—আর শয়নে জাগরণে প্রেমের স্বপ্ন দেখা! পল্লী-গ্রামের হিন্দুসমাজের মেয়ে তাহা শিখে নাই,—শিখিতে লজ্জা বোধ করে বলিয়া তাহার চেষ্টাও করে নাই!

শান্তি উঠিয়া বসিলে, দানীশচন্দ্র তাহার খোঁপা ধরিয়া টান দিলেন। খোঁপা খুলিয়া গেল,—কুসুমরাশি ঝরিয়া পড়িল। ভুজঙ্গিনীর ন্যায় বেণী পৃষ্ঠে লম্বিত হইল। মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল,—"এত দৌরাত্ম্য কেন?"

দানীশচন্দ্রও হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—তুমি আমার বাজনা শুনিবে না কেন?"

শান্তি প্রেমাবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"গান শুনিতেছিলাম না কি কাণে তুলা দিয়াছিলাম?"

গম্ভীর-ক্ষুণ্ণস্বরে দানীশ বলিল,—"তুমি যে গান বোঝ না।"

শান্তি হাসিল। হাসির ঘটা এবার কিছু অধিক। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তাইত শুনি না।"

দানীশ। সে জন্য আমি বড় দুঃখিত। মানুষ মাত্রেরই বৃত্তি সমুদয় সম্পূষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

শান্তি। তাহাতে কি হয়?

দানীশ। আনন্দ হয়?

শান্তি। কেন?

দানীশ। কেন, তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? সঙ্গীত চর্চ্চা, কাব্য চর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চা--এ সকল যে কত আনন্দ-দায়ক, তাহা তুমি ঘোর অশিক্ষিতা—তুমি বুঝিবে কি প্রকারে?

শান্তি। ঘরধোয়া, ঘরসাজান, ভাতরাঁধা, ঠাকুরদেবতার পূজা-পার্ব্বণে যোগ দেওয়া—কুট না কোটা, বাট্না বাটা, পানসাজা—আর শ্রীমান্‌দের পদসেবা করা—মেয়ে মানুষের পক্ষে কত আনন্দদায়ক তা' হুজুর জানিবেন কি প্রকারে? হুজুর যদি মেয়ে মানুষ হইতেন, তবে সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেন।

দানীশ। তুমি ঘোর মূর্খ কিনা,—তাই অমন কথা বল।

শান্তি। বিষম পণ্ডিত কিনা, তাই এমন সোজা সুখটা বোঝ না।

দানীশ। স্ত্রীলোক কি মানুষ নহে;—স্ত্রীলোকেরও কি মানুষ সম্ভব উচ্চতর বৃত্তি নাই? পুরুষ ও স্ত্রী একই—উভয়েরই সমান বৃত্তি। শিক্ষা পাইলে উভয়েই সমান হয়।

শান্তি ভারি হাসি হাসিল। হাসি আর থামে না! শিক্ষা-গৌরব-দীপ্ত দানীশ সে হাসিতে বড় বিরক্ত হইলেন। নিরর্থক হাসি! শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"না না, যে বৃত্তিতে অসম্ভাবিত বিলাস সুখের উদয় হয়, সে বৃত্তি রমণীগণের নাই।"

বিরক্তিস্বরে দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বিবেচনায় সে বৃত্তিটা কি?"

শান্তির হাসি তখনও থামে নাই। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"গোঁপ।"

দানীশ অধিকতর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—"এই অশিক্ষার কুফল। গোঁপ কি একটা বৃত্তি?"

সেইরূপই হাসিতে হাসিতে শান্তি বলিল,—"তোমাদের শাস্ত্রমতে ওটা বৃত্তি না হইলেও মেয়ে মানুষের যখন উহা নাই, তখন তাহাদের তোমাদের মত বিলাস বাসনাও নাই।"

দানীশ। তোমার এ কথার কোনই অর্থ নাই। পুরুষ মাত্রেই আর সুশিক্ষিত নহে।

শান্তি। দেখ না, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ও বাবাজীরা দূর করিয়া দিয়া বিলাস-বাসনা বিসর্জ্জন দেন।

দানীশ অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন। প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনছলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমিত পূজার পরেই পশ্চিম যাব,—তুমি কি করিবে?"

তরল জলস্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে বাঁধে বাধিয়া হঠাৎ যেমন রুদ্ধ হয়, শান্তির হাসির স্রোত তেমনই রুদ্ধ হইল।

শান্তি দীর্ঘায়ত নয়ন-যুগলের স্থিরদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া বলিল,—"পূজার পরেই যাবে?"

দানীশ। হাঁ।

শান্তি। অন্যান্য বারে পূজার সময় বাড়ী আসিয়া ত দিন কতক থাকিতে?

দানীশ। অন্যান্য বার যতদিন কলেজ বন্ধ থাকিত, ততদিন থাকিতাম,—এবার চাকুরী করিতে যাইব! তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

শান্তি। আপত্তি কি? তুমি যদি লইয়া যাও, তবে আমি যাইব না কেন?

দানীশচন্দ্র তত সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার আশা ছিল, এই বিদেশ গমনের কথা লইয়া একটা বিরহাশঙ্কার মহানাটকের অভিনয় হইবে,—কত দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইবে,—কত হৃদয়ের গুরুভার বর্ণনা,—কত কাতরকাহিনীর প্রসঙ্গ উঠিবে। তারপরে প্রবাসে যাইবার জন্য পায়ে পড়াপড়ি হইবে,—সঙ্গে না লইতে চাহিলে উদ্বন্ধনে বা বিষমবিষে আত্মহত্যার কথা উঠিবে,—কিন্তু সে সকলের কিছুই হইল না। শান্তি কেবল বলিল,—"যদি লইয়া যাও যাইব, রাখিয়া যাও থাকিব। তোমার যাহাতে সুবিধা—তোমার যাহাতে ভাল; আমারও তাতেই সুবিধা.—আমারও তাহাই ভাল।"

দানীশ সে হৃদয়—সে প্রেম চিনিল না। তাহা ক্ষুদ্র নদীর অসীম সবেগ জল নহে। অনন্ত সীমা-হীন প্রশান্ত-সাগর বারি। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তাহা কম্পিত নহে,—সামান্য রবিতাপে তাহা উষ্ণ হইবার নহে। সাধারণ বায়ু সম্পাতে তাহা বিকম্পিত হইবার নহে। শান্তি জানে, স্বামী দেবতা, তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য পরিপালন জন্য যে কার্য্য ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, পত্নী তাহারই উদ্ধারকল্পে প্রাণপণে সহায়তা করিবে। স্বামী-প্রেম সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে,—স্বামী-প্রেম দৈহিক মিলনের জন্য নহে,—স্বামী-প্রেম কেবল দুইটা কথার কথা নহে!

দানীশ কিন্তু তাহা বুঝিলেন না। তিনি বুঝিলেন, এমন পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা রমণী তাঁহার মত সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদের আদৌ উপযুক্তা নহে।

এই ভ্রমে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দানীশেরও যে হইবে না কে বলিল!

দানীশ যদি চিনিতে পারিত,—বলিতে পারিত, তবে জানিত, যে, শান্তির প্রেম আদিম বসন্ত দিনের ছায়ালোক বিচিত্র গোধূলি-বেলার স্বপ্নাবসন সমীরের মত সে বক্ষ কাঁপিতেছে!—তাহার স্বপ্ন-রঞ্জিত নেত্রযুগে কি বিহ্বল সকরুণ মাধুর্য্য বিরাজ করিতেছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সপ্তমীর প্রভাতে মধুরতম বাদ্যকোলাহলে পল্লী জাগরিত হইল। পাড়ার বালক-বালিকা নব-পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া দলে দলে পূজার বাড়ী ঠাকুর দেখিতে ছুটিল।

শচীকে সাজাইয়া লইয়া পাঁচকড়ি পূজাবাড়ীতে চলিয়া গেল। যতীশচন্দ্র পত্নীকে বলিলেন,—"যদি বাঁচে, ছেলেটা মানুষ হবে।"

মেজবউ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ছেলে মাত্রেই মানুষ হয়, কখনই ঘোঁড়া বা গরু হয় না।"

যতীশচন্দ্রও হাসিলেন। বলিলেন,—"তা' নয় একটা মানুষের মত মানুষ হইবে,—লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া দশটাকা রোজগার করিতে পারিবে।"

শ্বেতাঙ্গিনী মুখখানি কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বলিলেন,—"আপন ছেলেকে দেখিয়া সকলেই সে আশা করে,—কিন্তু ভাগ্যে অল্প লোকেরই তাহার সফলতা ঘটে। এখন যাই হোক্, -"তুমি যেন ভুলিয়া থাকিও না। এবার যেমন কিছু সঞ্চয় করিয়াছ, মাসে মাসেই তেমনি করিবে। আমার দুধের ছেলের ভাবনা ভাবিও। যে দিনকাল,—তাহাতে কাহারও ভরসা কাহারও নাই।"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"আমি যাহা আনিয়াছি, সমস্তই তোমার কাছে দিয়াছি, আমার হাতে একপয়সাও নাই।"

শ্বেতাঙ্গিনী। তোমার দরকার কি?

যতীশ। দরকার আছে বৈ কি। কাপড়-চোপড় সব কেনা হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনী। কাপড় ত এক রা'শ আসিয়াছে!

যতীশ নিস্তারের আসে নাই,—ভিখুর আসে নাই। নবার মাকে বছর বছর এক একখানা কাপড় দেওয়া হয়, এবারেও দিতে হবে—তা আনা হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনী। তা আমি কি করিব? আমার হাতে যাহা দিয়াছ, তাহা হইতে একটি পয়সাও আর পাইবে না। সে আমার খোকার তহবিলে জমা হইয়া গিয়াছে।

যতীশ। তা বলিলে চলিবে না। তিন শো টাকা আছে,—দু শো তুমি রাখ,—একশো আমায় দাও।

শ্বেতাঙ্গিনী। এক পয়সাও না।

যতীশ। তবে কি দিয়া সকল দিক সামলাইব? দোকানের উটনারদেনা, কলুর তেলের দাম, চৌকিদারি-ট্যাক্স, জমিদারের খাজনা, তা ছাড়া পূজার দিন—অপরাপর কত খরচ-পত্র আছে। সবই যে ঐ টাকা হইতেই মিটাইতে হইবে।

শ্বেতাঙ্গিনী। তবে সব টাকা আমার হাতে দিলে কেন?

যতীশ। সেটা এমন গুরুতর অপরাধ হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনী। আমাকে জ্বালাতন করিও না—আমি এক পয়সাও দিব না—দিব না—দিব না।

যতীশ। খরচ পত্র—

শ্বেতাঙ্গিনী। কিসের খরচ পত্র? ক্ষেতে ধান হ'য়েছে, তাই বিক্রয় কর।

যতীশ। সম্বৎসর সংসার চলিবে কিসে?

শ্বেতাঙ্গিণী। আমন ধান হবে।

যতীশ। আমনে-আউসে যাহা হয়, তাহাতেও বৎসর কুলায় না।

শ্বেতাঙ্গিণী। তুমি বোঝ ছাই,—সকলের খরচ, তুমি একা চালাইবে কেন? ধান বেচ—সংসার চলুক। এই তোমার ন-ভাই'র দেড় শো টাকা মাইনের চাকুরী হইল.—তখন না হয়, চাউল কিনিও।

যতীশচন্দ্র কিছু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু মেজবউ অবিচলিত-ভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্য সময়ে আরও একবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়া যতীশচন্দ্র বুঝিলেন, শ্রীমতীর হস্তগত অর্থের কপর্দ্দকমাত্রও প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

কলু আসিয়া দাদাঠাকুরদের শারীরিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যোগানের তৈল দান করিল। তৎপরে কর্ত্রীর নিকট প্রাপ্য মূল্য প্রার্থনা করিল।

• মাতা মধ্যম পুত্রকে বলিলেন,—"ভূষোর তেলের দাম হিসাব করিয়া মিটাইয়া দে।"

যতীশচন্দ্র ভূষো ওরফে ভূষণ গরাইয়ের সহিত হিসাব করিলেন। এগার টাকা নয় আনা আড়াই পয়সা তাহার পাওনা।

"কা'ল টাকা পাইবে' বলিয়া যতীশচন্দ্র তাহাকে বিদায় করিলেন। সে বিদায় হইতে না হইতে ঘোষাণী দুগ্ধের হিসাব লইয়া উপস্থিত হইল,—তাহার পাওনা বাইশ টাকা আট আনা। তাহাকেও কল্য টাকা দিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুদী আসিল। মুদীর অনেক টাকা বাকি,—প্রায় একশত। তারপরে মেছুনী আসিল, ময়রা আসিল, ধোবাবউ আসিল,—যতীশচন্দ্র সে দিনকার মত সকলকেই বিদায় দিলেন।

বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু পূজার সময়, এ সময়ে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া না দিলে কোন প্রকারেই চলিবে না। অথচ যাহা আনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই শ্বেতাঙ্গিণীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন,—তাহার এক পাই-পয়সাও পাইবার আশা বা সম্ভাবনা নাই! তবে এখন উপায় কি? ক্রমে অনেকখানি বেলা হইল,—বাদ্যোদ্যম সহকারে নদী হইতে নবপত্রিকাস্নান করাইয়া পুরোহিতগণ গৃহে ফিরিতে

লাগিলেন। যতীশচন্দ্র নিজকক্ষে অতি ম্লানমুখে বসিয়া অর্থচিন্তা করিতেছিলেন। এক একবার শ্বেতাঙ্গিণীর উপরে অত্যন্ত রাগ হইতেছিল;—আবার পরক্ষণেই কি এক অবক্তব্য—অজানিত মোহ-মদিরার নেশা আসিয়া সে রাগ উড়াইয়া দিতেছিল।

এই সময় ক্ষিতীশচন্দ্র কি একটা কার্য্যোপলক্ষে মেজদাদার নিকট আগমন করিলেন। মেজদাদার মুখ নিতান্ত মলিন-বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে।"

যতীশচন্দ্র মৃদু অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"না কোন অসুখ করে নাই।"

ক্ষিতীশ। তবে অমন করিয়া বসিয়া আছেন, কেন?

যতীশ। বড় ভাবনায় পড়িয়াছি,—এবার একটি পয়সাও আনিতে পারি নাই, অথচ সকলের টাকা না মিটাইলে নয়,—কা'ল দিব বলিয়া সকলকে বিদায় দিয়াছি, কিন্তু দিব যে কোথা হইতে তাহার স্থির নাই।

ক্ষিতীশ। ভাবনার কথাই বটে—কিন্তু উপায় কি?

যতীশ। টাকা কা'ল চাই-ই। পূজার সময়, এখন কিছু কোথাও ধার পাওয়া যাইবে না।

ক্ষিতীশ। না, তা' আর কোথায় পাওয়া যাইবে।

যতীশ। ধান আছে কতটি?

ক্ষিতীশ। বিক্রয় করিবেন?

যতীশ। অগত্যা। অন্য উপায় ত নাই।

ক্ষিতীশ। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত খোরাকীর ধান রাখিয়া একশত টাকার হইতে পারে।

যতীশ। আমন ধান আছে?

ক্ষিতীশ। যদি কার্ত্তিক মাসে জল হয়, তবে চারি পাঁচ মাসের খোরাকার ধান্য হইতে পারিবে।

যতীশ। যাহা অদৃষ্টে থাকে, পরে তাহাই হইবে। আপাততঃ কা'ল সকালেই ধানের খারদ্দার মিলিবে?

ক্ষিতীশ। তা মিলিবে। বলেন যদি আজই বিকালে বিক্রয় করিয়া দিতে পারি।

যতীশ। তবে তাই। কাল তাহাদের প্রাপ্য টাকা দিতেই হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

অষ্টমীর দিন চৌধুরী বাড়ী পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য মেয়েদের ডাক হইয়াছে। মেজবউ, ন' বউ কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইয়াছে—সেজ বউ যাইবে না।

না যাইবার হেতুবাদ কেহই আবিষ্কার করিতে সক্ষম নহেন। শাশুড়ী গিয়া কত সাধিলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিলেন,—সধবা স্ত্রীলোকের অষ্টমীর মহাপ্রসাদ না খাইলে গুরুতর প্রত্যবায় আছে, বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু সেজ বউ কিছুতেই যাইবে না।

তখন বড় বউ চেষ্টা করিলেন। তিনিও ব্যর্থ চেষ্টায় বেদনাগ্রস্ত হইয়া ফিরিলেন। অবশেষে বাড়ীর ঝি নিস্তার আসিল। সে অপারগ হইল, কিন্তু মূল কারণ আবিষ্কার করিল, বলিল,—"ভাল গহনা, ভাল কাপড় না থাকায় তিনি যেতে চাচ্ছেন না।"

বড় বউ বলিলেন,—"ওমা সে আবার কি কথা! যাদের ভাল কাপড়, ভাল গহনা নাই—তারা কি নিমন্ত্রণে যায় না! যা বোন্,—সময় কিছু চিরদিন এমন থাকিবে না। আর গহনা-পত্র যে সকল গেরস্তরই ঘরে থাকে তা নয়। বচ্ছরকার দিন, অমন করিতে নাই।"

পুচ্ছমর্দ্দিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া মেজবউ নিস্তারকে বলিল,—"তোকে কে সে কথা বলিল লা? দিন দিন তোর বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছে দেখ্‌ছি!"

নিস্তার সে স্থলে আর কথা কহা যুক্তি সঙ্গত নহে, বিবেচনায় সংযত বাক্ হইল। মেজ বউ বলিলেন,—"তবে কি জন্য যাইতে চাহিতেছ না?"

সে। আমার ইচ্ছা।

মে। তোমার ইচ্ছা! গৃহস্থের ঘরের বউ,—এমন আপন ইচ্ছায় চলিলে হইবে কেন?

সে। না হয়, যাহা করিলে ভাল হয় তাহাই হোক্।

মে। কি আর বলিব!

সে। বলিবে আবার কি? বলিলেই শুনিতে হইবে।

বড়বউ বলিলেন,—"সেজ বউ সে কি লা? ও যে তোর মেজ-জা। অমন কথা কি বলিতে আছে।"

সে। আমাকে কাহারও উপদেশ দিতে হবে না।

ব। কেন হবে না বোন্? তুই কি আমাদের পর? তুই যে কাজ না বুঝিতে পারিবি—আমরা তাহা বুঝাইয়া দিব। তোর অন্যায় হইলে তিরস্কার করিব। তুই যে আমাদের ছোট বোনের তুল্য।

সে। আমি সব বুঝি।

ব। বুঝিস্ তবে অমন করিস্ কেন?

সে। কি করি?

ব। পাগলামি।

সে। পাগল তাই পাগলামি করি।

ব। পাগলই বটে। এখন কাপড় পর্—ওরা দাঁড়াইয়া থাকিল, শীঘ্র যা!

সে। আমিত কাহাকেও দাঁড়াইয়া থাকিতে বলি নাই।

ব। তুই যেন বলিস্ নাই, কিন্তু ওরা তোকে রাখিয়া যায় কেমন করিয়া।

সে। পা দিয়া হাঁটিয়া।

ন-বউ হাসিয়া ফেলিল। হাসিটা তাহার অতিরিক্ততা। সে

হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর মেজ দিদি বুঝি তোমার কাঁধে চড়িয়া যাইবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

ন-বউর কথায় সকলেই হাসিয়া ফেলিল। কেবল মেজ বউ ক্রুদ্ধা সিংহীর মত আস্ফালন করিয়া বলিল,—"কিলা ছোটলোকের মেয়ে, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা! অত অহঙ্কার ভাল নয়। এখনও ত চাকুরী হয় নাই! ছাই প'ড়ে যাবে লো—ছাই প'ড়ে যাবে।"

বড় বউ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ষা'ট ষা'ট, এমন কথা বলিস্ না বোন্ ঐ একটু ক্ষীণ আলোর দিকে এতাবৎকাল হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। একা মেজ ঠাকুরপো আর কত পারিবেন। যদি মা দুর্গা মুখ তুলে চান্—আমরা সকলেই সুখী হব।"

মে। যে হবে সে হবে। আমি কাহারও অহঙ্কারের কথা সহ্য করিতে পারিব না।

ব। গালি দিবি উহাকেই দে;— গোড়া ধরিয়া টানাটানি কেন? যা এখন ওঠ্।

এই সময় শচীকে লইয়া চারি ভাই নিমন্ত্রণ খাইয়া বাটী আসিলেন।

যতীশচন্দ্র নিস্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব উঠানে দাঁড়াইয়া কেন? যা।

নিস্তার। সেজ বউ ঠাক্‌রুণ আস্‌ছেন না ব'লে কেউ যেতে পাচ্চেন না।

যতীশ। কেন তিনি যাচ্চেন না কেন?

নিস্তার। কি জানি বাবু,—আমরা গরীব মানুষ, আমরা ওর কি বুঝিব।

বড় বউ বলিলেন,—"এখনকার কালের বউ ঝি, ওদের অন্ত পাওয়াই ভার।

ক্ষিতীশচন্দ্র ততক্ষণ গৃহমধ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে সেজ বউও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

যতীশচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

শচীশচন্দ্র তখন পাঁচকড়ির ক্রোড়ে। বড় বউ বলিলেন,—"আমার চৌদ্দপুরুষ, আমার বাপের ঠাকুর, ঠাকুর দেখে এসেছে,—নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছে। বাবা, কেমন ঠাকুর দেখলে?

শচী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুন্দ দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া চক্ষু টানিল। সকলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া হাসিয়া উঠিল, পাঁচকড়ি বলিল,—"এত ঠাকুর থাকিতে অসুরের রূপ খানাই মনে রাখিয়াছে, কার্ত্তিক আর কি!"

বড় বউ ডাকিয়া বলিলেন,—'সেজ ঠাকুরপো, সেজ বউকে পাঠিয়ে দাও, বেলা গেল।"

তদুত্তরে বিরক্তিস্বরে ক্ষিতীশ বলিল,—"না সে যাবে না।"

ব ও মা, অষ্টমীর দিন সধবা বউ—মহাপ্রসাদ পাবে না?

ক্ষিতীশ। সধবা বিধবা হইলে আমিও বাঁচি—উহারও সোয়াস্তি হয়।

বড় বউ "ষা'ট্ ষা'ট্ করিয়া উঠিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী অনেক ক্ষণ চলিয়া গিয়াছিলেন।

তখন অগত্যা নিস্তারকে সঙ্গে লইয়া মেজ বউ ও ন-বউ চৌধুরী বাড়ী চলিয়া গেল। বড় বউ গৃহান্তরে গিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। পাঁচকড়ি শচীকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গেল। সেখানে দানীশ, যতীশ, পাঁচকড়ি ও শচী গল্প করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"যাই বল, তুমি মানুষ ভাল নও।"

রক্তমুখে ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে ঈষৎ ক্রন্দনস্বরে মেজ বউ বলিল,—"ভাল না হই, আমিই ভাল নই। আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—তোমার আপদ চুকিয়া যাক্।"

ক্ষিতীশ। আমি কোথায় পাঠাইতে যাইব, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

সে। আমার পোড়াকপাল, তাই আমাকে সকলেই দুই চক্ষের বিষ দেখ। আমার মরণ হ'লেই বাঁচি। হে যম,—তুমি আমাকে নাও।

সেজ-বউ'র ডাগর চক্ষু তখন জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে জলে ক্ষিতীশের প্রাণ দ্রব হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ কিঞ্চিৎ ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"তুমি যে নিতান্ত অবুঝ!"

সে। যাহার কপাল মন্দ, সে কিছুই বোঝে না। আমি কি করি?

ক্ষিতীশ। নিমন্ত্রণে সবাই গেল,—তুমি গেলে না কেন?

সে। আমি কি নিস্তারেরও অধম?

ক্ষিতীশ। সে কি? ও কথা কেন?

সে। নিস্তারের এসেছে সুন্দর রেলপেড়ে শাড়ী,—আর আমার একখানা রাঙ্গাপেড়ে ছাই।

ক্ষিতীশ। এই কথা? তার বিলাতী—তোমার দেশী।

সে। আর মেজ-বউ ন-বউ'র এক পাড়ের কাপড়—যেমন পাড়, তেমনি খোল।

ক্ষিতীশ। দাদা ঐ কাজটা ভুল ক'রেছেন। সেজ-বউ ন-বউ'য়ের একযোড়া আর মেজ-বউ'য়ের পৃথক একখানা আনিলেই ভাল করিতেন। যাক্ সে পাড়ের জন্যে আর কি হইল! কাপড় সব সমান।

সে। তা হোক্—আমার হাতে তিনটা ভাঙ্গা চুড়ি, একবার কেহ চাহিয়াও দেখিলে না। কিন্তু ন-বউ'র অমন চুড়ি ছিল,—আবার এক স্যুট চুড়ি আসিল।

ক্ষিতীশ। সেত মেজ দাদা আনেন নি, বড় বউ দিয়াছেন।

সে। যেই দিক্—কেন দেয় তা জান?

ক্ষিতীশ। না!

সে। তার স্বামী গুণবান্—তার বরের দেড়শো টাকা মাইনে হ'য়েছে তাই!

ক্ষিতীশ। সেত আমাদেরই ভাল।

সে। তোমার যেমন বুদ্ধি! কিসে ভাল?

ক্ষিতীশ। মাসে মাসে অনেক টাকা আমাদের সংসারে দেবে—আমাদের অভাবের দায় দূর হইবে।

সে। হ্যাঁ দেবে! দায়ে পড়িয়া যাহা দেবে, তাহার মত মুখনাড়া না দিয়া ছাড়িবে না। তোমার খাটুনি কি চিরদিনই বৃথা যাইবে?

ক্ষিতীশ। কেন? এবার ধান মন্দ হইয়াছে কি? সে দিন মোটামুটি একটা হিসাব ধরিয়া দেখিয়াছিলাম, সমস্ত খরচ পত্র বাদে প্রায় একশত টাকা লাভ হইয়াছে।

সে। কিন্তু তাহাতে তোমার কি? এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও কি কাহারও নিকট একটু সুখ্যাতি পাইয়াছ? আর ঐ যে তোমার রক্ত জলকরা ধানগুলা বিক্রয় হইয়া গেল, তুমি কি তাহা হইতে একটি পয়সা পাইলে? সবাই স্বাধীন,—বিদেশের পয়সা কত

আসিল, কত খরচ হইল, কত বা বাক্সে উঠিল,—কেহ বুঝিল না, কেহ খুঁজিল না। আর তোমার একটী পয়সার প্রয়োজন হইলে পাইবার উপায় নাই। তারপর লোকের মুখনাড়া খাইতে খাইতে প্রাণ গেল। ভিকু আর তুমি—নিস্তার আর আমি এ বাড়ীতে কোন প্রভেদ নাই।

বসন্তের মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ। সহসা তাহার অতি বিস্তারে মেঘের সান্ধ্য-ধূসরবর্ণচ্ছায়া দেখা দিল। ক্ষিতীশের রক্তোজ্জ্বল গণ্ড-দেশে সে ছায়া দেখা গেল,—কিন্তু সেজ বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বুঝি ক্ষিতীশচন্দ্রও তাহা উত্তমরূপ অনুভব করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রতিকূল বাতাসে এ মেঘ যদি সূত্রপাতেই দূর না হয়, তবে ইহাই সঞ্চারিত শক্তিবলে যে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না—কে বলিতে পারে?"

একটু গম্ভীর অথচ নম্র স্বরে ক্ষিতীশ বলিলেন—"সব বুঝি, কিন্তু সংসারে সর্ব্বদাই অসচ্ছল অবস্থা। দুই এক পয়সা সংস্থান করিব তাহার উপায় কৈ? ভগবানের ইচ্ছায় একটু সুবিধা হইলেই সে চেষ্টা করিব।

সেজ বউ মুখ খানা অত্যন্ত কালো করিয়া বলিল,—"মাঠখাটার কখনও সচ্ছল অবস্থা হয় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"এখনও ত রাত্রি প্রভাত হয় নি, তুমি উঠিবে কেন?"—দীর্ঘায়ত উদাস-করুণ নয়নযুগল স্বামীর মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া ন-বউ এই কথা বলিলে, দানীশচন্দ্র বলিলেন,—"তবে তুমি উঠিয়াছ কেন?"

শেষ রাত্রির শীতল বাতাসে গৃহস্থিত উজ্জ্বল আলোক কিঞ্চিৎ ক্ষীন-প্রভ হইয়াছিল। বাহিরের শেফালি গন্ধ, কোকিল, পাপিয়, দধিয়ালের স্বর-লহরী গৃহে আসিয়া উষা-সমাগম বিজ্ঞাপিত করিতেছিল।

ন-বউ তখন ভারি কাজে ব্যস্ত ছিল কি কাজ করিতেছিল, তাহার বড় একটা স্থির ছিল না। প্রভাতের গাড়ীতে দানীশচন্দ্র পশ্চিম যাত্রা করিবেন। সন্ধ্যা রাত্রেই তাঁহার ব্যাগ-ব্যাগেজ বাধা এবং সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল। তথাপি কিন্তু এ যাবৎ ন-বউয়ের কাজের অবধি ছিল না। কত রাত্রি থাকিতে সে যে উঠিয়াছে তাহা দানীশ জানে না। সে উঠিয়া এখানকার ব্যাগ সরাইয়া ওখানে রাখিতেছে—সেখানকার ব্যাগেজ টানিয়া এখানে রাখিতেছে। স্বামার জুতা জোড়াটা কোট কাপড়গুলা কতবার ঝাড়িতেছে. কতবার ফুঁ দিয়াছে, এবং কতবার সরাইয়াছে. তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামীর জন্য যে খাবার প্রস্তুত ছিল, তাহা পিপীলিকার আক্রোশ হইতে রক্ষা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। নিঃশব্দে সমস্ত গৃহে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সমস্ত কার্য্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে,—পাছে তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু এত করিয়াও প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্বামী জাগিয়া পড়িলেন। ন-বউয়ের মনে বড় কষ্ট হইল,—সে ভাবিল বুঝি তাহারই

অসাবধানে কিরূপ শব্দ হইয়াছিল, তাহারই জন্য বুঝি তাহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

স্বামীর কথার উত্তরে ন বউ বলিল,—"আমি উঠিয়াছি তাহাতে আর কি হইল, আমিত আর বিদেশে যাচ্চিনা যে বিনিদ্রায় পথে কষ্ট হবে।"

দানীশ ততক্ষণ উঠিয়া বসিয়াছিলেন. মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ঘুমের ব্যাঘাত হইবে না বরং বাড়াবাড়িই হইবে। বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় গাড়ীর মধ্যে নিদ্রাই অবলম্বন।"

ন-বউ'র বুকের মধ্যে কেমন একটা আকুল উচ্ছ্বাস উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। চক্ষুতে জল আসিল। তাড়াতাড়ি রুদ্ধশ্বাসে সে বাহির হইয়া আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া আসিল।

তপ্ত নিশ্বাসের সহিত একটি বিরহ কবিতার আশা দানীশচন্দ্রের হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল,—হায়, তাঁহার স্ত্রী যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা!

দানীশচন্দ্র ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন,—"ভোর হইয়া গিয়াছে। গাড়ী আসিতে মোট আর একঘণ্টা বিলম্ব!"

মোট একঘণ্টা! শান্তির সমস্ত হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল।

দানীশ উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কিছু জলযোগ করিতে বসিলেন।

তখন নৈশ অন্ধকার বিদূরিত এবং দিবালোক বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে। তখনও নৈশফুল্ল কুসুমপরিমল-গন্ধী শীতল বায়ু মৃদু মৃদু বহিতেছিল।

গাড়ীর আর বিলম্ব নাই, জানিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র দুইজন কুলী সঙ্গে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া ডাকিলেন,—"দানীশ গাড়ীর বিলম্ব নাই, তুমি কি প্রস্তুত হইয়াছ?"

ভোজনপরায়ণ দানীশচন্দ্র গৃহমধ্য হইতে বলিলেন,—"এই আমার খাওয়া হইল, আর সব প্রস্তুতই আছে। কুলী আসিয়াছে কি ?"

ক্ষিতীশ। দু' জন কুলী আসিয়াছে।

দানীশ। আমারও হইয়াছে।

শান্তি কি আনিতে যাইতেছিল, একটা ব্যাগেজে পা বাধিয়া হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইল, দানীশ বলিলেন, —"তুমি বড় ব্যস্ত-বাগীশ্‌ !"

শান্তির চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সে মনে মনে বলিল,—"আমি ব্যস্ত-বাগীশ্‌, না তুমি ব্যস্ত-বাগীশ্‌! তোমাকে এত তাড়াতাড়ি কে যাইতে বলিয়াছিল! তুমি যে আগে কত আশা দিতে, ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে আসিয়া চিকিৎসা-কার্য্য করিব। এখন বিদেশে যাও কেন ?" কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিল না,—কেন বলিব ? লজ্জা করে না বুঝি ?

আহার সমাপ্ত করিয়া দানীশচন্দ্র নিজের লগেজগুলি গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। ক্ষিতীশচন্দ্র তাহা কুলীদিগের মাথায় তুলিয়া দিলেন। দানীশচন্দ্র ততক্ষণ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন তারপরে শান্তির ফুল্লরক্ত—কুসুমকান্তি গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের কোমল অঙ্গুলির টীপ দিয়া দানীশ বলিলেন,—"তবে যাই ?"

বর্ষার গোলাপের মত জলভরা ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটী স্বামীর মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া, ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া, ধরা গলায়, ভরা আওয়াজে শান্তি বলিল—"কবে আসিবে ?"

ও ছি! ছি! এই কথার কি এই উত্তর ? কৈ সে ব্যথিত বিদীর্ণ আসন্ন বিরহের মর্ম্মোচ্ছ্বাসিত কাবতা কোথায় ? কোথায় সে দরশ-পরশ-আশয়হীনার কল্পিত-কাহিনীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তস্বর ?

দানীশ অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—"যখন অবসর পাইব।"

কিন্তু হায়! তথাপি তো শান্তি গাহিল না,—"আমি নিশিদিন রব তোমার আশায়, তুমি অবসর মত আসিও!"

তখন নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে দানীশ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। প্রাঙ্গণে দানীশের মাতা, বড় বউ, যতীশচন্দ্র এবং আরও অনেকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দানীশ পূজনীয়গণের পদধূলি মস্তকে লইলেন। সকলেই ছলছলনেত্রে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দানীশ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। ক্ষিতীশ তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিলেন।

শান্তি গৃহতলে বসিয়া পড়িল,—তাহার জ্ঞান হইতেছিল, কে যেন একান্ত জোর করিয়া তাহার দেহমধ্য হইতে প্রাণটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

সকলে আপন আপন কাজে চলিয়া গেল, বড় বউ শান্তির কাছে গেল। দেখিল, পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছে, সান্ধ্যনলিনী পরিম্লান হইয়া গিয়াছে। শান্তির সুন্দর সহাস মুখে কালি ঢালিয়া দিয়াছে। সদা প্রফুল্ল চক্ষু দুইটি স্ফীত, রক্তাভ ও জলপূর্ণ হইয়াছে।

বড় বউ তাহার মুখখানি ধরিয়া ঈষদুন্নত করিয়া বলিলেন,—"ও কি লা, মানুষ কি বিদেশে যায় না? আর কবেই বা দানীশ তোর আঁচল ধরিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত? ওত চিরকালই বিদেশে!"

বায়ু-সঙ্ঘাতে গোলাপের সঞ্চিত জল ঝরিয়া পড়িল। শান্তি অতি কষ্টে চক্ষুর জল এতক্ষণ চক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না—ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আঁচলে মুছিয়া বলিল,—"এ যে অনেক দূর!"

"ওমা গাড়ীর পথ আবার দূরাদূর!" -আয় আমরা কাজ

করিগে”—এই কথা বলিয়া বড় বউ তাহাকে টানিয়া লইয়া রন্ধনগৃহে গমন করিলেন।

কিন্তু শান্তি সে দিন কাজে বড়ই গোল পাকাইয়া দিল। তিনটা হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া, চাউলে লবণ মিশাইয়া, জলের কলসীতে তৈল ঢালিয়া বড় ক্ষতি করিয়াদিল। মেজো বউ জানিতে পারিলে “কুরুক্ষেত্র” বাধাইয়া দিত, কিন্তু রক্ষা এই যে বড় বউ সে সকল গোপন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দানীশচন্দ্র মজঃফরপুরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বয়সে নবীন হইলেও শিষ্ট স্বভাবে ও কার্য্যকুশলতায় অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিলেন।

ছয় মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই দানীশের যশঃ ও খ্যাতি যথেষ্ট হইয়াছিল। অনেক বন্ধুবান্ধবও যুটিয়াছিল।

কিন্তু অতৃপ্ত-প্রেম-তৃষাতুর-হৃদয় প্রেমের জন্য দিবানিশি ঝরিয়া মরিত! যেমন সুনিপুণ অভিনেতার অভিনয়োক্তির এক একটি আকুল বর্ণ-বিন্যাসকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ উদ্দামগতিতে বেগে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে, দানীশের প্রাণও একটি সুশিক্ষিতা প্রণয়িনীর জন্য তেমনই ক্ষুব্ধ প্রহত ও রূপগুণের মিশ্ররসে বিপুলভাবে পরিপুষ্ট হইয়া পরিপূর্ণ বেগ সঞ্চয় করিয়াছিল।

শ্রাবণ মাস। সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সমস্ত দিনের বৃষ্টিতে ধরণীবক্ষ আর্দ্র ও সিক্তগন্ধ-পূর্ণ হইয়াছিল। তখন মধ্যাহ্নকাল। সে দিন দিনদেব উদিত হইতে পারেন নাই, মেঘের আড়াল দিয়া আপন গতি-পথে চালিয়া যাইতেছিলেন। রজতকণানিভ বৃষ্টি-বিন্দুতে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন—প্রকৃতি নিস্তব্ধ।

এমন বর্ষণার্দ্র নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে নিঃসঙ্গ মানুষের প্রাণ সঙ্গলাভাশায় উদ্যত হয়। দানীশ তখন তাহার বাসাগৃহে একা। তাহার প্রাণ বড়

উদাস.—উদাস-বিহ্বল প্রাণে তখন কত কথা জাগিতেছিল। সুদূর পল্লীর নিস্তব্ধ গৃহ—সুদূর পল্লীর নিস্তব্ধ গৃহ কক্ষ মধ্যস্থ সেই নীরব-প্রেমের নীরব কাহিনী! বিদায় কালের সেই জলভরা চক্ষু,—সেই বায়ুতাড়িত ফুল্ল কোকনদ-সদৃশ কম্পিত রক্তাধর! বড় ইচ্ছা হইতেছিল, বুঝি এমন দিনে সেখানে থাকিলে, প্রাণ এমন উদাস হইত না।

পরক্ষণেই মনে হইল,—তাহা হইলে কি হইত! সে কিছুই জানে না। জানে কেবল গৃহকার্য্য করিতে,—পরিচারিকায় যাহা করে, সেও তাহাই করিতে জানে। কাব্যকলা বা সঙ্গীত বিদ্যার ধারও ধারে না। তবে তেমন মিলনে এ উদাস ভাব দূর হইত কিসে?

তখন বঙ্গ সমাজের উপর দানীশের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি মনে করিলেন, যাহাতে বঙ্গসমাজে অবাধ-স্ত্রীশিক্ষা এবং যৌবন-বিবাহ ও "কোর্টসিপ" প্রথার প্রচলন হয়, তজ্জন্য মাসিক কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু হায়, দানীশ বুঝে না যে, তাঁহার মত লোকের সে উদ্যমে বঙ্গ-সমাজের একটি কেশমূলও নড়িবে না,—কেবল তাঁহার কালী-কলম কাগজ এবং কিঞ্চিৎ সময় নষ্ট হইবে মাত্র। বঙ্গ সমাজরূপ বিশাল মহীরুহ যে বীজশক্তিতে দণ্ডায়মান,—স্বার্থান্ধ মানব তাহার কি করিতে পারিবে?

তারপরে দানীশের মনে হইল,—এ হৃদয়ের এ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি এমনই ভাবে চির-জাগরূক থাকিবে! বাসনার কি নিবৃত্তি হইবে না, আশার সুশার কখনও কি হইবে না!

চিন্তাক্লিষ্ট দানীশ তখন হারমোনিয়মটি টানিয়া লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"একখানা চিঠি লইয়া একটা লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।"

দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভদ্রলোক না কি?"

ভৃত্য বলিল —"আজ্ঞে না, কাহারও বাড়ীর চাকর হইতে পারে।"

"চিঠি নিয়ে আয়"—এই কথা বলিয়া ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়া, দানীশচন্দ্র হারমোনিয়মটিকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন। তিনি বুঝিলেন, তখনই কোন রোগীর বাড়ী গমন করিতে হইবে।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া দানীশের হাতে পত্র প্রদান করিল। পত্র-খানির বাহ্যাবরণ অতি সুন্দর। একখানি মোটা মসৃণ লেফাফার উপরে নয়া বিলাতী পরা,—দানীশের নামে ইংরাজীতে শিরোনামা দেওয়া।

দানীশ পত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেন, তীব্র মধুর বিলাতী এসেন্সের গন্ধে কাগজখানি পূর্ণ। উপরে মটোছাপা—নিম্নে মুক্তাসদৃশ বঙ্গাক্ষরে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

প্রিয় ডাক্তার বাবু!

আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কিন্তু বিপদ্‌কালে লজ্জা থাকে না। আমার বড় বিপদ। সাত দিন হইল, কলিকাতা হইতে আমার মা আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার বড় জ্বর। অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। এ সময়ে আপনার সাহায্য না পাইলে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আশা নাই। বেহারা ও পাল্কী পাঠাইলাম, দয়া করিয়া অধিনীর আবাসে পদার্পণ করিয়া চির-বাধিত করিবেন।

আপনারই--

যূথিকা দাস বি, এ,।

মিশনারি বালিকা-বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

এবং

"স্ত্রীশিক্ষা" মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা।

দানীশচন্দ্র পঠিত পত্র পুনরপি পাঠ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে স্ত্রীলোক এমন ভাবপূর্ণ ভাষায় পত্র লেখে, তাহার হৃদয় না জানি কি গভীর প্রেমের আধার।

তিনি বহির্গমনোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাল্কীতে গিয়া আরোহণ করিলেন। বাহকগণ ভিজিতে ভিজিতে পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নগরোপান্তে একটি নব গঠিত সুন্দর ক্ষুদ্র অট্টালিকায় যুথিকার বাস। অট্টালিকার সম্মুখে ক্ষুদ্র একটি সুবিন্যস্ত কুসুমোদ্যান। উদ্যান মধ্যে জলের কৃত্রিম ক্ষুদ্র ফোয়ারা, কৃত্রিম ক্ষুদ্র পাহাড়। ক্ষুদ্র উদ্যান-বীথিকা দিয়াই বাটী প্রবেশের পথ। পথটি লালবর্ণের ইষ্টকচূর্ণ রচিত,—দুই ধারে অরকোরিয়া বিগোনিয়ার সারি।

পাল্কী লইয়া সে পথে গমন করা যায় না, কাজেই বাহকগণ গেটের সম্মুখে পাল্কী থামাইল। দানীশচন্দ্র পাল্কী হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া টুপী মাথায় দিয়া উদ্যানপথে চলিলেন। একজন বেহারা আগে আগে ছুটিয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

অট্টালিকায় উঠিতেই খোলা দালান,—দালানের দুই পার্শ্বে দুইটি কক্ষ। কক্ষদ্বারে সুরঞ্জিত বস্ত্রের পরদা ঝুলিতেছে। তাহারই পশ্চিম দিকের কক্ষপর্দ্দা টানিয়া ধরিয়া বেহারা বলিল,—"ডাক্তার সাহেব এসেছেন"

ধীর-মন্থর গজেন্দ্রগমনে এক বিচিত্রবেশা রূপসী যুবতী পর্দ্দার বাহির হইলেন।

ফণিণীসদৃশ কুসুমগন্ধা বেণী তাহার পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছিল, পরিধানে সেমিজ, সেমিজের উপর ফরাসডাঙ্গার ফিতাপেড়ে মিহি ধুতি। গায়ে মূল্যবান জ্যাকেট তদুপরি চারু অঞ্চলে আবৃত। পায়ে মোজা ও লেডীস্ সু।

এখন রূপ-বর্ণনা। সে বড় বিষম সমস্যা! এ রূপের বর্ণনা করা যে সে লেখনীর সাধ্য নহে। হাব-ভাব-লীলাময়ী রূপসী স্থিরযৌবনা

তপস্যাবিঘ্নকারিণী মায়াবিনীর কথা যিনি শুনিয়াছেন, অথবা মদন-মদোন্মাদকারী বন্ধন-শূন্য ভুবনমোহনরূপ—যে রূপে বিশ্বের যৌবন মুগ্ধ লুব্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার কথা যিনি শুনিয়াছেন—তিনি ইহার কল্পনা করুন। অক্ষম হইলে অন্যঃপন্থা ধরুন,—একাধারে তারকার হাসি, সৌদামিনীর চাঞ্চল্য কুসুমের সুরভি, বসন্তের বর্ণ, পাষাণ প্রতিমার গঠনগৌরব এবং কাব্যের ছন্দ ও ধ্বনি সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বোপরি নিজের প্রচুর হৃদয়াবেগ ঢালিয়া কল্পলোকে সে সুষমাকে অপূর্ব্ব মোহ-আবরণে আচ্ছন্ন করুন, সে তনুর তনিমা বুঝিতে পারিবেন। ফল কথা যুবতী অনিন্দ্য, অপূর্ব্ব অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দরী। এমন ভুবনমোহিনী লালসাময়ী রূপ-সৌন্দর্য্য বুঝি আর দ্বিতীয় নাই। এ রূপ যে দেখিত, সেই মজিত। সে রূপ দেখিয়া দানীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন।

এই বন্ধনমুক্তা কামিনীসুলভ কোমলতা বিরহিতা, স্বেচ্ছাবিহারিণী যুবতীর রূপাগ্নিতে কত পুরুষ-পতঙ্গ ঝলসিয়া মরিয়াছে—কত তপস্বী তপস্যাহুতি দিয়াছে! রূপের মোহ কোথাও সুখের কারণ নহে। রূপ ত দুঃখেরই মূল। যাহার রূপ আছে, সেও দুঃখ পায়, যে সেই রূপে আকৃষ্ট, সেও দুঃখ পায়! কঠোর হৃদয়-লালসা-বিজড়িত কামুকের দৃষ্টিপথে পড়িয়া রূপ বিপন্ন, বিপ্রলব্ধ, বিপর্য্যস্ত হয়;—আবার কতশত কোমল, সরল, সম্মানার্হ, রূপের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া গর্ব্বিত দাম্ভিক রূপ-সৌন্দর্য্য কর্তৃক পদ-দলিত নিষ্পেষিত হইয়া থাকে।

প্রথমে যুথিকাই কথা কহিল। বাঁশরীর কোমল গান্ধারের ন্যায় সে স্বর সুমিষ্ট। যুথিকা বলিল,—"আপনার করুণা সীমাহারা। এই বর্ষণাচ্ছন্ন দিবসে আপনি যে দয়া করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট চিরঋণী হইলাম। মা বাড়ীর মধ্যে আছে, চলুন।"

দানীশ হঠাৎ সে কথার সঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে

উপস্থিত মতে যাহা হয় কিছু বলিলেন, তারপরে রোগী দেখিবার বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

যুথিকার আদেশে ভৃত্য সম্মুখের দরোজা খুলিয়া ফেলিল। "বাড়ীর মধ্য" উন্মুক্ত হইল। সেই গৃহে একটা শয্যার উপর এক বৃদ্ধা পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে,—ত্রিসীমানায় কেহ নাই।

ডাক্তার রোগীণীকে ডাক দিলেন। রোগীণী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিল, "বড় পিপাসা, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল চাহিয়া পাই নাই, একটু জল দিবেন কি? নিকটে কেহ নাই—কেহ থাকে না!"

ডাক্তার যুথিকার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপরে বলিলেন, "রোগীর কাছে সর্ব্বদা একজনের থাকা আবশ্যক।"

যুথিকা। কি করি মহাশয়, এখানে তেমন লোক মিলে না। আমার ঐ একটী বেহারা আর একটী 'কুক্,' কাজ অনেক,—বেহারাই মধ্যে মধ্যে দেখে শোনে। আমি কিন্তু স্পর্শ করিতে ভয় পাই। মা আমার কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। কলিকাতায় বসন্ত, প্লেগ বারোমাস বর্ত্তমান! নিতান্ত না হইলে বঙ্গের ম্যালেরিয়ার ভয়ও আছে,—তাই আমি সাহস করিয়া মায়ের ঘরে বড় আসি না,—স্পর্শও করি না। সাবধানের বিনাশ নাই, কি বলেন, ডাক্তার বাবু? আপনার মত কি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আপনি যে মত প্রকাশ করিলেন, জ্ঞানী মাত্রেরই ঐ মত। এই জন্যই রোগীর শুশ্রূষার কারণ নার্শের উদ্ভব।"

যুথিকার মাতা যন্ত্রণার স্বরে বলিলেন,—"কৈ জল কোথায়?"

বেহারা একটু জল তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। ডাক্তারবাবু তখন রোগী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

যুথিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখিলেন?"

ডাক্তার। ভয়ের কারণ এমন কিছু নাই, ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটীস্।

যুথিকা। কত দিনে আরোগ্যের সম্ভাবনা?

ডাক্তার। আট দশ দিন। তবে শুশ্রূষার বন্দোবস্ত একটু ভাল রূপে করিতে হইবে।

যুথিকা। আমি লোক কোথায় পাইব ডাক্তারবাবু? আপনার কথা শুনিয়া আমার 'নার্ভ'গুলা অতি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে।

ডাক্তার। আপনার ভয় নাই,—আমিই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

যুথিকা। ধন্য আপনার বিশ্ব-প্রেমের বিপুল করুণা; ধন্য আপনার নিষ্কাম কর্ম্মের আকুল বাসনা! কিন্তু আপনি 'নার্শ' কোথায় পাইবেন?

ডাক্তার। সরকারী ডাক্তারখানায় কয়জন আছে। তাহাদিগকে কিছু কিছু দিলে আসিয়া সমস্ত কাজ করিয়া দিয়া যাইবে। সে ব্যবস্থা আমিই করিয়া দিব। আমার অনুরোধে তাহারা বোধ হয় বিনা অর্থেই আসিতে পারে।

যুথিকা। আপনি আদর্শ মানব। আ'জ হইতে আমি আপনার পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিলাম।

ডাক্তার সাহেবের হৃদ্‌পিণ্ডটা বড় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। বলিলেন,—"ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেই, বেহারা ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে যাক।"

যুথিকা। ঔষধের মূল্য কত?

ডাক্তার। লাগিবে না। আমি সরকারী ডাক্তারখানায় লিখিয়া দিতেছি।

যুথিকা। এ প্রেমের প্রতিদান নাই। তবে আসুন, আমার কক্ষে যাই। সেখানে লেখনোপযোগী সমস্তই আছে।

তখন যুথিকার সঙ্গে দানীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। ভৃত্য দরোজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কক্ষাভ্যন্তর অতি সুচারুভাবে সজ্জিত। কক্ষতলে গালিচা পাতা, গালিচার উপরে একখানি মরক্কোলেদার-মণ্ডিত টেবিল। টেবিলের চারিপার্শ্বে চক্রাকারে বস্ত্র-মণ্ডিত বিবিধ ভঙ্গিমাযুক্ত কয়েকখানি চেয়ার। দেওয়ালের ধারে ধারে গ্লাসযুক্ত অনেকগুলি আলমায়রা—সকলগুলিই পূর্ণগর্ভ। গর্ভমধ্যে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পুস্তকের রাশি। দেওয়ালগাত্রে স্বর্ণবর্ণ ফ্রেমে আঁটা অনেকগুলি ছবি, ব্রাকেট, কৃত্রিম ফুলের গুচ্ছ, লতার বিতান আর মধ্যস্থলে সেথ্‌ টমাসের গোলাকার একটী ঘড়ি। টেবিলের পার্শ্বে একখানি বেঞ্চের উপরে বাদ্যযন্ত্র সাজান--হারমোনিয়ম, পিয়ানো, বীণা। টেবিলের উপরে পুস্তক, পত্রিকা, দোয়াত, কলম, কাচের কত কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ দ্রব্যসম্ভার। গৃহখানি সর্ব্বদাই এসেন্স-গন্ধে অধ্যুষিত।

যুথিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোমলকরপল্লবদ্বারা একখানি অতি মনোহর চেয়ার ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন,—"আপনি বসুন। বিশ্রাম করুন। অনেক কষ্ট দিলাম,—ক্ষমা করিবেন।"

দানীশ মৃদু হাস্যাধরে বিনীতস্বরে বলিলেন,—"আপনি বসুন।"

তখন উভয়ে একযোগে একই মুহূর্ত্তে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। যুথিকা একখানি কাগজ সরাইয়া দিয়া বলিল,—এখনই লিখিবেন কি?"

"হাঁ, এখনই লিখিব"—এই কথা বলিয়া দানীশ তখনই একটা প্রেস্কৃপ্‌শন্ লিখিয়া যথোপযুক্ত উপদেশসহ ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিলেন, ভৃত্য তাহা লইয়া প্রস্থান করিল

দানীশ বলিলেন,—"আপনার মাসিকপত্রের গ্রাহকসংখ্যা কত ?"

যুথিকা গম্ভীরভাবে বলিল,—"অতি কম। একশতের অধিক নয়। তার মধ্যে দাম দিয়া বড় কেহই পড়ে না। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বাঙ্গালীর উন্নতি-আশা এখনও সুদূর পরাহত। আপনারও কি মনে তাহাই ধারণা হয় না? যে দেশে শিক্ষিতা রমণী-সম্পাদিত মাসিক পত্র প্রতি গৃহস্থের গৃহিণীর কক্ষে শোভা পায় না, সে দেশ যে এখনও ঘোর তিমিরাবৃত এবং সে জাতির উন্নতি-আশা যে সুদূর ভবিষ্যতগর্ভে নিহিত তাহা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

দানীশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ইহা একান্ত সত্য কথা।"

যুথিকা। আপনি কি কখনও আমার কাগজ পাঠ করেন নাই ?

দানীশ। না, সে সৌভাগ্য আমার কখনও ঘটে নাই।

যুথিকা। এখানে একখানিও কাগজ নাই যে, আপনাকে দেখাইব, তবে বর্ত্তমান মাস হইতে একখানি করিয়া কাগজ আপনাকে পাঠাইব। এই দেখুন এ মাসের কাগজের দ্বিতীয় ফর্ম্মার 'প্রুফসিট,' লেখা অতি চমৎকার। একটু 'ম্যাটার' কম পড়িয়া গিয়াছিল,—তাই তাড়াতাড়ি একটা কবিতা লিখিতেছিলাম। ভাগ্য, আপনি আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করা হইয়াছিল; নচেৎ আপনি আসিলেও আমি উঠিতে পারিতাম না। আপনি বোধ হয় তাহা হইলে আমার সে ক্রটি মার্জ্জনা করিতেন,—কেন না, আপনি সুশিক্ষিত, কবির সম্মান বুঝেন। কবির ধ্যান ভাঙ্গানো যে একটা ঘোর অপরাধ তাহাও আপনি স্বীকার করিবেন। এই দেখুন না, কবিতাটা প'ড়ে দেখুন,—আপনাকে দেখাইতে না পারি, এমন দ্রব্য এখন আর আমার কিছুই নাই।

দানীশ। আমি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি।

যুথিকা একখানি কাগজ টানিয়া দানীশের সম্মুখে ধরিল। দানীশ তাহা আদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অতি যত্নে পাঠ করিতে লাগিলেন। যুথিকার সেই কবিতাটি এইরূপ ঃ—

"নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে,
তটিনী মিশিছে সাগর-পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির-সুখময় প্রণয়-ভরে!
"জগতে কিছুই নাহিক একেলা.
সকলি বিধির বিধান-গুণে
একের সহিত মিলিছে অপরে,
আমি বা কেন না তোমা ানে?

* * * *

"ওই দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ' পরে ঢেউ পড়িছে চ ল,
সে ফুলবালারে কেবা না দোষিবে
ভাইটিরে যদি যায় সে ভু ।!
"রবিকর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশিকর চুমে সাগর-জল
তুমি যদি মোরে না চুম হে সখা
এ সব চুম্বনে তবে কি ফ ?"

কবিতাটি যে যুথিকার প্রসূত সন্তান ন —পোষ্য পুত্র মাত্র— শেলীর কবিতা বিশেষের 'স্বাধীন অনুবাদ' মা দানীশ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ফলে, দানীশচন্দ্র সে কবি াঠ করিয়া প্রীত-মুগ্ধ হইলেন! পুরোদেশে কবিতা রচয়িত্রী— ম্মিত অধর, প্রাণে

কবিতার চুম্বন-কাহিনীর প্রীতিস্বর। হায়, কেহ কি তাঁহাকে কবি কথায় বলিতে পারে না, যে,—

"রক্তিম অধর ধরি নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দাও।"

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"কবিতাটি কেমন হইয়াছে? আপনি ভাবুক, আপনি প্রেমিক,—তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

দানীশ। এমন কবিতা যে বাঙ্গালা ভাষায় হইতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না! বলিতে কি কবিতার ভাব আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া. প্রাণের মধ্যে একটী ক্ষীণ মিলন-আশা জাগাইয়া তুলিয়াছে,—এমন আকুল-বাসনা বুকে বায়রণ, বর্ণস্ও জাগাইতে পারে না!

যূথিকা। আমার কবিতা লেখা সার্থক হইল! আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি,—আমি হীনা, দীনা রমণী, আপনার জন্য কি করিতে পারি? যদি অনুমতি করেন যন্ত্রযোগে দুই একটি গান গাহিয়া আপনার কোমল চিত্ত অনুরঞ্জনের চেষ্টা করিতে পারি।

দানীশ। আমি আপনার নিকট আজ যথার্থই একটি রূপ গুণ-মণ্ডিতা স্বর্গীয়া দূতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এ মিলন এ জীবনে ভুলিব না। যদি দয়া হয়, নিজ বাক্য পালন করুন।

যূথিকা হারমোনিয়ম বাহির করিয়া বেলো করিতে লাগিল। তার পরে হারমোনিয়মের সুরের সহিত নিজ মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিল,—

ওগো, খুঁজেছি প্রণয়ে সারা বিশ্বমাঝে
পাইনি কোথাও সাড়াটি তার!
খুঁজেছি বিষাদে বিরাগ-ভরে
খুঁজেছি প্রণয়ে নয়ন-জলে

যুথিকা হারমোনিয়মের সহিত নিজ মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিল—৬৪ পৃষ্ঠা।

The Emerald Printing Works,
6, Simla Street, Calcutta.

খুঁজেছি হরষ-মথিত হৃদয়ে
দেখিনি কোথায় বসতি তার!
প্রভাত-সমীরে সাঁঝের গগনে
তারার হাসিতে চাঁদের বয়ানে
হৃদয়ে বাহিরে নিখিল ভুবনে
দেখিনি কেমন মূরতি তার!
আজি গো সখা, গোপন এ পুরে
নিস্তব্ধ নিশীথে বেহাগের সুরে
দেখিনু; মিলিত উজল-ভাস্বরে
নয়নে সে দীপ্তি ভাতে' তোমার!

সুগন্ধি মুখরিত সুখদর্শন দ্রব্য সম্ভার সুসজ্জিত সেই রমণীর কথাটী সুস্বর লহরীতে পূর্ণ হইয়া গেল! গ্রামে গ্রামে গানের সুর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। গায়িকার ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর-যুগল মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। রক্তগণ্ডে, গোলাপী কপোলে বিন্দু বিন্দু মুক্তাফল-সদৃশ ঘর্ম্মবিন্দু শোভা পাইতেছিল। সমীর চুম্বিত কপোলপতিত কেশ-দাম ক্ষুব্ধ লুব্ধ মধুপের ন্যায় মুখকমলের উপরে দুলিতেছিল। চম্পক-কলিকানিভ করাঙ্গুলিগুলি হারমোনিয়মের উপরে ছুটিতেছিল—ঘুরিতে-ছিল—ফিরিতেছিল। পীনবক্ষ প্রসারিত সঙ্কুচিত হইতেছিল,—মোহ-মুগ্ধ নয়নে দানীশ সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন। মোহমুগ্ধ কর্ণে সে সঙ্গীত-শ্রবণ করিতেছিলেন। আর গানের কথাগুলি বড় উদ্দাম গতিতে তাঁহার প্রাণের কাণে পঁহুছিয়া প্রচণ্ডাবেগের সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে গান থামিল। কোমলকর ধৃত সুবাস-প্রক্ষিত চারু রুমালে অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল মুছিয়া, রুমালখানিকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, যুথিকা বলিল,—"আপনাকে কি বিরক্ত করিতেছি?"

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দানীশ বলিলেন,—"জীবনে এ আনন্দ এই প্রথম। ভরসা করি, ইহাই শেষ হইবে না।"

যুথিকা শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—"সে কি, অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনিবেন না। আপনার মোহন-দর্শন জীবনে জড়ান, কোথাকার এক অননুভূত ভাবরাশি আসিয়া আমাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ডাক্তার বাবু, দয়া করিয়া মধ্যে মধ্যে আপনি কি অধিনীর আবাসে আগমন করিবেন? না আসিলে আমি বড়ই কষ্ট পাইব।"

দানীশ বলিলেন,—"যদি বাধা না থাকে, প্রত্যহ একবার করিয় আসিব?"

যুথিকা। বাধা? সে কি কথা বলিলেন? প্রকৃত বন্ধুত্বের মিলনে কোন বাধা তিষ্ঠিতে পারে না। হাঁ, আসল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছি। আপনার ভিজিট কিঁ দিতে হইবে?

দানীশ। ভিজিট? আপনি ভিজিট দিবেন? আমাকে আপনার বন্ধুমধ্যে গণ্য করিলেই আমি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

যুথিকা মৃদু হাসিয়া এবার পিয়োনোর সঙ্গে আবার একটি গান গাহিল। গান সমাপ্ত হইলে দানীশ শত ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিদায় চাহিলেন।

যুথিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আবার কখন আসিবেন? জানিতে পারিলে, সেই সময় পাল্কী পাঠাইব। ডাক্তার বাবু, যাকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি,—সে বিপদ হইতে আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।"

দানীশ। পাল্কী পাঠাইবেন না,—আমি আমার গাড়ীতেই আসিব। কল্য সকালেই আবার আসিব।

যুথিকা। আপনার অযাচিত কৃপা, বর্ষার বারিধারার ন্যায় হৃদয়ধরা শীতলকারিণী। 'নার্শ' সম্বন্ধে যে হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন।

দানীশ বিদায় লইলেন। দালান উত্তীর্ণ হইয়া সোপনে নামিয়া একবার ফিরিয়া চাহিলেন,—দেখিলেন দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী আয়তলোচনের উদাস দৃষ্টিতে এখনও তাঁহার পানে চাহিয়া আছে!

দানীশের আর পা উঠে না,—তাঁহার মনে হইল, এই অমৃতভোগ যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে মানুষ না দেবতা? সম্মুখের দেবদারু বৃক্ষ হইতে একটা বায়সবর কঠোরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। দানীশ ডাক্তারী জানিত, কাকচরিত্র জানিত না। জানিলে বুঝিত, বায়স কর্কশকণ্ঠে জানাইয়া দিল—"যুবক! উহা অমৃতধারা নহে, সুগভীর তৃষা-মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনা মাত্র! যুবজন-চিত্তে বিচিত্র বেদনা জাগাইয়া সারা জীবনটা বিড়ম্বিত করিবার ক্লেদ-ধারা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন হইল যুথিকার মাতা আরোগ্য হইয়াছে। নিজ যাতায়াতে দানীশ আপনার সমস্ত প্রাণখানি যুথিকার চরণে অর্পণ করিয়া বসিয়াছেন। এখন সমস্ত হৃদয় জ্বালায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এ জ্বলন্ত জ্বালা দানীশ স্বেচ্ছায় সখ্ করিয়া ডাকিয়া লইয়াছেন। যুথিকার নিকটে যতক্ষণ না যাইতে পারেন, ততক্ষণ দানীশের শান্তি নাই। কিন্তু শান্তি-প্রয়াসী দানীশের সেখানে গেলে, জ্বালা আরও প্রবল হয়! এ জ্বালা যুড়াইবার কি কোন উপায় নাই?

উপায় ছিল। শান্তি যে শান্ত নিস্তব্ধ প্রেম-মন্দাকিনী লইয়া তাঁহাকে পবিত্র করিতে ধাবিত হইতেছিল, তিনি তাহা বুঝিলেন না। তাঁহার পাশ্চাত্য-শিক্ষাদৃপ্ত প্রাণে পবিত্র গঙ্গারজল স্থান পাইল না। তিনি শিক্ষার মোহে গঙ্গাজল তুচ্ছ করিয়া টেমস্-জীবন প্রার্থী প্রাচ্য-প্রেম পদদলিত করিয়া প্রতীচ্য-প্রেমের জন্য প্রধাবিত, তাই না এত জ্বালা!

একদিন সকালে উঠিয়া চা পানান্তে একখানি খবরের কাগজ লইয়া দানীশচন্দ্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ভৃত্য তিনখানা পত্র আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

একখানা সরকারী পত্র। সেখানা পাঠ করিয়া অপরখানা খুলিলেন। সেখানা যুথিকা লিখিয়াছে। যুথিকা লিখিয়াছে,—পত্রপাঠ মাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজন জানিবেন, বিকালে আসিলে আমার সহিত দেখা নাও হইতে পারে। আমি মজঃফরপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইব। আর একখানা সেই সুদূর পল্লী হইতে তাঁহার স্ত্রী শান্তি লিখিয়াছে। সেখানা পাঠ করিলেন। সে বড় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা। তিনটা শব্দ কাটিয়া

একটা লেখা। বর্ণাশুদ্ধি তাহার পদে পদে, পত্রখানির কর্ত্তিতাংশ বাদ দিয়া অবিকল মুদ্রিত হইল ;—

শ্রীচরণ কমলেস্বু।

তুমি আর চিঠি লেখনা কেন? আমি পর পর তিন চারিখানা পত্র লিখিলাম, একখানিরও উত্র পাইলাম না। আমাকে কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ! আমাকে ভুলিতে পার, কিন্তু তোমার মাতাঠাকুরাণীকে ভুলিবে কেন? তোমার দাদারা,—তোমার ছোট ভাই তাঁহাদেরই বা ভুলিবে কেন? শচীকে না দেখিয়া আছ কেমন করিয়া? তোমার অনেক টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে গুষ্টি সুধ্যু না খাইয়া মারা যাইতেছি। তুমি সব টাকা খরচ করিতেছ কেন? যারা চাকৃরী করে, তারা কি বাড়ি আশে না? মতির দাদা, হরির কাকা, শশির বর এরা সবাই চাকৃরি করে—সবাইত বাড়ী আসে? দিন যায়—আমি ভাবি কা'ল পত্র পাব। পিওন আসে, ভাবি পত্র আনিয়াছে, কাণ পাতিয়া থাকি, আর আর পত্র দিয়া চলিয়া যায়,—তার উপর যে তখন কত রাগ হয় তা বলিব কি প্রকারে? আমার মাথা খাও—মরামুখ দেখ, পত্রখানির উত্র দিও।

এবার আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় মোটে ধান হয়নি। মেজ-ঠাকুরের কাজেও সুবিধা নেই,—সংসারে বড় কষ্ট হচ্চে।

শচী ভাল আছে। ছোট ঠাকুরপোর একটা বিয়ে না দিলে ভাল দেখাচ্চে না—কিন্তু টাকা কোথায়? যাদের দুটো পেটের ভাতের কষ্ট, তারা বিয়ে দেয় কেমন ক'রে? সেজো বৌ বড় ঝগড়া করে,—মা ভাল আছেন। কবে বাড়ী আসিবে?

সেবিকা—

শ্রীশান্তি।

পত্রখানি পাঠ করিয়া দানীশের প্রাণে কেমন যেন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার ন্যায় একটা অন্ধকার ছাইয়া পড়িল। বুঝি সেই সহাস শান্তমূর্ত্তি—সেই সরল সদা হাস্যময় মুখ, তাহার মনে পড়িল! আর মনে পড়িল, সেই সুদূর পল্লী গ্রাম,—নিস্তব্ধ নিবাস। মাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-বধূদিগের ভালবাসা;—আর সর্ব্বোপরি শচীর কচি-মুখ। মনে হইল,—তাহারা সকলে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর আমি তাহাদিগকে একটি পয়সাও না পাঠাইয়া বিলাস-ব্যসনে সব নষ্ট করিতেছি! তহবিলে প্রায় দুইশত টাকা মজুদ ছিল,—মনে করিলেন, সেই দিনই সে টাকাটা সব বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন।

তারপরে যুথিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তখনই গমনোদ্যত হইলেন। ভৃত্য দ্বিচক্রযান বাহির করিয়া দিল,—তিনি যথাবিধি কোটপেণ্টলান পরিধান করতঃ যাত্রা করিলেন।

যুথিকা তখন বড় সুসাজে সজ্জিত হইয়া আপন কক্ষে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিল। দানীশ কক্ষে প্রবেশ করিলে বীণা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনার আগমনে একজন পুরাতন বঙ্গীয় কবির কবিতার্দ্ধ মনে পড়িয়া গেল। কবিতাটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম!—"শত শত বিহঙ্গম ডাকে ঋতুবরে, কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।"

দানীশ আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ডাকিলে কি আমি না আসিয়া থাকিতে পারি!"

যুথিকা। কেন ডাক্তার বাবু, আমি তোমার কে? আমি হীনা দীনা রমণী ভিন্ন ত নহি। আমার আহ্বানে তুমি কেন এস? আমার এমন কি গুণ আছে, যাহাতে আপনার ন্যায় যশোগৌরব-বিমণ্ডিত ব্যক্তি আহ্বান মাত্রে উপস্থিত হয়েন?

দানীশ। কি জন্য আসি যুথিকা,—তাহা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু যে জন্য এক গ্রহ অন্য গ্রহেরদিকে ধাবিত হয়, যে জন্য অণুরদিকে অন্য অণু আকৃষ্ট হয়, বুঝি সেই জন্যই আমি এখানে ছুটিয়া আসি।

যুথি। বুঝিলাম,—আপনি বলেন, আমরা উভয়ে সমান গুণ-বিশিষ্ট, এবং সমানধর্ম্মী। কিন্তু তাহা নহে ডাক্তার বাবু। আকাশের চাঁদে আর মর্ত্ত্যের খদ্যোতিকায় যে প্রভেদ,—আপনাতে আমাতে বোধ হয় সেইরূপ প্রভেদ। জানি না, কোন্‌গুণে আপনি আমায় দয়া করেন—ভালবাসেন। কিন্তু ডাক্তার বাবু আমায় ভয় হয়, পাছে কোনও এক অশুভ মুহূর্ত্তে আপনি আমায় ভুলিয়া যান্! আপনার পায়ে ধরি, বিস্মৃত হইবেন না,—নারীবধ করিবেন না!

যুথিকা নয়নে রুমাল অর্পণ করিল। দানীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! যুথিকা তুমি রোদন করিতেছ? আমি কি তোমায় ভুলিতে পারিব?"

যুথিকা চক্ষুর রুমাল টেবিলে রাখিয়া বলিল—"এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম তাহাই করুন। কিন্তু আমি সে জন্য কাঁদি নাই। সে জন্য এ অধিনীর নয়ন-জল নির্গত হয় নাই।

দানীশ। তবে কিসের জন্য যুথিকা? আমি কি সে কথা শুনিতে পাইব না?

যুথিকা। কেন পাইবে না? তোমার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই। আমি আ'জ রাত্রে কলিকাতায় যাইব। সেখানে প্রায় দশদিন অতিবাহিত হইবে,—এ দশদিন তোমাকে দেখিতে পাইব না।

দানীশ। আমিই বা এই দশদিন তোমাকে না দেখিয়া কি প্রকারে থাকিব?

যুথিকা। কিন্তু কি করিব ডাক্তার বাবু। যে ঘটনার গতিরোধ করিবার সাধ্য নাই, তাহার চক্রতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেই হইবে।

দানীশ। আ'জই যাইবে?

যুথিকা। হাঁ. আজই—কিন্তু আমি অনুরোধ করি, তুমি আমার গমনের অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্ব্বে একবার আসিয়া দেখা দিবে।

দানীশ। নিশ্চয় আসিব।

যুথিকা। আর একটি সামান্য কথা,—হঠাৎ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; তাই একথা তোমাকে বলিতে হইল। যদি তোমার কাছে টাকা থাকে, তবে আমাকে পাঁচশত টাকা ঋণদান করিতে হইবে, আমি আসিয়াই পরিশোধ করিব।

দানীশ। পাঁচশত—আ'জই চাই?

যুথিকা। হাঁ.—দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই; কেন না—দিবাভাগেই আমি সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ফেলিব। রাত্রি দশটার গাড়ীতে যাইব,—সন্ধ্যার পরে অবশ্য তুমি অধিনীর গৃহে পদার্পণ করিবে, তখন কিছু ঐ সকল বাজে কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারিব না।

দানীশের তহবিলে দুইশত মুদ্রার অধিক ছিল না,—কিন্তু যুথিকার প্রার্থনা ব্যর্থ করিতে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, তিনি স্বীকার করিলেন, বেলা পাঁচটার মধ্যে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

যুথিকা তাহার জন্য শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। দানীশ তখন আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ডাক্তারখানায় যাইবার সময় হইয়াছে,—বিশেষতঃ তিনশত টাকা তখন সংগ্রহ করিতে হইবে। বিদেশে ঋণগ্রহণের চেষ্টা তাঁহার এই প্রথম। দানীশ চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া দানীশ বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার পান্নালালকে

ডাকিয়া নিভৃতে লইয়া বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়, হঠাৎ আমার পাঁচ-শত টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই টাকা চাই। আমার নিকটে মোটে দুইশত টাকা আছে। অবশিষ্ট তিনশত টাকা কোথায় ধার পাওয়া যায়, বলিতে পারেন?"

বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আপনার সহিত বড়বাজারের মহাজন ভিকাজির আলাপ পরিচয় আছে না?"

দানীশ। হাঁ, আছে। আমি তাঁহার বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য তিন চারি বার গিয়াছি।

বৃদ্ধ। সুদ লইয়া তিনি সাধারণকে টাকা ধার দিয়া থাকেন। বোধ হয় আপনাকেও দিতে পারেন।

দানীশ। আপনি এখনই একবার সেখানে যান।

বৃদ্ধ আদেশ প্রতিপালন করিল। দানীশচন্দ্র তখন রোগী দেখিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ আসিয়া নিষ্ফলবারতা প্রদান না করে!

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিল। দানীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"আপনি কি ঠিক করিয়া আসিতে পারিয়াছেন?"

বৃদ্ধ। তিনি দিতে স্বীকৃত আছেন, তবে দুইটি অসুবিধা আছে।

দানীশ। কি কি?

বৃদ্ধ। প্রথম সুদ কিছু বেশী।

দানীশ। কত?

বৃদ্ধ। ভিকুজি বলিলেন, শতকরা মাসিক তিন টাকা সুদেই আমি টাকা কর্জ্জ দিই। তবে ডাক্তার বাবু যখন লইবেন, তখন দুই টাকা সুদে দিতে পারি।

দানীশ। আর একটা?

বৃদ্ধ। আপনি তাঁহার কার্য্যালয়ে গিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া টাকা আনিবেন।

দানীশ। আমার যখন টাকা না হইলেই চলিবে না, তখন ঐ রূপেই লইতে হইবে। কখন যাইতে বলিলেন?

বৃদ্ধ। আপনার যখন সুবিধা। এবেলা বারটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয় খোলা থাকে। বৈকালে তিনটার পর আবার খোলা হয়—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

দানীশ। দশটার মধ্যেই আমাদের কাজ সারা হইবে,—আপনি ও আমি তখনই যাইব।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া বৃদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেল। দানীশও নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বেলা দশটা বাজিল. একখানা অশ্বযান আনাইয়া তাহাতে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারকে তুলিয়া লইয়া দানীশচন্দ্র বড়বাজার ভিখুজির কার্য্যালয়ে গমন করিলেন।

ভিখুজি ডাক্তার বাবুর যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। তারপরে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া তিনশত টাকা প্রদান করিল। টাকা লইয়া দানীশচন্দ্র বাসায় ফিরিলেন।

আহারাদি অন্তে দানীশচন্দ্র পাঁচশত মুদ্রার নোট পকেটে করিলেন। একবার তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এতটা টাকা কাহাকে কিসের জন্য দিতে যাইতেছেন! দেশে যে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূগণ, ভ্রাতাগণ, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে,—হয়ত কচি ছেলে শচী দু'ধটুকু পাইতেছে না,—কোথায় তাহাদিগকে টাকা পাঠাইবেন, তাহা না হইয়া এ কি করিতে যাইতেছেন! এ কোন্ অপরিচিতা কল্পিত-সম্বন্ধিনীকে এত টাকা দিতে যাইতেছেন?—যুথিকাকে টাকা দেওয়া

কিসের জন্য? সে কে? তাহার সহিত সম্বন্ধ কি?—সেই নীরব মধ্যাহ্নে, জনশূন্য গৃহে দানীশের মনে ঐ তত্ত্বের উদয় হইল! এমন হয়,—ইহা দেবতার অনুকূল আশীর্ব্বাদ! কিন্তু এ আশীর্ব্বাদ বিজয় লাভে সক্ষম হয়, অতি অল্প স্থলে। দেবাশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে দানবের নিষ্ঠুর ছলনা জাগিয়া বসে। তাহাতে সকল ভাসিয়া যায়! দানবের ছলনারই জয় হয়!

দানীশেরও তাহাই হইল। খরবাহিনী নদনদীর দ্রুতস্রোতে ক্ষুদ্র উপল যেমন ভাসিয়া যায়, যুথিকার প্রণয়াশারূপ প্রবলপ্রবাহে সুদূর পল্লীর শান্তি এবং স্নেহ-করুণামাখা মানুষগুলির মূর্ত্তি তেমনই কোথায় ভাসিয়া গেল। দানীশ পকেটে পূরিয়া টাকা লইয়া দ্বিচক্র যানারোহণে যুথিকাভবনোদ্দেশে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"তুমি আসিয়াছ,—আমি নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেবল তোমারই কথা ভাবিতেছিলাম।"—মর্ম্মভেদী বিলোল কটাক্ষে দানীশের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, সুন্দরী যুথিকা এই কথা বলিল।

দানীশ সে কটাক্ষ-বিষ-বাণাঘাত সহ্য করিয়া লইয়া বলিলেন,— "তুমি যখন আসিতে বলিয়াছ,—তখন না আসিয়া থাকিতে পারি কি?"

যুথিকা। ডাক্তারবাবু তুমি কি আমায় ভালবাস?

দানীশ। ভালবাসা কি করিয়া জানাইতে হয়, আমি তাহা জানি না যদি জানিতাম, তবে বলিতে পারিতাম—যুথিকা, আমি তোমায় কত ভালবাসি!

যুথিকা। হায়, আমি অভাগিনী তোমার ভালবাসার প্রতিদান কিছুই দেই নাই। ডাক্তারবাবু, আমায় কি তুমি অবিশ্বাসিনী মনে কর?

দানীশ। কেন যুথিকা—সে কথা কেন?

যুথিকা। প্রেমের যেখানে প্রতিদান নাই,—সেই খানেই অবিশ্বাস; একথা মহাপ্রেমিক স্বয়ং সেক্সপিয়ার বলিয়া গিয়াছেন।

দানীশ। না, না যুথিকা,—আমি আমার নীরব প্রেমের প্রতিদান তোমার নয়নকোণেই পাইয়া থাকি।

যুথিকা। বুঝিলাম ডাক্তারবাবু তুমি যথার্থ প্রেমিক। তোমার মত প্রেমিক রতন বুঝি, মরজগতে দুর্ল্লভ!

দানীশ। যুথিকা—টাকা নাও।

যুথিকা। টাকা? কেন ডাক্তারবাবু এ সময়ে ছার টাকার

কথা,—পার্থিব অর্থের কথা তুলিয়া আমার স্বর্গীয় প্রেমের ধেয়ান ভাঙ্গিয়া দিলে? আমি যে, তোমার আইবুম্বী প্রেমের স্বপ্ন-সোহাগে ভুলিয়াছিলাম। কেন, জাগাইলে ডাক্তারবাবু? কি, ছার টাকা যদি আনিয়া থাক,—দয়া করিয়া এই টেবিলের উপর রাখ।

দানীশ দশটাকা করিয়া পাঁচশত টাকার নোটের কয়টি তাড়া যুথিকার সম্মুখে টেবিলের উপরে রক্ষা করিলেন।

আপাদ লোলুপ দৃষ্টিতে নোটগুলির উপরে বারেক চাহিয়া দেখিয়া যুথিকা বলিল,—"পাঁচ শত?"

দানীশ। পাঁচশতের কথাই বলিয়া দিয়াছিলে, তাহাই আনিয়াছি।

যুথিকা। যাক্, বাজে কথা পরিত্যাগ কর, এস এই বিরহ বাসরে একটী গান গাহি।

হারমোনিয়মে মধুর স্বরলহরী উত্থিত হইল। মধুর সহিত মধু মিলিল,—হারমোনিয়মের সঙ্গে যুথিকার কণ্ঠস্বর মিলিল। যুথিকা গাহিল;—

হৃদয় দলিয়া যদি যেতে চাও প্রাণসখা,
যাবে যাও এ জনমে আরত হবে না দেখা।
বারিহীন হ'লে মীন, বাঁচে বল কত দিন,
সহকার চ্যুত হ'লে বিশুষ্ক হয় লতিকা।
রবি যবে অস্ত যায়, কমল কি বাঁচে তায়,
চন্দ্র অস্তগত হ'লে রহে কি কভু চন্দ্রিকা

সঙ্গীত, কবিতা আর প্রেমের স্বপ্নে নাগাইদ রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া দানীশচন্দ্র বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহার হৃদয় তখন ফাঁকা,—উৎসব রজনীর প্রভাতে মানুষের প্রাণ যেমন উদাস—নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, শরীরটা পর্য্যন্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা

বোধ হয়, দানীশেরও চিত্ত এবং দেহ তেমনই উদাস ভাঙ্গা ভঙ্গা বোধ হইতেছিল।

বাসায় আসিয়া একখানা খবরের কাগজ পাঠ করিতে গেলেন, ভাল লাগিল না। একখানা উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন, মনঃসংযোগ হইল না। তখন শান্তির চিঠিখানার উত্তর লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

তোমার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু কাজে তিলমাত্র অবসর নাই,—পত্র লিখিবার সময় কোথায়? আমাকে টাকা পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছ কিন্তু এত অল্প আয়ে একজন আমার মত ভদ্রলোকের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াই সুকঠিন,—ইহা হইতে তোমাদিগকে পাঠাইব কি? বাড়ী যাইবার জন্য লিখিয়াছ, এবং যাহারা চাকরী করে, অথচ বাড়ী যায়, তাহাদের তুলনা দেখাইয়াছ। তুমি জাননা যে, আমার চাকরীর দায়ীত্ব কত অধিক। কত লোকের জীবন-মরণের ভার হস্তে লইয়া আছি। সময় পাইলে যাইবার চেষ্টা করিব।”

পত্রখানি সেই দিনই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে সে পত্র শান্তির হস্তগত হইল। শান্তি পত্র পাঠ করিয়া সুখী হইতে পারিল না। সে তখনই কাগজ ভাঁজিয়া পত্র লিখিতে বসিয়া গেল। মনে কত কথা আসে, লিখিবার সময় তাহা বাহির হয় না। যাহা লিখিতে, যায় তাহাতেই ভুল হইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে—বিপুল চেষ্টায় প্রাণান্তিক পরিশ্রমে সে একখানা বৃহদাকারের কাগজ পূর্ণ করিয়া পত্র লিখিল। সে লিখিল—

শ্রীচরণ কমলেসু!

"তোমার পত্র পাইলাম, ইহাই আমার মস্ত লাভ! পত্র না পাইলে যে, কতখানা মনে ওঠে, তাহা লিখিয়া কি জানাইব। মনে করিয়া মাসে মাসে এক এক খানা পত্র দিও। লিখিয়াছ,—আমাদিগকে তুমি কিছুই দিতে পারিবে না, দেড়শো টাকায় তোমার মত ভদ্রলোকের বাসা খরচই চলে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে ভদ্রলোকের নিজের মাসে দেড়শো টাকা লাগে, তার বাড়ী শুদ্ধুর কত টাকা লাগে? ভদ্রলোকের বাড়ীর লোক কিছুই খাবে না, আর সে মাসে মাসে দেড়শো টাকা খাবে, এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখে. আমাদের জন্যে যদি মাসে পঁচিশটে টাকা দাও, আমরা খুব সুখী হ'তে পারি। চাকুরীতে যদি ছুটী না পাওয়া যায়, আর বাড়ীতে কিছু টাকাও না দেওয়া যায়,—তবে সে চাকরী আবার করে কে? চাক্রুর পিসে হাতুড়ে ডাক্তার,—সে বাড়ী থাকিয়া যেমন তেমন করিয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। আর তুমি কলেজের ডাক্তার, তোমার কি ত্রিশটে টাকাও হবে না? যার বাড়ীর লোক ভাত অভাবে শুকিয়ে

মরে, তার চাকরী করা কিসের জন্য। রাগ করিও না,—আমরা বড় কষ্ট পাইতেছি বলিয়া, এত কথা লিখিলাম। বাড়ী আসিও,—তোমার মা তোমার নাম করিতে কাঁদিয়া আটখানা হন। ইতি—

সেবিকা—

শ্রীশান্তি।

পত্র লিখিয়া খামে আঁটিয়া শান্তি উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় তথায় মেজবউ প্রবেশ করিল। মুচকী হাসিয়া বলিল,—"কি লা, এই পত্র পেলি, আবার এখনই তাহার উত্তর লিখ্‌লি যে? ন ঠাকুরপো বুঝি কোন গহনা গড়াইতে দিবে বলিয়া মাপ চাহিয়াছে,—তাই তাড়াতাড়ি পাঠালি?"

শান্তি হাসিল। কিন্তু পূর্ব্বের সে হাসি আর নাই। দিগন্ত পরিপূর্ণ পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহার যে স্বভাবসিদ্ধ হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মত তাহা এক্ষণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

হাসিয়া শান্তি বলিল,—"হাঁ, একটা নূতন গহনা গড়াইতে দিয়াছেন, তাহারই মাপ পাঠাইলাম।"

সে। কি গহনা লা?

শান্তি। হেম-কাচিতা।

সে। সে বুঝি নূতন গহনা?

শান্তি। দেখনি—মাঠে তাই দিয়া ধান আর কলাই সরিষার গাছ কাটে!

কটাহের অতি তপ্ত তৈলে জলের ছিটা দিবা মাত্র তাহা যেমন জ্বলিয়া উঠে, সেজ বউ তেমনই জ্বলিয়া উঠিল। রক্তচক্ষু করিয়া

বলিল,—"তবে লা আবাগী—এত দেমাক তোমার! আমাকে এত হেনস্তা! ওলো, ছাই প'ড়ে যাবে তোর তেজে লো, ছাই প'ড়ে যাবে।"

শান্তি বড় অপ্রতিভ হইল। সে বুঝিতে পারিল না, সহসা তাহার মুখ দিয়া কি কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে! কান্তের নাম করায় যে, এত দোষ হঁয়, তাহা জানিলে কখনই বলিত না। কিন্তু সে তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না যে, তাহার কথিত বাক্যে সেজ বউ এমন করিয়া রাগ করিল কেন? উদাস-করুণ নয়নে মেজ বউর মুখের দিকে চাহিয়া অতীব নম্রস্বরে বলিল,—"সেজ দিদি, আমি কি বলিলাম যে, তুমি আমার উপরে রাগ করিলে?"

সেজ বউ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিলেন,—"ওলো, না হয় তোর বর বিদ্বান্, না হয় সে রোজগেরে,—আমার বর না হয় মূর্খ, বোকা, মাঠ খাটা,—কিন্তু আমরা কি কারু খাই, না ছুঁই। তুই কান্তে ধান-কাটা, সরিষে, কলাই মলা বলিয়া আমার বরকে আর আমাকে ঠাট্টা করবি কেন লা?"

ন' বউ ছুটিয়া গিয়া সেজ বউয়ের পায়ে জড়াইয়া ধরিল. কাতরে বলিল,—"সেজ দিদি. আমি তা বলিনি। সেজ ঠাকুর আমার গুরু-লোক, আমি কি তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে পারি! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।"

"অত তেজ ভাল নয় লো—তেজে আগুণ লাগ্‌বে!" যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে সেজ বউ ন' বউয়ের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তাঁহার উচ্চকণ্ঠের চীৎকারধ্বনি আর পদতাড়ান-শব্দে বাড়ীর অনেকেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশও কোথা হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বউ সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেজ বউ, তোর কি হইল?"

সেজ। আমার আবার কি হবে! আমি হাটের হাড়িনা, মাঠের কাটকুড়ানী,—আমার আবার কি হবে! যে পায়, সেই আমাকে দু' পায়ে থেঁৎলায়—পোড়ারমুখো যম আমাকে দেখিতে পায় না—এত লোক মরে, আমার মরণ নেই!

বড়। হ'য়েছে কি বল্ না ভাই,—তুই একে মুহূর্ত্তে একেবারে "কুরুক্ষেত্র" বাধিয়ে তুলিস্!

সেজ। আমার কপালের দোষ,—আমি ঝগড়াটে. আমার বর চাষা, মাঠ খাটা, ধানকাটা, সরষে কলাই মাড়া,—কাজেই আমার সব তাতেই দোষ!

বড়। সে কথা কে বলিল?

সেজ। সবাই বলে।

বড়। এখন কে বলিল?

সেজ। যে বলিতে পারে। যার বর মাসে দেড়শো টাকা রোজ-গার করে। যার অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না।

বড়। ন বউ?

সেজ। নয় ত কি?

বড়। কি ব'লেছে।

সেজ। ও গো, কিছু বলেনি গো,—কিছু বলেনি। সব দোষ আমার।

বড়। তবে অমন ক'রে মরছিস্ কেন?

ক্ষিতীশ। কি হ'য়েছে,—ব'লতে বুঝি মুখে আট্‌কে গেল!

সেজ। হবে আবার কি, ন' লক্ষ্মীকে আমি কেবল জিজ্ঞাসা কোরেছি, ন' ঠাকুরপোকে এত তাড়াতাড়ি কি লিখ্‌লি? তারই উত্তরে ঠেকারী চোখখাগী কি না বলিল—সোণার কান্তে আন্‌তে

লিখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হবে? মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল—মাঠে ধান কাটিতে হবে, সরিষা-কলাই কাটিতে হবে। আমি কি বুঝিনা—কথাগুলা কাহাকে বলা হইল,—আমারই বর মাঠে যায়, ধান কাটায়—ও গো, আমার ইচ্ছা করে গলায় দড়ি দিয়ে মরি!

ক্ষিতীশচন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া বসিলেন। ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"এতদূর স্পর্দ্ধা! ছোট মুখে বড় কথা! আমি মাঠ খাটি, তাই আমার জন্যে সোণার কান্তে পাঠাইতে লিখিলেন! কথাগুলা শুনিলে মড়ারও রাগ হয়। এই মাঠ খাটার জন্যেই পেটে দিনান্তে এক মুঠা 'ঘাসের বীজ' পড়িতেছে। এখনও ত রোজগারের একপয়সাও বাড়ী আসেনি।

সেজ বউ এবার রোদন আরম্ভ করিলেন। উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দনস্বরে বলিলেন,—"এ কি মাঠের ধান যে, সকলে দেখিবে। কাহার নামে কবে কোথা দিয়া টাকা আসিয়া বাক্সে ওঠে, কে তা'র সংবাদ রাখে' ও গো, আমার মরণ হ'লেই সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়! যম. তুমি আমায় ডেকে নাও! আর সহ্য করিতে পারি না!"

ক্ষিতীশচন্দ্র বড় বউকে বলিলেন,—"শোন বড় বউ, তুমি ন'-ঠাকরুণকে বুঝিয়ে ব'ল, যদি মাঠ খাটার উপরে তাঁহার এত অশ্রদ্ধা হইয়া থাকে, যেন তাঁহার চাকুরীর ভাত আমাকে না দেন,—কিন্তু সাবধান! এরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া বলিলে, ভাল হইবে না। আমি কারুর বাবার গোলাম নই।"

বড়। সেজ ঠাকুরপো, তুমিও কি খেপ্‌লে নাকি? ন' বউ কি তেমনি মানুষ? তোমাকে সে ঐরূপ বলিবে,—ইহাই তুমি বিশ্বাস করিতেছ?

ক্ষিতীশ। তবে কি যত দোষ ঐ একটা মানুষের! তোমাদের এই একচোখোমির দোষেই সংসারটা যাইতে বসিয়াছে!

বড়। আমরা একচোখো নই। সেজ বউ বড় কুন্দুলে—তিলকে তাল করিয়া তোলে।

ক্ষিতীশ। তবে সকলে মিলিয়া উহাকে কাটিয়া ফেল।

সেজ বউ সপ্তমে উঠিলেন। চীৎকার ও ক্রন্দনের সহিত অদৃষ্টনিন্দা, ভগবানের এ করুণা বাড়ীর সকলেরই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বিষয়ক শব্দবিন্যাসে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"এখন এস ঘরে এস। আমার আর সহ্য হয় না। আসুন এবার মেজদাদা বাড়ীতে,—যে হয় একটা শেষ করিয়া যান। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।"

উচ্চস্বর নিম্নে নামাইয়া ক্রন্দন গর্জ্জন করিতে করিতে সেজ বউ নিজ কক্ষে গমন করিলেন, ক্ষিতীশচন্দ্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।

গৃহমধ্যে গিয়া সেজ বউ গর্ব্বিত কণ্ঠে, অভিমানের সুরে কহিলেন,—"আ'জ নিজের কাণে শুন্‌লে। তুমি সকল তাতেই আমার দোষ দাও।"

ক্ষিতীশ। নাও, সবাই ভাল। আমি বিষম সঙ্কটেই পড়িয়াছি! একে এই সংসারের দারুণ অনাটন,—তার উপরে তোমাদের শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ! কি যে করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

সেজ। কেন, অত কথা কে সহিবে? আমাকে বলিবে, তোমাকে বলিবে,—কেন, উহার বাপের কি কিছু ধারি; না ওর বরের রোজগার খাই?

এদিকে উঠানে তখন এই কলহের সমালোচনা আরম্ভ হইয়া

গিয়াছিল। বড় বউ শ্বাশুড়ীকে বলিল—"হ্যাঁ মা, তুমি সেজ ঠাকুর-পোকে একটি কথাও বলিলে না?"

শ্বাশুড়ী। কি বলিব মা,—বলিবার আর আমার কিছুই নাই। ভগবান্ এখন আমাকে পাদপদ্মে স্থান দিলেই রক্ষা পাই, দেখে শুনে আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে!

বড়। আগাগোড়া না জেনে, না শুনে কি ঐ বউর কথা শুনে ভাদ্রবৌকে অমন কটু-কাটব্য কি বলিতে আছে! হ্যাঁ গা, সে কি সেই রকমের বউ যে, বিনা কারণে বাঘ ঘাঁটাইবে!

মেজ বউ মুখ টিপিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"বিনা বাতাসে গাং নড়ে না, একটু কিছু হয়েছেই।

বড় বউ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"যখন তোর সঙ্গে বাধে, তখন বুঝি. গাং গড়ানর জন্যে বাতাস ডাকিয়া আনিস? বাতাস চাই না—ওর গাং আপনিই নড়িয়া থাকে।"

তখন সকলে আপন আপন বিবেচনা মতে কলহ বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া আপন আপন কার্য্যে গমন করিলেন।

যাহাকে লইয়া এই ব্যাপারের উদ্ভব, সে কিন্তু গৃহকোণে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সেজ বউ তাহাকে গালি দিয়াছে, ঝগড়া করিয়াছে, তাহার জন্য সে কাঁদে নাই। তাহার ভাসুর যে তাহাকে দোষী ভাবিয়াছেন, তাহার উপরে রাগ করিয়াছেন—এ দুঃখ রাখিবার স্থান আর নাই! তাই সে হাপুস নয়নে কাঁদিয়া চক্ষুর জলে মাটী ভিজাইতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা; কাল এ সকলের কাহারও মুখ চাহে না। সে আপন মনে, অবিরামগতিতে মহাকালে মিশিতে ধাবিত হইতেছে। প্রাগুক্ত ঘটনার পরে, এক বৎসর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

তখন শীতকাল। যতীশচন্দ্র লাটের কিস্তীর খাজনা আদায় ও সদরে দাখিল করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। সঙ্গে অনেকগুলি টাকা আনিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরে স্বামী-স্ত্রীতে গৃহমধ্যে কথা হইতে ছিল। বালক শচীশচন্দ্র উভয়ের মাঝখানে ছুটাছুটি করিয়া নয়নানন্দবর্দ্ধন করিতেছিল।

মেজ বউ বলিলেন,—"তোমার শরীর ভাল ছিলত ?"

যতীশ। হ্যাঁ, এবার শরীরটা বেশ আছে।

মেজ। টাকা আদায় হ'ল কেমন ?

যতীশ। মন্দ হয় নাই, তবে এ বছর ধান ভাল হয় নাই বলিয়া একটু যা গোলযোগ হইয়াছে।

মেজ। কত টাকা আনিয়াছ ?

যতীশ। বছর বছর এ সময় যাহা আসে তাহাই আসিয়াছে,—তবে আশা ছিল, কিছু অধিক হইবে।

মেজ। কত টাকা আনিয়াছ—বলই না কেন ?

যতীশ। ছয় শত।

মেজ। খোকার জন্য কত টাকা রাখিবে ?

যতীশ। তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর,—তোমার বুদ্ধি মন্দ নয়।

তোমার পরামর্শ মত কাজ করিয়া এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় দেড় হাজার টাকা জমিয়া গিয়াছে।

মেজ। পঞ্চাশটাকা খরচের জন্যে নাও,—বাকী টাকা শচীর থাক্।

যতীশ। পঞ্চাশটাকায় কি হইবে? ধান হয়নি—কিনিতে হইবে। দেনপত্রও অনেক হইয়াছে। আমার টাকা পাইতে আবার সেই চৈত্র মাস।

মেজ। তা আমি কি করিব। ছেলেটার ভাবনাত ভাবিতে হইবে।

যতীশ। দুই শত টাকা সংসার খরচের জন্যে দিয়া বাকী তুমি শচীর জন্য রাখ।

মেজ। দু শো—ও টাকা! তাহা কিছুতেই হইবে না। শচীর ভাবনা কেউ ভাবিবে না তোমাদের সংসারের এই দশা—ভগবান না করুণ, যদি ভালমন্দ কিছু ঘটে, তাহ'লে শচী ও আমি কোথায় দাড়াইব বল দেখি?

যতীশ। তা' বুঝি, কিন্তু এদিকে সংসারও ত আবার চলা চাই।

মেজ। চলুক্—বা নাই চলুক্! গুষ্টিশুদ্ধর ভাবনা ভাবিতে গেলে আর চলে না! কৈ, তোমার ন' ভাই কত দিতেছে? তার ত মাহিনা মাসে দেড়শো টাকা!

যতীশ। আমার বোধ হয়, তাহার চরিত্র ভাল নাই। তিন চারি খানা চিঠি লিখিয়াছি—দুই একখানার উত্তর দিয়াছে। কথাগুলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা,—পড়িলেই মনে হয়, তাহার মাথা ভাল নাই! কত আশা করিয়াছিলাম; তাহার অনেক টাকা বেতন হইল,—সংসারের কত উন্নতি হইবে, কিন্তু হায়! সবই বৃথা হইল!

মেজ। সকলে ত আর তোমার মত বোকা নয়! সে দেবে কেন? টাকা জমা করিতেছে—বউয়ের গহনা গড়াইতেছে।

যতীশ। (হাসিয়া) দেখনা—ন'বউমার গায়ে অষ্ট-অলঙ্কার ধরিতেছে না!

মেজ। এখন গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ওরা আমাদের মত নয়,—ভারি চাপা। গহনা গড়াইয়া সেইখানে রাখিতেছে। ন' বউকে সেখানে লইয়া গিয়া দিবে!

যতীশ। আমার মনে হয়, সেটা একান্তই ভুল। ফলে আমার বিশ্বাস দানীশ কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া অনর্থক অর্থগুলা নষ্ট করিতেছে! যাহা পাইতেছে, তাহাই অপব্যয় করিয়া ফেলিতেছে!

এই সময় গৃহমধ্যে নিস্তার আসিয়া বলিল,—"মেজকর্ত্তা, তিনজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

যতীশ। কোথায়?

নিস্তার। চণ্ডীমণ্ডপে। ভিকু বসিবার আসন দিয়া, তামাক সেজে নিয়ে গেল,—তাঁহারা রাত্রে এখানে থাকবেন।

যতীশ। বাড়ী কোথায় শুনিয়াছিস্?

নিস্তার। ভিকু জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁহারা বলিলেন, দেবগ্রামে।

যতীশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

চণ্ডীমণ্ডপে কেরোসিনের ডিবায় আলোক জ্বলিতেছিল, এবং বারেণ্ডায় একটী মাদুরের উপরে তিনজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে একজন ভিকুদত্ত হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। যতীশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলে, একজন বলিলেন—"এই যে, যতীশ বাবু, ভাল আছেন ত?

যতীশচন্দ্র হাসিমুখে বলিলেন,—"তাইত, দে মহাশয় যে; আজি আমার বড় সৌভাগ্য—আপনার চরণধূলিতে বাড়ী পবিত্র হইল!"

পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোক দুইটীর দিকে মস্তক সঞ্চালন করিয়া

দে মহাশয় বলিলেন,—"ইহাঁদিগকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন না। বাড়ী দেবগ্রাম—হরিশ্চন্দ্র বসু,—আর উহাঁর নাম রামজয় মিত্র। ভারি কুলীন—সমাজপতি লোক। বোস মহাশয়ের একটী অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী আছে। মেয়েটী সাক্ষাৎ পরী। তবে মেয়ের বাপ নাই—বোস মহাশয়ের আর্থিক সচ্ছলতাও তেমন নাই;—আপনার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেই মেয়েটীর সম্বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন।"

যতীশ। তা' বেশ,—পাঁচকড়িরও বিবাহ দিব বলিয়া স্থির করিতেছি।

দে। আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন—দেওয়া নেওয়া তেমন কিছুই করিতে পারিবেন না।

যতীশ। এখনকার কাল দিন অনুসারে—

দে। সে কথা তুলিতে পারিবেন না। সে যে দেশে এবং যে সমাজে আছে, সেই সমাজে থাক্—আমাদের এ নিঃস্ব সমাজে ছেলে বেচা এখনও আরম্ভ হয় নাই। তবে আগে দাম দিয়া মেয়ে কিনিতে হইত,—এখন সেইটাই গিয়াছে।

যতীশ। এখন পদধৌত করুন,—বিশ্রাম করুন,—তারপরে সব কথা হইবে।

দে। যখন আসিয়াছি, সেত হইবেই, এখন আসল কাজের কথাটাই প্রথমে স্থির হউক।

যতীশচন্দ্র আরও নানাপ্রকার কথোপকথনে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া যতীশচন্দ্র রন্ধনগৃহে গমন করিলেন। বড় বউ রন্ধন করিতেছিল,—ন' বউ বাটনা বাটিয়া কুটনা কুটিয়া দিতেছিল। গৃহিণী ঠাকুরাণী দাবায় বসিয়া তাহাদিগের সহিত কথা কহিতেছিলেন।

যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"রন্ধনের একটু বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তিনজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন।"

যতীশচন্দ্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উহাঁদের বাড়ী কোথায়? কেন আসিয়াছেন?"

যতীশ। দেবগ্রাম। পাঁচকড়ির বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছেন।

যতীশচন্দ্রের মাতা কথা কহিতে না কহিতে বড় বউ কটাহের তৈলে তাড়াতাড়ি মৎস্যগুলি ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি দাবায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটী কত বড় ঠাকুরপো? দেখিতে কেমন শুনিলে?"

যতীশ। সে কথা এখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে বড়, তাহাতে ভুল নাই। আ'জ কালকার দিনে যখন রাখা যায় না, তখনই লোকে মেয়ের বিবাহের জন্য ছুটাছুটি করে। আর তা'দের মেয়ে তা'দের চক্ষে নিশ্চয়ই সুন্দরী।"

বড়। যদি বে, এই মাসেই দিয়া ফেল। পাঁচকড়ি ষাটির সেয়ানাও হ'য়েছে,—বিবাহ না দিলে আর ভালও দেখায় না!

যতীশ। যদিও দেবগ্রামের বোসেরা এখন গরীব হইয়া গিয়াছে, তথাপি সামাজিক সম্মানে ওরা খুব বড় ঘর।

মাতা বলিলেন,—"আমার আর কোন কথা বলিবার মুখ নাই বাবা; কিন্তু সকলের ছোট ছেলে—ছেলেটা বিবাগী হইয়া যাইতে বসিয়াছে, যদি পার একটা বিবাহ দিয়া দাও। বড় আশা ছিল, দানীশ আমার রোজগার করিলে তুমি একটু সাহায্য পাইবে। কিন্তু সে আশা বৃথাই হইল।"

যতীশ। মা. দিন চালান দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে—বিবাহ দেই কি করিয়া? নিতান্তপক্ষে তিন চারি শত টাকার কম আর বিবাহ-ব্যাপার সমাধা হইবে না। কিন্তু অত টাকা এখন পাই কোথায়?

মাতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন। বড় বউ বলিলেন,—"হ্যাঁ, ঠাকুরপো. তিন চারি শত টাকা লাগিবে কেন?"

যতীশ। গহনা চাই—তা' ছাড়া অপর খরচ পত্রও ত আছে।

বড়। ওরা কিছু দেবে না?

যতীশ। দেয় ত সামান্যই।

বড়। যেমন করিয়া হউক বিবাহটা দিয়া দাও ঠাকুরপো। পাঁচ-কড়ি সকলের ছোট,—সে যদি বিবাহের জন্য বিবাগী হয়, তবে সকলেরই দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকিবে না!

যতীশ। আমি চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। তবে জানই ত জন্ম-মৃতু-বিবাহ এই তিনটি কাজে ভগবানেরই সম্পূর্ণ হাত! ফলে, এই কাজটা আমার পসন্দ মত।

বড়। তবে আর অমত করিও না। না হয়, দশটাকা কর্জ্জ হইবে।

যতীশ। শোধ দেবে কে?

বড়। তোমরাই দিবে, নতুবা আর কে দিবে বল?

যতীশচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে পাঁচকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় বউ তখন ব্যঞ্জনে ঘৃত ঢালিয়া দিতেছিলেন। পাঁচকড়ি বলিল,—"বউ, কিছু খাবার দিতে পার, ক্ষিদে পেয়েছে।"

বড় বউ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার যে বিয়ে।"

পাঁচ। তবে আর কি, ক্ষিদে-তৃষ্ণা ঘুচে গেছে। যাই, এখন ঘুমাই গে।

বড়। সত্যি—সম্বন্ধ করিতে লোক আসিয়াছে।

পাঁচ। মেজ দাদা কি বলিলেন?

বড়। বিবাহ দেবেন।

পাঁচ। বড় বউ, অনেক দিন তোমাকে বলিয়াছি—আজও আবার বলি শোন,—আমি বিবাহ করিব না। কখনই যেন তাহার উদ্যোগ করা না হয়।

বড়। এই শোন কথা! তুমি ছেলে মানুষ, তোমার ছেলে মানুষের মত না থাকাই ভাল। তোমার অত বুড়ামি করিবার দরকার কি?

পাঁচ। বুড়ামি নয় বড় বউ—সত্যই বলিতেছি, আমি কখনই বিবাহ করিব না।

বড়। যারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, তারা বুঝি বিবাহ করে না?

পাঁচ। ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নয়,—আমি বিবাহ করিয়া খাইতে দিব কি? আমি কি রোজগার করিতে জানি? দাদাদের মধ্যে থাকিয়া খাইয়া দাইয়া ভগবানের নাম করিয়া বেড়াইব, ইহাই আমার সুখ! একটা আপদ ঘাড়ে করিয়া সারা জীবনটা কষ্ট পাইতে যাইব কেন?

বড়। তোমার পাগলামী রাখ—খবরদার যেন আমার সাক্ষাতে কোন গোলযোগ করিও না।

পাঁচ। আপাততঃ ক্ষুধায় মরি, তাহার একটা ব্যবস্থা কর। বিবাহের কথায় ত আর পেট ভরে না।

বড় বউ এক বাটী মুড়ী আর খানিক গুড় আনিয়া পাঁচকড়ির সম্মুখে দিলেন। পাঁচকড়ি নীরবে বসিয়া সে গুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বামীকে গৃহে পাইয়া মেজ বউ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ভাই'র নাকি বিয়ে?

যতীশ। লোক ত আসিয়াছে।

মেজ। ওরা কি দেবে?

যতীশ। বেশী কিছুই দিতে চায় না,—মেয়ের বাপ নাই, মামারা বিবাহ দিতেছে—তাহাদেরও অবস্থা বড় ভাল নয়।

মেজ। খরচপত্র সব তাহা হইলে তোমাদেরই করিতে হইবে?

যতীগ। হাঁ।

মেজ। টাকা কোথা?

যতীশ। সেইত কথা,—তবে পাঁচকড়ির বিবাহ না দিয়াও আর রাখা যায় না। বিবাহ দিতেই হইবে,—ইহাঁদের ঘর খুব ভাল. ইহাঁদের সহিত কুটুম্বিতা করা সমাজে একটা সম্মানের কাজ।

মেজ। সকলের মূলই টাকা!

যতীশ। সেত বটেই—আচ্ছা তুমি এবার এক কাজ কর;—

মেজ। আমি কোন কাজ করিব না,—আমাকে কোন কথা বলিও না।

যতীশ। অন্য কোন কথা নহে;—

মেজ। তবে কি?

যতীশ। এবার যে টাকাগুলা আনিয়াছি, তাহার লোভ আর করিও না। উহাদ্বারা সংসার খরচ আর পাঁচকড়ির বিবাহটা সারি।

মেজ। তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? আমি তাহা কখনই করিতে

দিব না। উহা হইতে পঞ্চাশ টাকার অধিক এক পয়সাও পাইবে না। আমার শচী কি শেষে পথে দাঁড়াবে?

যতীশ। চৈত্র মাসে যাহা পাইব, সে সবই তুমি লইও।

মেজ। কখনও না,—তাহা কিছুতেই হইবে না। একটু শিব-রাত্রির সলিতা যখন জন্মিয়াছে, তখন তাহার জন্য কিছু সংস্থান করা চাই-ই।

যতীশ। তবে কি উহাদিগকে জবাব দিয়া দিব?

মেজ। সেটা তোমার ইচ্ছা।

যতীশচন্দ্র তখন কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নমনে চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিলেন। দে মহাশয় বলিলেন,—"কেমন যতীশবাবু; কাজ করা আপনাদের অভিপ্রেত?

যতীশ। কাজ করিতে অমত নাই, তবে বৈশাখ মাস ভিন্ন পারি না।

দে। তাহা কেমন করিয়া হইবে? মেয়ে বয়স্থা; এই মাসেই কাজ না করিলে নয়! তা' আপনাদের অসুবিধা হইতেছে কিসে?

যতীশ। ছোট ভাইটীর বিবাহ, কুটুম্ব-স্বজনদিগের তত্ত্বতল্লাস লইতে হইবে। ফলকথা, বৈশাখ মাস ভিন্ন কোন প্রকারেই কাজ করিতে পারি না।

তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। আহারাদি সম্পন্ন হইয়াছিল,—সকলে শয়ন করিলেন, যতীশচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে শালওয়ালা আসিয়াছে। শাল, জামেয়ার, খোসা, লুই, আলোয়ান প্রভৃতি বহুপ্রকারের শীতবস্ত্র বিক্রয় করিতেছে। বিশ্বাস-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে দোকান সাজাইয়াছে। গ্রামের লোক প্রয়োজন ও অবস্থামতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে।

পাঁচকড়ির শীতবস্ত্র ছিল না। সে চতুর্দ্দশমুদ্রা মূল্যের একখানা আলোয়ান লইয়া বাড়ী গেল। মাতার নিকট দেখাইয়া বলিল,—"আমার গায়ের কাপড় নাই, তাই এ খানা আনিয়াছি।"

মাতা বলিলেন,—"টাকা?"

পাঁচ। মেজদাদা কোথায়?

মা। পাড়ায় বেরিয়েছে।

পাঁচ। সেজদাদা?

মা। বোধ হয় ঘরে আছে।

পাঁচ। তুমি একবার ডাক না।

মা। কেন? টাকা দিবে? পোড়া কপাল আমার,—সে পাবে কোথায়?

পাঁচ। ঠকিলাম কিনা,—দেখাব।

মাতা তখন পুত্রকে ডাকিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র তথায় আগমন করিলেন। মাতা বলিলেন "পাগল কি ক'রেছে দেখ্।"

ক্ষিতীশ। কি করিয়াছে?

পাঁচ। এই গায়ের কাপড়খানা আনিয়াছি। দেখুন দেখি, ঠকা হইল কিনা?

কাপড় দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"কত হইল ?"

পাঁচ। কত হইলে লওয়া যায় ?

ক্ষিতীশ। টাকা কুড়ি।

পাঁচ। চৌদ্দ টাকা। ঠকা হয় নাই ?

ক্ষিতীশ। না,—কিন্তু টাকা ?

পাঁচ। মেজদাদা দেবেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর না করিয়া, চলিয়া গেলেন।

মধ্যম বধূমাতাকে সেই স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া, শাশুড়ী তাঁহাকে ডাকিলেন। বলিলেন,—"বৌমা, তোমার ছোট দেওর এই পায়ের কাপড় খানা আনিয়াছে,—তুমি যদি বল, তবে রাখে।"

মধ্যম বধূমাতা মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন,—"আমার বলাবলি কি মা ?"

শ্বা। তা' নয়,—তবে বল্‌ছি কিনা, যদি তোমার আপত্তি না থাকে. তাহা হইলে সে ঐ খানা রাখে। তুমি পেঁচোকে পেটের ছেলের মত স্নেহ কর। তুমি যদি মনে কর, তবেই কাপড়খানা রাখ্‌তে পারে। টাকা না হ'লে, কি ক'রে রাখ্‌বে বল !

মেজ। টাকা—মা পাগলের মেয়ে, আমি টাকা কোথায় পাব ? তোমার ছেলে বাড়ী আসুন, থাকে দিবেন।

পাঁচকড়ি বলিল,—"মেজ বউ, তোমার পায়ে পড়ি। চৌদ্দটা টাকা চোখ বুজে ফেলে দাও। শীতে মরি,—গরীবকে শীতবস্ত্র দানে, তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে।"

মেজ। বালাই, তুমি গরীব হবে কেন ? আমার হাতে টাকা নাই, থাকিলে আমি দিতাম।

পাঁচ। হাতে কি কাহারও টাকা থাকে,—বাক্সে আছে। চৌদ্দটা

টাকার মায়া কাটাও বউ। বাক্সে থাক্‌লে সঙ্গে যাবেনা,—যা দিয়ে যাবে, তাই সঙ্গে যাবে।

মেজ। আমি কি মিথ্যা বলিতেছি?—সত্যই আমার হাতে টাকা নাই।

এই সময় সেখানে যতীশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেজবউ চলিয়া গেলেন। যতীশচন্দ্র কাপড় দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,—"সস্তা বটে, কিন্তু টাকার যোগাড় না করিয়া আনিলে কেন? এখন ফিরাইয়া দেওয়াও বড় দোষের; কিন্তু কি বলিব, আমার হাতে কিছুই নাই।"

যতীশচন্দ্র নিজকক্ষে গমন করিলেন। মনে করিয়াছিলেন, মেজ বউকে বলিয়া যদি চোদ্দটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন,—কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল।

তখন পাঁচকড়ি ক্ষুণ্ণস্বরে মাতাকে বলিল,—"তবে ফিরাইয়া দিয়া আসি।"

আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া মাতা বলিলেন,—"আমি কি করিব বল, আমি শুধু মা, কিন্তু এ জন্মে আর তোমাদের কোনও সাধ-অভাব পূরাইতে পারিলাম না!

যে গৃহদাবায় বসিয়া এই সমুদয় কথোপকথন হইতেছিল, তাহা কর্ত্রীর। অনেকক্ষণ হইল, গৃহকার্য্য জন্য ন' বউ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল,—কার্য্যও সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দাবায় লোক থাকায় বাহির হইতে পারিতেছিল না,—দরোজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। শাশুড়ীর চক্ষুর জল দেখিয়া, এবং পাঁচকড়ির কথা শুনিয়া তাহার বড় কষ্ট হইল!

পাঁচকড়ি কাপড়খানি হাতে লইয়া দুই তিনবার নাড়িয়া চাড়িয়া

দেখিয়া বলিল,—"কাপড় তুমি আমার বরাতে হ'লে না। যাও, যার টাকা আছে—তার গায়ে উঠ গিয়ে।"

তার পরে সে কাপড়খানা হাতে করিয়া দাবা হইতে নামিয়া গেল।

পাঁচকড়ি নামিয়া যাইতেই ন' বউ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। শ্বাশুড়ীকে বলিল,—"মা, ঠাকুরপোকে ডাক।"

শ্বাশুড়ী ন' বউর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন, মা?"

ন' বউ। চ'লে গেলেন,—আগে ডাকত।

মাতা তখন পাঁচকড়িকে ডাকিলেন। পাঁচকড়ি ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি?"

ন' বউয়ের হাতে দুইগাছি সরু স্বর্ণ-বলয় ছিল,—সে তাহা খুলিয়া সেই স্থানে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঁচকড়ি বলিল,—"এ বালা কি করিব হাতে দেব নাকি?"

শ্বাশুড়ী গৃহমধ্যে গিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালা কি হবে মা?"

ন' বউ। ঐ দুইগাছা বাঁধা দিয়া টাকা লইয়া আলোয়ানখানা রাখ্‌তে বল।

মাতা ছলছল নেত্রে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সে কথা পাঁচকড়িকে বলিলেন। পাঁচকড়ি কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে আলোয়ান ফিরাইয়া দিতে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত মাঘ মাস বাড়ী থাকিয়া, ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যতীশ-চন্দ্র কর্ম্মস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যে দিন তিনি বাড়ী হইতে যাইবেন, তাহার পূর্ব্বদিবস যখন মাতা ও ক্ষিতীশকে ডাকিয়া সাংসারিক কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, সেই সময় ক্ষিতীশ বলিল,—"লাঙ্গল রাখিয়া আর কাজ নাই। আজ দু'টো বৎসর গাধার খাটুনী খাটি-লাম,—কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অনাবৃষ্টি জন্য এবৎসরও সমস্তই লোকসান।"

যতীশ। যদি লোকসান বিবেচনা কর,—লাঙ্গল তুলিয়া দিয়া জমিগুলা ফসলী বন্দোবস্ত করিয়া দাও।

মা। ভিখু অনেকদিনকার পুরাণো চাকর,—তাহাকে কি জবাব দিবে ?

যতীশ। লাঙ্গল উঠিলে ভিখুকে আর রাখিয়া কি হইবে ? একটা লোকের খোরাক-পোষাক ও মাহিনা দেওয়া, এখন আমাদের পক্ষে দুর্ঘট।

মা। ক্ষিতীশ তুমি তবে এখন কি করিবে ?

ক্ষিতীশ। বিদেশে যাইয়া চাকুরী-বাকুরীর চেষ্টা দেখিব। আমার শাশুড়ী ওদের লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, ওরা আপাততঃ সেখানেই যাক্।

যতীশ। কেন ? তুমি যদি বিদেশেই যাও—সেজ বউমা বাপের বাড়ী কেন যাইবেন ?

ক্ষিতীশ। বাড়ীর কাহারও সহিত যখন বনি-বনাও হয় না,—সে অবস্থায় এখানে থাকিবে কি প্রকারে ?

যতীশ। তুমিই বিবেচনা কর, সে কাহার দোষে ঘটে ?

ক্ষিতীশ। যাহারই দোষে ঘটুক,—ফল কথা, তাহাদের এখানে তিষ্ঠিবার আর উপায় নাই।

যতীশ। তুমি বাড়ী হইতে কবে আসিবে স্থির করিতেছ?

ক্ষিতীশ। এই মাসের তেরই তারিখে শ্বাশুড়ী গাড়ী পাঠাইবেন—ওদের চৌদ্দই পাঠাইয়া দিয়া, আমি সম্ভবতঃ এই মাসের শেষাশেষি যাইব।

যতীশ। শোন ভাই, আমার বিবেচনায় সেজ বউমাকে এখন আর তোমার শ্বশুরবাড়ী পাঠান যুক্তিসঙ্গত নহে।

ক্ষিতীশ। অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে কোথাও হয় না, তাহা আমি জানি। কিন্তু কি করিব,—এখানে যখন কাহারও সহিত সদ্ভাব নাই, তখন আর এখানে রাখিয়া যাই কি প্রকারে?

যতীশ। মা যতদিন আছেন, ততদিন বিশেষ চিন্তার কারণ দেখি না।

ক্ষিতীশ। মাও সে পক্ষে বড় মনঃসংযোগ করেন না।

যতীশচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্টা মাতার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন,—"কি করিব বাবা; আমি আর এ বৃদ্ধ বয়সে ঐ সকল কিচ্ কিচি লইয়া থাকিতে পারি না। সেজো বউমা কথা শুনিবার মানুষও নন।

ক্ষিতীশ। তুমিত মা, তাহার সবই দোষ দেখ। যদি তুমি একটু তাহাকে যত্ন করিতে,—একটু ভালবাসা দেখাইতে, তাহা হইলে কি এতটা হইতে পারিত?

মাতা। বাবা, আর আর সকলকে যেমন যত্ন করি—ভালবাসি, সেজ বউমাকেও তেমনি যত্ন করি—ভালবাসি। আর যে কি করিতে হয়, তাহা আমি জানি না! আমার কাছে সকলেই সমান।

ক্ষিতীশ। না মা,—আমি প্রতি কার্য্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—তুমি সকলকে সমান চক্ষে দেখ না!

মাতা। বাবা, আগে পাঁচ্‌টা সন্তান হোক, তখন জানিতে পারিবে, মায়ের নিকট সকল সন্তানই সমান—সব আঙ্গুলেই সমান ব্যথা। কেন বাবা, আমাকে অনর্থক দোষী কর?

ক্ষিতীশ। না মা, তোমাকে দোষী করি নাই,—দোষ আমার অদৃষ্টের! জীবনে শান্তি কাহাকে বলে, তাহা এ যাবৎ বুঝিতে পারিলাম না। এখন অন্য পন্থা ধরিয়া দেখি, যদি শান্তি পাই।

মাতা। ভগবান্ সকলকেই হাত-পা দিয়াছেন; নিজের ভাল পাগলেও বোঝে,—যাহাতে সোয়াস্তি পাও, তাহা করিয়া দেখিবে বৈ কি!

কর্ত্রী বুঝি কথাটা যে ভাবে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সে ভাবে বলা হইল না। যে প্রকারে বলিলেন, তাহাতে ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিয়া লইলেন, মাতা তাহাকে বিদায় দিলেন! তাহার মনে মনে বড় অভিমান হইল। যতীশচন্দ্রও ভাবিলেন, এ সময়ে এমন কথা বলাটা ভাল হয় নাই!

মাতা কিন্তু ইহাতে কিছুই বিরূপ ভাবেন নাই। সেরূপ বিবেচনা করিলে হয়ত কথাটা অন্যভাবে বুঝাইয়া দিতেও পারিতেন। যতীশচন্দ্রও মাতার কথার প্রতিবাদ করিলেন না! তিনি প্রতিবাদ করিলে, বোধহয় ক্ষিতীশচন্দ্রের প্রাণে যে 'কালবৈশাখীর মেঘ' অনেকদিন হইতে ঘনাইয়া আসিতেছিল, সহসা তাহাতে এমন ঘোরতর ঝটিকার উদ্ভব হইত না। ক্ষিতীশচন্দ্রও সে কথার আর উত্থাপন করিলেন না। উত্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন বুঝিলেন না,—তিনি স্থির বুঝিলেন, মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়াই মা আমাকে বিদায় দিলেন। ক্ষিতীশ যদি সে কথার

পুনরুত্থাপন করিত, বা কলহ বাধাইত, তবে বাচনিক বিবাদে আসল কথার মীমাংসা হইয়া যাইত। তাহা হইল না। ক্ষিতীশ অভিমানে আত্মহারা হইয়া উঠিয়া গেল।

তৎপরদিবস যথাসময়ে যতীশচন্দ্র কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্ষিতীশের শ্বশুর বাড়ী হইতে গাড়ী আসিলে সেজ বউ বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। তাহার তিন দিন পরে অদৃষ্টান্বেষণে ক্ষিতীশচন্দ্র বাড়ী হইতে অনির্দ্দিষ্ট বিদেশ যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস যায় যায়, তথাপি যতীশচন্দ্র বাড়ী আসিতে পারিলেন না,—বা একটী পয়সা খরচ পাঠাইতে পারিলেন না!

অধুনা নব্য-বঙ্গে সকল বিষয়েরই ভাল হউক মন্দ হউক এক একটা সংস্কার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জমিদারী-বিভাগের চাকুরীর সেই মামুলী বন্দোবস্ত সমানই রহিয়া গিয়াছে! সেই চিরন্তন পুরাতন প্রথার বিন্দু বিসর্গও পরিবর্ত্তন হয় নাই!

একজন মাঝামাঝি রকমের নায়েবের বেতন মাসিক অষ্ট মুদ্রার অধিক নহে। কিন্তু সেই অষ্টমুদ্রা মাসিক বেতনের নায়েব মহাশয় বাসায় নিজ ব্যয়ে একটি ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া থাকেন,—এই উভয়ের জন্য তাঁহার মাসিক ব্যয় অন্ততঃ আটের দ্বিগুণ ষোড়শ মুদ্রা। তদ্ভিন্ন বাজে ব্যয় আরও অনেক। তারপর খাওয়া-পরার খরচপত্র আছে। ফল কথা, একজন অষ্টমুদ্রা মাসিক বেতনের নায়েবের বার্ষিক আয় মধ্যবর্ত্তী সুবিধাজনক স্থানে অন্ততঃ পক্ষে আট শত টাকা। এই টাকা আইসে কোথা হইতে? সেই ছিন্নবস্ত্রাবৃত, মহাজন-শোষিত-রক্ত, গৃহহীন, অন্নহীন, ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বঙ্গের কৃষককুলই তাঁহাদের এই টাকা যোগাইয়া থাকে। যে কৃষক তিন টাকা খাজনা দেয়, সে তিন কিস্তিতে আর তিন আট আনা করিয়া হারে—পার্ব্বণী ও ভিক্ষায় দেড় টাকা দিয়া থাকে। জানি না, কবে বঙ্গের দীন কৃষক-কুলের বক্ষ হইতে এই বংশদণ্ড অপসারিত হইবে। এই বংশদণ্ড-পেষণে কৃষককুলের বক্ষঃপঞ্জর বিচূর্ণিত প্রায়!

যতীশচন্দ্র জমিদারের নায়েব,—তাঁহারও আয় ঐ রূপেই; কাজেই

তাঁহার অর্থ প্রাপ্তির সময় ভাদ্রমাস, পৌষমাস, ও চৈত্রমাস। পৌষ মাসে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা শচীর মাতার হস্তে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, চৈত্র কিস্তিতে তিনি একটী পয়সাও পান নাই। না পাইবার কারণ, তাঁহার মহল মধ্যে একটা বাঁয়োড় শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, তাহার জমি লইয়া জমিদারের সঙ্গে প্রজাগণের মনোমালিন্য ঘটে,—প্রজাগণ বলে, যাহার মধ্যে যে থাকের বন্দোবস্ত আছে, সে জলগর্ভস্থ শুষ্ক জমি প্রাপ্ত হইবে। জমিদার বলেন, সে থাক আমরা মানিব না। ঐ সকল জমি নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। সেই বাঁয়োড়ের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের কিছু জমি ছিল,—তিনি শিক্ষিত এবং জেলায় ওকালতী করিতেন। তিনিই অপর প্রজাদিগকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আইন-কানুন শুনাইয়া দিলেন,—তারপরে দল বাঁধিয়া একদিন বহুসংখ্যক লাঙ্গল লইয়া গিয়া জমি বুনিয়া আসিলেন। সেই সূত্রে জমিদার প্রজায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মকর্দ্দমা হইল,—তাহাতে জমিদারপক্ষ হারিয়া গেলেন।

অবোধ মেষশাবকগণ নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে জাগাইয়া তুলিয়া যেরূপ বিপদগ্রস্থ হয়, কৃষক প্রজাগণ জমিদারের সঙ্গে বিরোধ ঘটাইয়া তদ্রূপ বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িল। কিন্তু উকীলবাবু তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমাদের কোন ভয় নাই। ইহা ইংরাজের রাজত্ব—মগের মুল্লুক নয়।" প্রজাগণ তাঁহার আশায় আশান্বিত হইল, কিন্তু জমিদারের লোকেরা নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। উকীলবাবু শান্তি-বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারই পরামর্শে প্রজাগণ খাজনা বন্ধ করিয়া দিল। জমিদার-প্রজায় তুমুল বিবাদ চলিতে লাগিল। কাজেই যতীশচন্দ্রের অর্থপ্রাপ্তি ঘটিল না। অধিকন্তু মামলা-মকর্দ্দমা লইয়া তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত

হইতে হইল, যে এক দিনের জন্যও তিনি বাড়ী যাইতে পারিলেন না।

সেবার ধান হয় নাই, ক্ষিতীশ বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, যতীশ-চন্দ্রও একটি পয়সা পাঠাইতে পারেন নাই,—কাজেই সংসার একেবারে অচল প্রায় হইয়া উঠিল। দিন আর কাটে না!

মাতা যতীশচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে লোক পত্রের উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। পাঁচকড়ি পত্র পড়িয়া মাতাকে শুনাইল।

যতীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—একটি পয়সা পাঠাইবার সাধ্যও আমার নাই। কর্জ্জ করিয়া সংসার চালাইবেন। যদি ভগবান্ দিন দেন দেনা পরিশোধ করিব!"

মাতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! মেয়ে মানুষকে কি কেহ টাকা ধার দেয়? বিশেষতঃ একটি আধটি টাকা নহে!—যতীশ-চন্দ্র অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাহায্য বন্ধ রাখিবেন। এদিকে এখন সংসারের খরচ অনেক হ্রাস হইলেও মাসিক চল্লিশ পঞ্চাশটি টাকার কমে কিছুতেই চলে না!

নিস্তার উঠান দিয়া যাইতেছিল, কর্ত্রী বলিলেন,—"মেজ বউমাকে ডাক্ ত।"

নিস্তার ডাকিয়া আনিল, কর্ত্রী পাঁচকড়িকে পঠিত পত্র পুনরপি পাঠ করিতে বলিলেন। পাঁচকড়ি পড়িয়া শুনাইল। মেজ বউ বলিল,—"তা' আমি কি করিব বল? যা ভাল বিবেচনা হয় কর। দেখ মা এই সময় যদি ন' ঠাকুরপো কিছু কিছু দিতেন, তবে কি আমাদের এমন হয় গা? একা মানুষ, আর কত করিবেন বল? বিশেষতঃ একটা উপস্থিত বিপদে পড়িয়াই এমনটি হইল! নতুবা শরীরের রক্ত জল করিয়া সেই মানুষই ত সব করিয়া আসিতেছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, আমি কি আর তা' জানি না! দানীশ আমার যা' করিল তা' ভালই করিল! বড় আশা করিয়াছিলাম, দানীশ আমার মানুষ হ'ল—সকল দুঃখ দূর হবে। আমার অদৃষ্ট গুণে সে আশা নিষ্ফল হইল! এখন উপায় কি, বল দেখি, মা?"

মেজ। হ্যাঁ মা, আমি তা কি বলিব? আমি কি আর তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরি?

কর্ত্রী। তুমি বৈ আর গতি নাই, মা;—সকলে কি না খাইয়া শুকাইয়া মরিব?

মেজ। সে কি মা, তোমার ছেলে কি কখন আমাকে দু'শো পাঁচশো দিয়াছে যে, তাই দেবো?

কর্ত্রী। টাকা কোথায় পাবে মা—তাই দেবে! যা রোজগার করে, সংসারেই আঁটে না।

মেজ। তবে আমি কি করিব বল?

কর্ত্রী। ন' বউর দু' গাছি বালা ছিল, তা সে দিন বাঁধা দিয়া চল্লিশ টাকা আনিয়া এই একমাস চালাইয়াছি।

মেজ। এখন কি বলিতে চাও?

কর্ত্রী। তুমি একখানা গহনা দাও।

মেজ। আমার গহনা?—গহনাত ভারি। ঐ দু'গাছা বালা, আর হার ছড়াটা;—তা আমি প্রাণ থাকিতেও দিতে পারিব না।

কর্ত্রী। ন' বউমা ছেলে মানুষ; তিনিত সংসারের কষ্ট দেখে, না চাইতেই দিলেন।

মেজ। সে দেবে না কেন,—তার ভরসা আছে। তার স্বামীর মাসে দেড়শো টাকা আয়।

কর্ত্রী। ও আমার পোড়াকপাল! সে আবার তার কি মা? দানীশ কি কখনও তাহাকে একটি রূপার আঁকৃড়া দিয়াছে!

মেজ। না দিক্, ভবিষ্যতে দেবার আশা ত আছে। ক্রমেই ন' ঠাকুরপোর উন্নতি হবে, ক্রমেই মাইনে বাড়বে, ক্রমেই ন' বউ সুখী হবে।

পাঁচকড়ি সদানন্দ। সে হাসিতে হাসিতে মেজ বউকে বলিল,—"অত কথা আমি বুঝি না। যদি দিতে হয় ফেলে দাও। আর না দাও, ঘরের মধ্যে গিয়ে কৃত্তিবাস ঠাকুরের রামায়ণ আওড়াও।"

কটাহের উত্তপ্ত তৈলে বার্ত্তাকু ছাড়িয়া দিলে তাহা যেমন বিবর্ণ হইয়া শব্দ করিয়া ওঠে, মেজ বউ তেমনই হইয়া উঠিল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, কণ্ঠস্বরে দীপকের আমেজ আনিয়া বলিল,—"কি আমাকে এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা! আমি কি এ বাড়ীর কেউ নই! আমাকে এমনই করিয়া অপমান করা! থাকিব না আর এ বাড়ীতে—শচীকে কোলে করিয়া এখনই বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব। যাই হোক্, এখনও ত ছোঁড়া আছে, সে আমাকে একমুঠা ভাত দিতে পারিবে। তারা এমন লক্ষ্মীছাড়া নয়। ওমা, আমি কি সংসারের কোন কাজ করি না, কেবল রামায়ণ পড়িয়াই দিন কাটাই!"

"ছোঁড়া" অর্থে তাঁহার একটি পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ভ্রাতষ্পুত্র, রামসেবক। যাহার স্বামীর আয়ের উপরে সংসারস্থ জীব সকলে জীবনধারণ করে, তাঁহার এত ক্রোধ—এত অভিমান!—বাসুকী টলিয়া উঠিল। কর্ত্রী ভীত—কম্পিত করুণকণ্ঠে কহিলেন,—"মা, ও পাগল; তোমার কোলের ছেলে, ওর কথায় কি অত রাগ করিতে আছে?"

পাঁচকড়ির চিত্তে কিন্তু তখনও কোন গোলযোগ নাই। সে

পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"রামায়ণ না পড় মহাভারত পড় গে।"

অপেক্ষাকৃত অধিকতর তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে মেজ বউ বলিলেন,—"আমাকে ঠাট্টা! আমি কি তোর ঠাট্টার যোগ্য রে পেঁচো?

পাঁচকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"পেঁচো পোয়াতির যম! সাবধান! অত করিয়া বলিও না।"

রক্তমুখী হইয়া মেজ বউ বলিলেন,—"আমার শচীকে গালাগালি? পেঁচোয় পাবে বলিয়া অভিশাপ করিতেছ? তা করিবে না! বসিয়া বসিয়া যার খাবে—আবার তারই ছেলেটীর মাথা খাবেনা ত কি করিবে! তোমাদের ইচ্ছা, শচী মরিয়া যাক্,—আর যা' কিছু তোমরা নাও।"

স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণে ধূমাচ্ছন্ন হইলে তাহা যেমন বিমলিন হইয়া যায়, পাঁচকড়ির সদা প্রফুল্ল মুখ তেমনই মসী-মলিন হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"আমি শচীকে গালি দিলাম? বউ তুমি আমাকে এমন কথা কেন বলিলে?"

মেজ। ওগো, দশেধর্ম্মে সব শুনেছে,—আর কাজ নাই। আর মায়া জানাইতে হইবে না। এখনও তবু কেহ একবেলার ভাতও দাও নাই, ইহাতেই এত করিয়া বলিতেছ, যদি কখনও দাও, তবে বুঝি আর আমার মাথা রাখিবে না।

কর্ত্রী। মেজ বউমা! ও ত এমন কিছু বলে নাই, বিনা কারণে কেন অত করিয়া বলিতেছ?

মেজ। তবে নয়, যা' না বলিয়াছে—তা' বলুক। আমি বিনা কারণে ঝগড়া করিতেছি? বুঝিয়াছি গো,—কয় মাস টাকা পাঠাইতে পারে নাই, তাই শচী আর আমি তোমাদের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছি।

না হয়, আর আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র থাকিব না,—যেরূপেই হউক, আমি একবেলা খাইয়া দিন কাটাইতে পারিব!

কর্ত্রী। বউ মা, তবে কি পাঁচকড়িকে পৃথক করিয়া দিবে?

মেজ। আমি কাহাকে পৃথক করিয়া দিব?—আমি তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছি, আমিই পৃথক হইব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মেজ বউ সেখানে আর দাঁড়াইলেন না। বিবিধ প্রকার বাক্য-বি[illegible]স বর্ত্তমান কলহের উপসংহার করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। [illegible]ড় এক কড়া উপার্জ্জন করিবে না, কেবল সেই একটা মানুষের রক্ত জলকরা অর্থ বসিয়া বসিয়া খাইবে, আর যাহাকে তাহাকে যখন তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে,—এমন কি উত্তর করিলে মারিতেও আসিবে, ইহাই সেই উপসংহারভাগের সারাংশ।

পাঁচকড়ি সে সকল কথা শ্রবণ করিল। অশ্রুসিক্ত নয়নের করুণ উদাস দৃষ্টি মাতার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া বলিল,—"কে জানে আ'জ সকালে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিলাম। সাধে কি আমি বলি, যে সংসারের এ সকল উৎপাতের চেয়ে, নির্জ্জন স্থান ভাল—জনহীন স্থানে গিয়া প্রাণায়াম ও মাতৃচরণ চিন্তা করিলে শান্তি পাওয়া যায়।

নিস্তারিণী সেখানে দাড়ইয়া দাঁড়াইয়া মেজ বউর নিরর্থক ঝগড়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেছিল, এবং উপার্জ্জনাক্ষম পাঁচকড়ির বিনা কারণে লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইতেছিল। এতক্ষণে পাঁচকড়ির অন্য উপায় আছে জানিতে পারিয়া সমবেদনার স্বরে বলিল,—"তা ছোট বাবু যদি প্রাণায়াম করিয়া দু' টাকা উপার্জ্জন করিতে পার, তবে তা কর না কেন? পরের রোজগার খাইতে হইলেই মুখঝাড়া খাইতে হয়! সকলেই ত আর এক চাকরী করে না! প্রাণায়াম করিতে কোন্ দেশে যাইতে হয়?"

"যমের বাড়ী!" এই কথা বলিয়া পাঁচকড়ি উঠিয়া গেল। মাতা একটী আকুল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

পাঁচকড়ি যখন উঠান দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় "আমি ছোট কাকার কাছে যাব" বলিয়া শচী ছুটিয়া আসিল। পাঁচকড়ি এই দুঃখের সময় সর্ব্ব-সন্তাপ-বিনাশক শচীকে পাইয়া পাঁচকড়ি বক্ষঃপ্রসারণ করিয়া ক্রোড়ে তুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা হইল না। শ্যেন [illegible] ন্যায় আসিয়া শচীর মাতা শচীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া [illegible]লেন। "আমি যাব" বলিয়া শচী তাঁহার ক্রোড়ে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সেই কচিগণ্ডে এক চপেটাঘাত করিয়া মেজ বউ বলিলেন,—"আর আদরে কাজ নাই। যদি মর্‌বি, আমার কোলেই মর্। যারা তোর মরণ-কামনা না করিয়া জল খায় না,—তাদের কাছে আর যেতে হবে না।"

শচীকে লইয়া তিনি কক্ষমধ্যে চলিয়া গেলেন। কাকার কক্ষবিচ্যুত শচীশচন্দ্র চপেটাঘাতে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল,—সে কক্ষমধ্যে গিয়া রোদন-চীৎকারে সমস্ত বাটীটি মুখরিত করিয়া তুলিল। পাঁচকড়ি তাহার পুনরাগমনের আশায় তখনও সেই স্থানে স্থানুর ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু মেজ বউ যখন পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ঝনাৎ করিয়া গৃহ-দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন পাঁচকড়ি ব্যথিত-বিদীর্ণ বক্ষঃ চাপিয়া ধরিয়া মাতার নিকট ফিরিয়া গেল!

ন' বউ দূর হইতে সমস্ত শুনিতেছিল, যখন মেজ বউ পাঁচকড়ি ও নিস্তার সকলেই সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং শ্বাশুড়ী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া নীরবে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, তখন সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,—"দুঃখ করিয়া কি করিবে মা, এখন চল ওঘরে যাই"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্রী কহিলেন,—"দুঃখ করিব কাহার উপর মা! অদৃষ্ট ছাড়াত পথ নাই! তবে ঐ হতভাগা ছোঁড়াটার

মেজবউ বলিলেন—"আর আদরে কাজ নাই। যদি মরবি, আমার কোলেই মর" ১১২ পৃষ্ঠা।

The Emerald Printing Works, Calcutta

মাতার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে জল ঝরিতে লাগিল। ন' বউ তাড়াতাড়ি নিজ অঞ্চলের মৃদুস্পর্শে সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"বালাই, উনি বেটাছেলে, উহার দুঃখ কি? আমরা মেয়ে মানুষ, ঘরের বাহির হইতে পারি না, কাজেই নীরবে পড়িয়া অদৃষ্টতাড়না সহ্য করি।"

এই সময় অতি ম্লানমুখে রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঁচকড়ি ফিরিয়া আসিল। হৃৎপিণ্ডে বিপুল বেদনা ধরিলে মানুষ যেমন বসিয়া পড়ে, পাঁচকড়ি সেইরূপভাবে বসিয়া পড়িল! ন' বউ একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

মাতা সে ভাব নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল রে?

ধরা গলায় ভরা আওয়াজে পাঁচকড়ি বলিল,—"না কিছু হয় নাই। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না।"

মা। কেন, হঠাৎ আবার কি হ'ল? কোথায় যাবি?

পাঁচকড়ি একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল, বুঝি জ্ঞান হইয়া অবধি এমন মর্ম্মান্তিক দুঃখময় স্বরে সে এই প্রথম কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মেজ বউ আমার বুকের ভিতর হইতে আমার প্রাণের পুতুল শচীকে কাড়িয়া লইয়াছেন।"

মা। যার ছেলে সে যদি লয়, তুই কি করিবি?

পাঁচ। শচী পাগলের প্রাণের বন্ধনী,—মেজ বউ সে বাঁধন খসাইয়া লইলেন। আমি এ বাড়ীতে আর থাকিব না।

মাতাও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"অনেক রকমে কষ্ট পাইতেছি। আবার তুই যেন পলাইয়া গিয়া কষ্ট দিস্ না। যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, সে কয়দিন সামনে থাক্, তারপরে যেখানে অদৃষ্টদেবী লইয়া যাইবে সেইখানে যাস্।"

পাঁচকড়ি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। তারপরে দীর্ঘশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"না খাইয়া সম্মুখে থাকিব কি প্রকারে? মেজ বউ আর আমাদিগকে খাইতে দিবেন না। যেরূপ অবস্থা, তিনি দাদাকে লিখিয়া পৃথক হইবেন। তখন উপায় কি হইবে?"

মা। উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু।

পাঁচ। ন' দাদা যে কি করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সবাই বলে, ভিতরে কোন একটা গূঢ় ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতেই তিনি বাড়ী ঘর ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি একটা কথা বলিতেছি।

মা। কি?

পাঁচ। কা'ল সকালেই আমি মজঃফরপুর যাই। সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার ব্যাপারটাও জানিয়া আসিতে পারিব,—আর কিছু আনিতেও পারিব।

মা। সে কথা মন্দ নয়; কিন্তু যাবি কি ক'রে? পথখরচ ত চাই।

বড় বউ পাড়ার মধ্যে গিয়াছিলেন, তিনি বাড়ী আসিয়া নিস্তারের নিকট সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া শাশুড়ীর নিকট আগমন করিলেন।

পাঁচকড়ি অর্থাভাবে মজঃফরপুর যাইতে পারিবে না, অথচ সেখানে যাইতে পারিলে এই আনাটনের একটা উপায় হইতে পারে, ইহা বুঝিয়া বড় বউ বলিলেন,—"আমার একছড়া রূপার চন্দ্রহার আছে। সেই ছড়া বিক্রয় করিয়া কিছু আমাদিগকে খোরাকীর জন্য দিয়া অবশিষ্ট লইয়া তুমি মজঃফরপুর যাও, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের একটা উপায় হইতে পারিবে।"

তখন সকলেরই সেই মত হইল। বড় বউ বাক্স খুলিয়া তাঁহার চন্দ্রহার বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন, বিক্রয় করিবার জন্য পাঁচকড়ি তাহা লইয়া স্বর্ণকারের দোকানে গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য বেলা সাড়ে আটটার গাড়ীতে পাঁচকড়ি মজঃফরপুর যাত্রা করিবেন।

বেলা আটটা বাজিতে বাজিতে বড় বউ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন; পাঁচকড়ি স্নান করিয়া আসিল, কিন্তু আর আহার করিতে বসিতে পারে না। তাহার অনুসন্ধিৎসু নয়ন তখন স্নেহের উৎস লইয়া চতুর্দ্দিকে শচীর সন্ধান করিতেছিল। শচী নিকটে বসিয়া না খাইলে তাহার আহারে তৃপ্তি হয় না। বিশেষতঃ কণ্ঠহার শচীকে রাখিয়া আ'জ সে কোন্ সুদূর প্রদেশে গমন করিবে! কতদিন আর শচীর মুখ দেখিতে পাইবে না! কা'ল হইতে যে, সে শচীকে ক্রোড়ে লইতে পায় নাই; এতক্ষণ কি সে শচীকে ক্রোড়ে না লইয়া থাকিতে পারে?

বড়বধূ বলিলেন,—"গাড়ীরও আর সময় নাই, খা'বে এস।"

পাঁচকড়ি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু শচীর দর্শন পাইল না। গাড়ীরও আর সময় নাই। অগত্যা অপ্রসন্নমনে বিষণ্ণবদনে আহার করিতে বসিল।

সহসা তাহার কর্ণে শচীর কথা প্রবেশ করিল। শচী বলিতেছে,—"আমি কাকার সঙ্গে ভাত খাব।"

মেজ বউ তাহাকে কোলে লইয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন, এই সময় তিনি বাড়ী ফিরিলেন। শচী ছোট কাকার সঙ্গে খাইবার জন্য জেদ ধরিয়াছে, মাতাও তাহাকে লইয়া গৃহ গমনের চেষ্টা করিতেছেন। ছেলে কোলের উপর কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে,—মাতা তথাপিও তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছেন না।

শচীর প্রথম স্বর শুনিয়াই পাঁচকড়ি তাহার দিকে চাহিয়াছিল. তাহার মনে হইয়াছিল, শচী আব্দারে মাতাকে পর্য্যস্ত করিয়া চলিয়া আসিবে। কিন্তু মাতা যখন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িলেন না. তখন সে অতি কাতরে বলিল,—"মেজ বউ, শচীকে ছাড়িয়া দাও, ও না বসিলে আমার যে. খাওয়া হয় না।"

মেজ বউ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার প্রাবৃটের তমসাচ্ছন্ন অম্বরের ন্যায় মুখ দেখিয়া পাঁচকড়ি চমকিয়া উঠিল। মেজ বউ রোদন শীল শিশুকে প্রহার করিয়া অত্যন্ত বলপ্রকাশে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তাহাতে পাঁচকড়ি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, এবং করুণ নয়নে বড় বউর দিকে চাহিল। তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত কাতরতা মাতৃক্রোড়স্থ মুমূর্ষু শিশুর দৃষ্টির ন্যায় বড় বউর মর্ম্মস্পর্শ করিল।

তিনি বলিলেন,—"কি করিবে দাদা, মেজ বউর শরীরে মানুষের রক্ত নাই; ভাত খাইয়া মা দুর্গার নাম করিয়া যে কাজে যাইতেছ, তাই এস। বাড়ী আসিয়া আবার শচীকে কোলে লইও।"

পাঁচকড়ি আর কোন কথা বলিল না। কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ অন্ন উদরস্থ করিয়া উঠিল। তারপরে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া মাতৃ-চরণে প্রণাম করিল। তদনন্তর বধূদিগের চরণে প্রণত হইয়া বার বার মেজ বউর গৃহপানে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল,—যাইবার সময় একবার শচীর মুখখানি দেখিয়া যাইতে পারিলে বুঝি তাহার প্রাণ শীতল হইত। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দিল না।

গাড়ীর আর সময় নাই। পাঁচকড়ি বাটীর বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার যেন একবার কাণে যাইতেছিল—"ছোট কাকা দাঁড়াও, আমি যাব" বলিয়া শচী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া

দেখে, কেহ নাই, কেবল শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া দেবদারুবৃক্ষে বাতাস বহিতেছে।

পাঁচকড়ি যখন ষ্টেশনে গেল, তখন গাড়ী আসিয়া দাড়াইয়াছিল। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সেখান হইতে মুখ বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে লাগিল; বুঝি তাহার মনে হইতেছিল—শচীকে হয়ত তাহার মাতা এখন ছাড়িয়া দিয়াছে, সে হয়ত একেলা পথে ছুটিয়াছে, পথেতে কত গরু বাছুর। মা, সর্ব্ব-মঙ্গলা,—শচীকে রক্ষা করিও।"

প্রবল অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিতেছিল।

এই সময় ভীষণ শব্দে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথপুর ক্ষুদ্র পল্লী। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় সমস্ত গ্রামখানি সমাচ্ছন্ন,—বাঁশ, নারিকেল, আম্র, কাঁঠাল, গুবাক, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষ-বেষ্টিত গৃহস্থের বাড়ীগুলি ইহারই মধ্যে অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। পশ্চিমাকাশের শুকতারা তাহার দীপ্ত কিরণ ঢালিয়া সে অন্ধকার বিনাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যস্ত হইতেছিল।

একটি ছিন্ন ছত্র বগলে করিয়া, দক্ষিণহস্তে জুতাযোড়াটি লইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র এই সময় হন হন করিয়া রঘুনাথপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদনীরসিক্ত এবং দেহ পরিশ্রমক্লান্ত।

রঘুনাথপুরে ক্ষিতীশের শ্বশুরবাড়ী। গ্রামের মাঝখানে কৃষ্ণদাস ঘোষের বাড়ী। স্ত্রী, দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া কৃষ্ণদাস অনেক দিন হইল ইহলোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ কন্যার সহিত ক্ষিতীশের বিবাহ হইয়াছিল।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই একজন পরিচিত কৃষকের সহিত ক্ষিতীশের সাক্ষাৎ হইল। সে তখন তাহার বলদ দুইটিকে চরাইয়া মাঠ হইতে ফিরিতেছিল। হর্ষোৎফুল্লস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"জামাই-বাবু কোথা থেকে গো? বাড়ীর সব ভাল ত?"

ক্ষিতীশচন্দ্র পরিশ্রমের তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি বাড়ী হইতে আসিতেছি না। দুইমাস হইল বাড়ী ছাড়া। অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছি। ও বাড়ীর সব ভাল ত?"

কৃষ। হ্যাঁ, সব ভাল। কেবল ছোট মাঠাকুরুণের অসুখ শুনিয়াছি।

এই কৃষকের বাস ক্ষিতীশের শ্বশুরবাড়ীর পার্শ্বে। ক্ষিতীশের শ্বশুরকে দাদা বলিয়া, এবং তাঁহার কন্যাদিগকে মাঠাকুরুণ বলিয়া ডাকিত। ছোট মাঠাকুরুণ অর্থে ক্ষিতীশের স্ত্রী।

তাঁহার বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"কি অসুখ?"

কৃষ। জ্বর। জ্বরটা একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে।

ক্ষিতীশ। ক' দিন হইয়াছে?

কৃষ। বার চোদ্দ দিন হবে। মানপুরের ডাক্তার দেখ্‌চে।

ক্ষিতীশ। একটুও বিশেষ হয় নাই?

কৃষ। দুপুরবেলা মাঠ থেকে গিয়ে শুনেছিলাম, আজ একটু বেড়েছে। তা' ভয় নেই,—সেরে যাবে।

গৃহে অগ্নি লাগিয়া ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৃহমধ্যস্থ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি তখন একদিকে অগ্নিদাহ অল্প দেখিয়া বাহির হইবে বলিয়া ছুটিতেছে, এমন সময় যদি সেদিকেও লহ লহ আগ্নিশিখা দেখা দেয়, তবে তাহার প্রাণে যে ভাব উপস্থিত হয়, ক্ষিতীশের প্রাণে সেই ভাব সমুপস্থিত!

বাটী হইতে বাহির হইয়া দুইমাসকাল কত স্থানে ঘুরিয়াছে, কত জনের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে,—কত লোকের তোষামোদ করিয়াছে, কিন্তু সামান্য একটী চাকুরীর সুবিধা কোথায়ও করিতে পারে নাই! মাসিক দশমুদ্রা বেতন দিয়াও কেহ তাহার জ্বলন্ত প্রাণে শান্তি ঢালিতে স্বীকৃত হয় নাই!

নিরাশার রুদ্ধনিশ্বাস লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিল—ব্যর্থ প্রয়াসের বেদনাতপ্ত প্রাণ—সেখানে গেলে কথঞ্চিৎ শান্ত হইবে ভাবিতেছিল,

কিন্তু পথেই যাহা শুনিল, তাহাতেই বুঝিল যে, জীবন তাহার কেবল যাতনার জন্য! সুখ বা শান্তি তাহার অদৃষ্টে নাই!

মোহান্ধ যুবক! এ অশান্তির বিকট দহন তোমরা নিজে নিজে টানিয়া আন! "ভাই ভাই" মিলিয়া যদি নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে সৎশিক্ষা-দানে একত্রে গাঁথিবার চেষ্টা কর, তবে এমন বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণার বিজাতীয় দাহনে পরিত্রাহি ডাক ডাকিতে হয় না,—এমন অশান্তির আগুণে, দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে হয় না,—এমন শূন্য, অবলম্বনহীন হইয়া স্রোতো-মুখের কুটার ন্যায় দিক্ হইতে দিগন্তরে ভাসিয়া বেড়াইতে হয় না!

ক্ষিতীশ স্পন্দিতবক্ষে শুষ্কমুখে শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইলেন। গৃহ-দাবায় জুতাজোড়াটা ফেলিয়া, কক্ষের ছাতাটি দেওয়ালগাত্রে হেলাইয়া রাখিয়া ডাকিলেন,—"ঘোষ মহাশয় বাড়ী আছ না কি?"

ঘোষ মহাশয় অর্থে তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক হরিচরণ ঘোষ। হরিচরণ সম্বন্ধে এবং বয়সে তাঁহার বড়।

হরিচরণ বাড়ী ছিলেন না। রন্ধনগৃহ হইতে রমণীকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গা? দাদা বাড়ী নাই, মানপুরে ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন।"

"আমি ক্ষিতীশ"—ক্ষিতীশ দাঁড়াইয়াছিল, এই কথা বলিয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

যে কথা কহিয়াছিল, সে ক্ষিতীশের মধ্যমা শ্যালিকা। নাম বিরাজমোহিনী।

বিরাজমোহিনী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল,—"কে রায় মহাশয়? আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। শিবুর বড় ব্যারাম।"

ক্ষিতীশ। আসিয়াছি—না আসিলে এ যাতনাভোগটা বাকী থাকিয়া যাইবে যে!

বিরাজমোহিনী সে কথার অর্থগ্রহণ করিল না; সে বাহির হইয়া আসিয়া গৃহমধ্য হইতে একখানা আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, এবং তাহার দাদার ছোট মেয়ে ঢ়ীকে এক ঘটী জল আনিয়া দিতে বলিল

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"মা কোথায়?"

বিরাজ। শিবুর কাছে, পশ্চিমের ঘরে।

ক্ষিতীশ। ব্যারাম কি বড় শক্ত?

বিরাজ। হাঁ,—আজ বড় বাড়িয়াছে। ভুল বকিতেছে—চোখ লাল হইয়াছে। দত্তখুড়া হাত দেখিয়া বলিলেন, নাড়ীর অবস্থাও নাকি খারাপ। রাত্রি দুইপ্রহরের সময় জ্বর কম হয়,—সেই কমের সময় আশঙ্কার কথা। তাই শুনিয়া দাদা ডাক্তারের কাছে গিয়াছেন।

উত্তপ্তশ্বাস বক্ষে চাপিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন,—আমাকে বুঝি সকল জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সেজ বউ স্বর্গগমন করিবে! যাহার একটি পয়সা সংস্থান নাই, যে সারা বিশ্বে একটি পয়সা উপার্জ্জন করিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না, তাহার পক্ষে এ মরণ মঙ্গলের হেতু! ক্ষিতীশের দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। বিরাজ-মোহিনীকে গোপন করিয়া কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"চল, একবার দেখিয়া আসি।"

বিরাজমোহিনী ক্ষিতীশকে সঙ্গে লইয়া যে গৃহে সেজ বউ রোগ শয্যায় পড়িয়া ভুল বকিতেছিল তথায় প্রবেশ করিল।

গৃহতলে শয্যার উপরে চৈতন্যবিরহিতা শিবমোহিনী,—রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এবং ভুল বকিতেছে। শিরোদেশে মৃণ্ময় প্রদীপে স্নিগ্ধ বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। শিবমোহিনীর মাতা পার্শ্বে বসিয়া আছেন,—সমস্ত গৃহখানি জুড়িয়া যেন মৃত্যুগন্ধী বায়ু স্তব্ধ হইয়া আছে। পাড়ার

তন্নুর মা আর শ্যামের খুড়ি দূরে দেওয়াল হেলান দিয়া নিস্তব্ধে বসিয়া আছেন।

বিরাজমোহিনী বলিল,—"মা, রায় মহাশয় এসেছেন।" পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া, মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"মা আমার এক দিনও সুখী হইতে পারেন নি। এমন জামাইএর হাতে দিয়াছিলাম যে, একটী রূপার আঁকড়া দিয়াও শুধায় নি। সংসারের জ্বালায়—শাশুড়ী-জায়ের বিষ-কথায় মার শরীর আমার জর জর। অভিমানিনী মা আমার অভিমানেই প্রাণত্যাগ করিলেন!"

তন্নুর মা বড় পাকা গিন্নী। তিনি বলিলেন,—"নে বউ, জামাইটে কোন্ দেশ থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল, এখনও তার ঘাম শুকায়নি,—এখনও তার পায়ের ধূলো ধোয়া হয়নি,—এদিকে তার স্ত্রীর মৃত্যুশয্যা,—আর তুই এখন বল্লি, তোর মেয়েকে এমন জামাইএর হাতে দিয়েছিস্ যে, সে গহনা দেয় নি! ব'স বাবা ব'স,—ভয় কি, ব্যারাম হ'য়েছে, সেরে যাবে।"

ক্ষিতীশ কোন কথাই কর্ণে তুলিলেন না। তিনি হাত দেখিতে জানিতেন। রোগীর পার্শ্বে গিয়া হস্ত টিপিয়া দেখিলেন। দুইবার তিনবার করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "না, আজই প্রাণের আশঙ্কা নাই। নাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে, সুচিকিৎসা হইলে, বাঁচিবার আশা করা যায়। মাথায় কতকগুলা রক্ত উঠিয়াছে, সেই জন্যই এত ভুল বকিতেছে।"

তন্নুর মা বলিলেন,—সে কথা আমি আজ তিন চারিদিন ধরিয়া বলিতেছি। মানপুরের কেলে নাপিত, সে আবার চিকিৎসা করিতে জানে, তাই এতবড় রোগ সারিবে। চতুরপুরের দেবু ডাক্তারকে আন্‌লে কোন্ কালে রোগ সেরে যেত।"

ভ্রূকুটী করিয়া সেজ বউর মা বলিলেন,—"ওগো, সব টাকার কাজ। হরি আমার আর পারে কত, একবার ভাতকাপড় দিয়া পুষিতে হবে, আবার ডাক্তারের টাকা কোথায় মিলে! কালিকে সামান্য কিছু দিলেই অষুধ দেয়, তা'ই তা'কেই দেখান হ'চ্চে। এখন এলেন, আ'জ যদি বাঁচে, কা'ল দেবু ডাক্তারকে আনুন।"

তনুর মা বলিলেন,—"তা' আন্‌বেন বৈ কি! যাও বাবা, এখন তুমি হাতমুখ ধোওগে। ভয় কি,—ব্যারাম মানুষের হইয়াই থাকে, সারিয়াও যায়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ডের সময় হরিচরণ "কালী ডাক্তার"কে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, কোথা হইতে? তুমি যে বহরমপুরের ঊদিকে গিয়াছিলে?"

বিষাদ-ক্লিষ্ট স্বরে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"শুধু বহরমপুর! কলিকাতা, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, আসাম না গিয়াছি,—কোথায়?"

হরি। কি জন্য গিয়াছিলে?

ক্ষি। চাকুরার জন্যে।

হরি। জুটিল?

ক্ষি। না।

হরিচরণ ক্ষিতীশের সহিত কালী ডাক্তারের পরিচয় করাইয়া দিলে তিনি বলিলেন,-রায় মহাশয়, রোগীকে দেখিয়াছেন কি?"

ক্ষি। হাঁ, দেখিয়াছি। তবে আমরা ত আর তেমন বুঝি না। তুমি দেখ।"

কালী ডাক্তার জাতিতে নাপিত। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের কয়েক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পরে সে বৎসরকার দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন দিয়া কয়েকটী রোগী আরোগ্য করিয়া হঠাৎ ডাক্তার হইয়া পড়েন। এখন তাঁহার পসার বেশ!—নিকটবর্ত্তী ডাক্তারদের নিকট হইতে দুই চারিটা ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া, যদুবাবুর সরলজ্বর চিকিৎসা দেখিয়া ঔষধ দিয়া একজন নামজাদা ডাক্তার হইয়া পড়িয়াছেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়

রোগ চিনিতে পারেন না,—ঔষধ নির্ব্বাচনও হয় না। ঔষধের নাম পড়িতে বা বলিতে হইলেই বিষম গোলযোগ বাধিয়া উঠে।

কালী ডাক্তার হরিচরণের সহিত গর্ব্বিত পদক্ষেপে রোগীর গৃহে গমন করিলেন। হাত টিপিয়া, চোখমুখ দেখিয়া সরিয়া আসিলেন

অপরাধীর ন্যায় ক্ষিতীশও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখ্‌লে ?"

মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বিকাশ ও অভিজ্ঞতার জ্যোতি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়া কালী ডাক্তার বলিলেন,– "ক্রমি-উব্বান।"

এত দুঃখেও হাসি আসিল। মুখের হাসি মুখে চাপিয়া ক্ষিতীশ বলিলেন,—"নাড়ীর অবস্থা কি প্রকার ?"

কালী। উব্বান বিগারে যেমন হয়।

ক্ষি। আমি তাহা বলিতেছি না,—বাঁচিবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কালী। আমি ত আর ভীষ্মিদেব নই যে, তা বলিব!

ক্ষি। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। তুমি কি সে প্রকার বুঝিতেছ ?

কালী। কোন শালা তা বল্‌তে পারে না। আমি এ নাগাৎ কত ডাক্তার দেখ্‌চি—কৈ, কারু ত তেমন ক্ষেমতা দেখিনি।

ক্ষি। যদি তেমন হয়, তবে কি করিতে হইবে ? তুমি রাগ করিও না কালীবাবু! চিকিৎসক এ সব বিষয় রোগীর আত্মীয়গণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাহারা ত আর নিজে এ সকলের মীমাংসা করিতে পারে না।

কালী। না, আমি রাগ্‌বো কেন ? আপনি আমার পরীক্ষা কোচ্চেন, তা করুন। কত বেটা আমাকে ঘাঁটীয়ে দেখেছে।

ক্ষি। যদি নাড়ী ছাড়ার উপক্রম হয়, তবে কি ঔষধ দেবে?

কালী। কেন,—ব্রাণ্ডী একের নম্বর. কাডেম-মকোং, স্প্রীট কলেরা ইতর,—এই কয়পদ অসুদ দিলেই ঠিক হবে। যে রোগী মরিতেছে,—এ অসুদের গুণে সেও একবার কথা কহিয়া যায়।

ক্ষিতীশচন্দ্র দানীশের চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক লইয়া মধ্যে মধ্যে পাঠাদি করিতেন। ঔষধগুলির নাম যদিও কালী ডাক্তার কিছুমাত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না, তথাপি যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলেন, এই ঔষধগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত মন্দ হইবে না, তিনি বলিলেন,—"যদি উহা ব্যবস্থা হয়, তবে দাও।"

একখানা গামোছায় জড়ানো ছোট ছোট গুটিচারেক শিশি ছিল, গামোছা টানিয়া শিশি খুলিয়া বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল,—"একটা শিশি আর একটু জল দাও।"

তখনই তাহা প্রদত্ত হইল। কালী ডাক্তার তখন লেবেলহীন সেই শিশিগুলি হইতে কোন ঔষধ এক ফোঁটা, কোন ঔষধ দুই ফোঁটা ঢালিয়া দিল এবং খানিক জল দিয়া শিশিটা বার দুই ঝাঁকিয়া বলিল,—"এই ঔষধ তিন ঘণ্টা অন্তর ছয়বার খাইয়ে দেবে।"

ঔষধের অবস্থা দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্রের মন নিতান্ত বিচলিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এত বড় রোগ বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় রহিয়াছে! কিন্তু কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। গৃহ হইতে বাহির হইয়া দাবায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

কালী ডাক্তার তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া একটা আলো ও লোক লইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষিতীশ হাত মুখ ধুইয়া আর একবার গিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, জ্বর কম হইয়া আসিতেছে, কিন্তু নাড়ীর অবস্থা পূর্ব্ববৎই

আছে। কাজেই ভরসা জন্মিল যে, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না।

যথাসময়ে আহার প্রস্তুত হইলে, হরিচরণের সহিত ক্ষিতীশও ভোজন করিতে গেলেন। ভোজনে তাঁহার কিছুমাত্র রুচি ছিল না,—তবে দিবাভাগে আহার হয় নাই বলিয়া বসিলেন মাত্র, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না।

ভোজনান্তে রোগীর নিকটে পুনরপি গমন করিলেন। হাত টিপিয়া নাড়ী দেখিলেন, নাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে,—জ্বর আরও কম।

বিরাজমোহিনী বলিল,—"রায় মহাশয়, তুমি এত ঘন ঘন ঘরের মধ্যে আসিলে, মা বসিতে পারেন না। তুমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া শোও। প্রয়োজন হইলে আমরা ডাকিব।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র বহির্বাটীতে গমন করিলেন। একখানা তিনদিকে মাটীর দেওয়াল বেষ্টিত গৃহ। গৃহমধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবা সধূম আলোক দান করিতেছিল এবং বাতাসে পড়িয়া কাঁপিতেছিল। মধ্যস্থলে একটা মাদুর—মাদুরের উপরে একটা ময়লা বালিশ। পার্শ্বে আর একটা বিছানা, তদুপরি বাড়ীর কৃষাণ রতিকান্ত শয়ন করিয়া আছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিলেন, শূন্য শয্যা তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

রতিকান্ত পাশমোড়া দিয়া ফিরিয়া বলিল,—"আপনি কি তামাক খাবা ?"

ক্ষিতীশ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"এখানে কি হুঁকা আছে ?"

রতিকান্ত উঠিয়া পড়িল। দাবার কোণ হইতে একটা খেলো

হুঁকা টানিয়া আনিল, বলিল,—"অ... আমার মনিব এই হুঁকোতে মাঠে নিয়ে তামাক খান।"

তারপরে সে তাহার নিজের হ... মস্তক হইতে কলিকা নামাইয়া লইয়া তাহাতে তামাক সাজিল ...বার উপর মালসার মধ্যে ঘুঁটে পুড়িতেছিল,—রতিকান্ত তাহা হ... অগ্নি তুলিয়া লইয়া কলিকায় দিল এবং তৎপরে যথাস্থানে ...কা সংস্থাপন করিয়া প্রাণপণে হুঁকা টানিতে লাগিল। ডাক... র গতিশব্দের ন্যায় অনেকক্ষণ তাহার হুঁকার শব্দ অবিচ্ছিন্নভা... তগোচর হইল। তৎপরে অপর হুঁকার মস্তকে কলিকা স্থাপন ...। ক্ষিতীশের হস্তে প্রদান করিল। ক্ষিতীশ বসিয়া ধূমপান করি... তারপরে হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিলেন।

রতিকান্ত তখন গল্পারম্ভ ক... সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এখন কোন চাক্‌রী-টাক্‌রী কর... ?"

ক্ষি। না, চাকরী নাই, ত... ায় আছি।

রতি। আপনাগের চাক... থাক্‌লি তত সুবিধে থাকে না। সে দিন আমাগের মাঠাক্‌রুণ ... বল্‌ছিলেন।

ক্ষি। কি বল্‌ছিলেন?

রতি। ছোট মেয়েডার ...ত্তর নেই, তাই আপসোস্ কোরে বোল্‌ছিলেন, হাভাতের ছেলের ... মেয়েডা দিয়ে কান্‌তি কান্‌তি জান গেল।

ক্ষিতীশ সে কথার কো... ত্তর করিল না। রতিকান্ত তখন বুঝিল, কথাটা জামাইবাবুর ...প্রদ হয় নাই। সে তখন অন্য কথা তুলিল। বলিল,—"মেয়েডার ...র বড় বেয়াড়া হয়েছে! তা কালী ডাক্তার ওর কি কর্‌বে? আ... বোধ হয়, মেয়েডার উপরি দিষ্টি

হয়েছে। নইলে অত ভূতাসন্নি বক্‌বে কেন? মাদারে ফকির ওসব বিষয়ে ভারি ওস্তাদ;—ঘাটে নেমে আঘাটা থেকে এক নিশ্বেসে এক ঘড়া জল আন্‌তে হয়। তাই পোড়ে দেয়—এক দিনেই রোগী আরাম হোয়ে যায়।”

ক্ষিতীশচন্দ্র সে কথারও কোন উত্তর করিলেন না। রতিকান্ত ভাবিল, তবে জামাই বাবুর ঘুম আসিতেছে, অগত্যা সেও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল এবং অচিরাৎ নিদ্রাগত হইয়া নাসিকা গর্জ্জনে সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপখানি মুখরিত করিতে লাগিল।

ক্ষিতীশের নিদ্রা নাই। চিন্তাদগ্ধ প্রাণে অনেকক্ষণ শয্যায় পড়িয়া থাকিল। তৎপরে চণ্ডীমণ্ডপের দাবায় গিয়া উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণে থাকিয়া বাড়ীর মধ্যে কোন গোলযোগ হইতেছে কি না, শ্রবণ করিল। যখন বুঝিল, সেখানে সম্পূর্ণ নিরবতা বিরাজ করিতেছে, তখন একটা খুঁটিতে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া করুণ নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তখন সমস্ত গ্রামখানি সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত। সে দিন শুক্লপক্ষের রজনী,—নিদাঘ-কৌমুদী সর্ব্বত্র রজত সুষুপ্তি বিস্তার করিতেছে। প্রকৃতি সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও সুখোৎসব অবসান দিনের ন্যায় ক্ষিতীশের চক্ষে তাহা স্নিগ্ধ-বিষাদে সমাচ্ছন্ন বোধ হইতেছিল। ঘনতরু সমাচ্ছন্ন গৃহগুলি যেন তারকাসনাথ সুনীল আকাশের বিরাট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছে। সকলই শান্ত সমাহিত—কেবল ঝিল্লীরব অবিচ্ছেদে শব্দিত হইতেছিল। তাহার চক্ষে আজিকার এই জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী বড় অবসাদময়ী।

সহসা সে শুনিতে পাইল, সেজবউ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—

সম্মুখের দরোজা বন্ধ। তখন চীৎকার করিয়া শ্যালককে ডাকিল। অনেক ডাকাডাকির পরে তিনি সাড়া দিলেন।

বিপন্ন পথিকের ন্যায় অতি বিনীতস্বরে ক্ষিতীশ বলিলেন,—"তোমার ভগিনী বড় চেঁচাইতেছে,—সম্ভবতঃ ভুলই বলিতেছে। একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।"

তিনি তখন শয্যায়। বলিলেন,—'রোজ রাত্রিতেই অমনি চেঁচায়' মা ওখানে আছেন, ভয় নাই। তুমি শোওগে।"

কারারুদ্ধ বন্দীর লৌহ শিকের সম্মুখে স্নেহের শিশুপুত্র তাহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিলে, তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়,—ব্যাধ-বাণবিদ্ধা হরিণীর আসন্ন মৃত্যুকালে জালজড়িত দূরাবদ্ধ হরিণের প্রাণ যেমন হয়, ক্ষিতীশের প্রাণও তখন তদ্রূপ হইল। দরোজা খুলিয়া দিবার জন্য পুনরপি অনুরোধ করিলেন, "কিন্তু কোন প্রয়োজন নাই" এই হেতুবাদের উপর নির্ভর করিয়া সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না! অতি ক্ষুন্ন প্রাণে ক্ষিতীশচন্দ্র শয্যায় ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ রাত্রে ক্ষিতীশের একটু নিদ্রা আসিয়াছিল,—কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্য, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত বক্ষোমধ্যে অতিক্রুততরভাবে হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল। দেহ-মন নিতান্ত অবসন্ন।

তখনও বাড়ীর কেহ উঠে নাই। রাত্রি জাগরণের আমোদে সকলেই নিদ্রিত। রোগীও তখন একটু স্থির হইয়াছিল।

ক্ষিতীশ উঠিয়া রতিকান্তকে জাগাইল। সে উঠিয়া চক্ষু কচালিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি তামক খাবে গা?"

ক্ষি। না, আমি একটি কথা বলিব বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। গ্রামান্তরে যাইব,—ফিরিতে যদি বেলা হয়, হরিবাবুকে বলিও আমি দেবেন্দ্র ডাক্তারের নিকটে গিয়াছি।

র। আচ্ছা তা বলব। আহা, সোয়ামী না হ'লে কি কারু পরাণ কচ্‌কচ্‌ করে গা! তা যাও বাবু—দেবেন ডাক্তার ভারি ডাক্তার। সে মরা মানুষ বাঁচায় গো!

রাত্রে যদি অত্যন্ত বাতাসে শীত করে, এই জন্য শয়ন করিবার সময় চাদরখানি লইয়া আসিয়াছিলেন,—জুতা জামা ও ছাতা বাটীর মধ্যেই ছিল, সুতরাং তাহা লইবার জন্য বাড়ীর লোকদিগকে ডাকিয়া বিরক্তি-ভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র চাদরখানি স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদেই বাহির হইলেন। রঘুনাথপুর হইতে দেবেন্দ্র ডাক্তারের বাড়ী প্রায় দুই ক্রোশ হইবে,—বেলা করিয়া গেলে যদি তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়।

তখন কেবল মাত্র ঊষালোক প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রামের বাহির হইয়া কুমারী নদীর তীরে তীরে পথ—সেই পথ ধরিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র গমন করিতে লাগিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস—নদীতে সামান্য জল—আর দুই পার্শ্বে বিস্তৃত বালির চর। মধ্যে একগাছি রজত সূত্রের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী-কুমারী বহিয়া গিয়াছে। অপরপার হইতে শিশির-শীকর-সিক্ত ঊষানিল নৈশফুল্ল বনকুসুমের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। ক্ষিতীশের হৃদয় বিষাদ কম্পিত। সে যেন জগতের নিকট বিশাল অপরাধে অপরাধী!

যখন জগতে রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল, তখন ক্ষিতীশ দেবেন্দ্র ডাক্তারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারখানায় গিয়া শুনিল; ডাক্তার বাবু তখনও বাটীর মধ্যে আছেন, শীঘ্রই আসিবেন। ক্ষিতীশ তখন বাহিরের একখানা বেঞ্চির উপরে বসিয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কেহ রুগ্ন পুত্র ক্রোড়ে করিয়া, কেহ বালিকা কন্যার গায়ে তাহার মাতার অলঙ্কার পরাইয়া লইয়া, কেহ শুধু একটা শিশি হাতে করিয়া, কেহ নিজের রোগজীর্ণ দেহভার যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া জুটিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। তিনি আসিবামাত্র ভৃত্য তামাকু সাজিয়া আনিয়া হুঁকা প্রদান করিল। চারিদণ্ড ধরিয়া হুঁকা টানিয়া টানিয়া শেষে পরিচিত রোগিগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগ পরীক্ষা করিলেন,—ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বিদায় দিলেন। তারপরে নবাগত রোগীদিগের রোগ শুনিয়া হাত টিপিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তাহারাও চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবু উঠিয়া যাইতেছিলেন, ক্ষিতীশ উঠিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অতি বিনীতস্বরে বলি-

লেন,—"আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। বড় বিপদে পড়িয়াই আসিয়াছি। আপনি দয়া না করিলে আমার উপায় নাই।"

ডা। কি বলুন?

ক্ষি। আমি বাড়ী হইতে প্রায় দুইমাস বাহির হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে রঘুনাথপুর শ্বশুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রীর ভারি ব্যায়রাম।

ডা। কি ব্যায়রাম?

ক্ষি। জ্বর—সম্ভবতঃ জ্বর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার প্রায় ছাড়িয়া যায়। কিন্তু মাথায় রক্ত আছে—ভুল বকে। অন্যান্য আরও উপসর্গ আছে।

ডা। কেহ চিকিৎসা করিতেছে?

ক্ষি। সে কুচিকিৎসার চেয়ে অচিকিৎসা ভাল। কালী পরামাণিক চিকিৎসা করিতেছে।

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তারপর"?

ক্ষি। এখন সম্পূর্ণ দয়ার ভিখারী হইয়া, আপনার দুয়ারে আসিয়াছি।

ডা। আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ক্ষি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রিক্তহস্তে শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছি, আমি দরিদ্র, স্ত্রীর গায়ে কোন অলঙ্কার নাই যে তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিব,—স্ত্রীর চিকিৎসা না হইলেও সে বাঁচিবে না। অতএব আপনি দীনের প্রতি দয়া করুন। রঘুনাথপুর আপনাকে যাইতে হইবে,—কেবল একদিন নহে, যে কয়দিন রোগ না সারে—আর ঔষধও দিতে হইবে। আমি আগামী কল্য টাকার যোগাড় দেখিব—কিন্তু কোথায় পাইব,—তাহারও স্থিরতা নাই। দরিদ্রের নিকট যাহা গ্রহণ

করেন, তাহা আমি নিশ্চয় দিব—তবে গুছাইয়া লইতে হইবে। দরিদ্রের জীবন ও শান্তিদানে ভগবান্ আপনার মঙ্গল-বিধান করিবেন।

ডাক্তারবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"রঘুনাথপুরে আপনার শ্বশুর কে ?"

ক্ষিতীশচন্দ্র করুণ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার শ্বশুর জীবিত নাই, শ্যালকের নাম হরিচরণ ঘোষ।"

ডাক্তার। কেন, তাঁহার ত অবস্থা মন্দ নয়। তাঁহার ভগিনীর ব্যায়রাম—তাঁহার বাড়ীতেই ব্যায়রাম ;—ডাক্তারের খরচ তিনি কেন দিবেন না ?"

ক্ষি। ডাক্তার বাবু, আমার যদি অবস্থা ভাল হইত—আমার যদি টাকা থাকিত, তবে আমার স্ত্রীর ব্যায়রামে আমার শ্যালক অর্থব্যয় করিতেন। যাহার নাই, তাহার জন্য কেহই মুষ্টিদানে স্বীকৃত হয় না।

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, ইহা বিষাদোদ্বেলিত দুঃখসিন্ধুর তীব্র উচ্ছ্বাস। বলিলেন,—"আমি যাইব। ঔষধও দিব,—আপনি ক্রমে ক্রমে আমার টাকা দিবেন।"

যে জল ক্ষিতীশের চক্ষুতে গড়াইতেছিল, তাহা ধারাকারে প্রবাহিত হইল। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"আপনার জয় হউক। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

ডা। আমি আপনার খরচ বাঁচাইবার জন্য সাইকেলে যাইব, কিন্তু ঔষধের বাক্স কে লইয়া যাইবে?

ক্ষি। আমি লইয়া যাইব।

দন্তে জিহ্বা কাটিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আপনি ভদ্রলোক।"

ক্ষি। ডাক্তার বাবু, যাহার টাকা নাই, সে আকার ভদ্রলোক কিসের? না লইয়া গেলে আমার স্ত্রীটি মারা যাইবে।

ডা। এক কাজ করুন,—আ'জ একটা লোকে লইয়া চলুক, তাহাকে চারি আনা পয়সা দিবেন। কা'ল হইতে আপনি শিশি লইয়া আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইবেন।

ক্ষিতীশের নিকটে মোট আট আনা পয়সা ছিল। তিনি ডাক্তার বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তবে আপনি যান, আমি গাড়ীতে যাইব, একটু পরে আসিতেছি। লোকটাকে আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান।"

ঔষধবাহককে সঙ্গে লইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র একটু উৎসাহিত চিত্তে গমন করিলেন।

যাইবার সময় বাজার হইতে চৌদ্দ পয়সা দিয়া একটা বেদানা ক্রয় করিয়া লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্র ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন,—"কোন ভয় নাই। চিকিৎসা হইলে রোগ এত বাড়িত না। কালীর চিকিৎসাগুণেই রোগী এত কষ্ট পাইয়াছে।"

তিনি ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। তনুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার চলিয়া গেলে, বলিলেন,—"আহা, ক্ষিতীশের পয়সা নাই, তবু প্রাণের টানে ডাক্তার আনিয়াছে। হাজার হোক স্বামী!"

ক্ষিতীশের শ্বাশুড়ীর নিকট সে কথা অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল। তিনি মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"কি করিব ঠাকুরঝি, আমার যেমন ক্ষমতা তেম্নি ডাক্তার দেখিয়েছি,—এখন উঁহার বস্তু, উঁনি দেখান।"

ত। আহা, যেমন করিয়াই পারুক, তা দেখাবে বৈ কি। একটি বেদানাও কিনিয়া আনিয়াছে।

শ্বা। দিবারইত সম্পর্ক,—মা-ভাইতে আর কার কুলায় বল? তবে যেমন অদৃষ্ট করিয়াছিলাম,—তেমনি জামাই পাইয়াছি।

ত। জামাই আর মন্দ কি বউ! তবে স্বচ্ছল অবস্থা সকলের সকল সময় থাকে না।

এই সময় বাহিরের প্রাঙ্গণ হইতে ক্ষিতীশ ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, ঠাকুরঝি কোথায়? আমার জামা, জুতা ও ছাতাটা কোথায় আছে, নেব।"

ত। কেন গো, এখন তাহা কি হবে?

ক্ষি। একটু গ্রামান্তরে যাইব।

ত। এত বেলায়? খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইও।

ক্ষি। না,—আবার বৈকালে ফিরিতে হইবে। সে প্রায় তিন ক্রোশ পথ।

শাশুড়ীঠাকুরাণী বলিলেন,—"যদি নিতান্ত প্রয়োজন থাকে, তবে ঘুরিয়া আসুন। ঐ মাঝের ঘরে বিরাজ আছে।"

ক্ষিতীশচন্দ্র 'মাঝের ঘরে' গমন করিলেন এবং সেই ঘরেই তাঁহার দ্রব্যগুলি ছিল, বিরাজ তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"এখন ওসব কেন ?"

ক্ষি। আমি নন্দন গ্রামে যাইব।

বি। এত বেলায় যাবে কেন ? আহারাদি করিয়া যাইও।

ক্ষি। যাহার অর্থ নাই ঠাকুরঝি—তাহার খাওয়া দাওয়ার কি সময় অসময় আছে ? সেইখানে গিয়াই সে কাজ সারিব।

বি। এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবে কেন ?

ক্ষি। ডাক্তারকে এক পয়সাও দেই নাই। তাহাকে কিছু না দিলে চলিবে না। তাই সেখানে টাকার জন্য যাইতেছি।

বি। সেখানে কে আছে ?

ক্ষি। আমার একটি বন্ধু আছেন,—তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। আমার এই বিপদের কথা শুনিলে কিছু ঋণ দিতে পারেন।

বি। আজই আসিবে ত ?

ক্ষি। হাঁ, নাগাইদ্ সন্ধ্যা নিশ্চয়ই ফিরিব। ঔষধটা যাহাতে নিয়মিতভাবে খাওয়ান হয়, তাহা করিও।

বিরাজমোহিনী সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিল। ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার অর্দ্ধ ময়লা জামাটি গায়ে দিয়া বাটীর বাহির হইল।

জ্যৈষ্ঠের দারুণ রৌদ্র ভেদ করিয়া তত বেলায় ক্ষিতীশচন্দ্র তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, বন্ধু তখন আহারাদি করিয়া, গৃহের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষিতীশের আগমনবার্ত্তা পাইয়া তখনই উঠিয়া আসিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।”

ক্ষিতীশ পরিশ্রমক্লান্ত শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—“আমার বড় বিপদ। স্ত্রীর অত্যন্ত ব্যায়রাম।”

বন্ধু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি ব্যায়রাম ?”

ক্ষি। জ্বর বিকার।

ব। কে দেখিতেছে ?

ক্ষি। দেবেন্দ্র ডাক্তার।

ব। সুচিকিৎসক বটে। যাইহোক,—এখন স্নান কর, আহার কর,—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানাহার করিলেন। তৎপরে তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে লইয়া তাপহীন নিভৃত গৃহে গমন করিলেন এবং বিস্তৃত শয্যার উপরে শয়ন করিয়া বলিলেন,—“এখন একটু ঘুমাও।”

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—“শোন ভাই, যাহার হাতে একটি পয়সা নাই, হে আশ্রয়হীন, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত, তদুপরি যাহার স্ত্রী জ্বর-বিকার-রুগ্ন, তাহার কি সুখনিদ্রার সম্ভব আছে ? বড় অভাবে পড়িয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি।”

ব। কাজটা ভাল হয় নাই,—তাহাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা যে, তোমার বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই,—সে কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন স্ত্রীর রোগ আরোগ্য হইলে লইয়া বাড়ী যাইও।

ক্ষি। সে ত পরের কথা,—আপাততঃ আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার না দিলে আমি মারা পড়ি।

ব। কোন আপত্তিই ছিল না,—তবে বর্ত্তমানে আমার হাতে একটি পয়সাও নাই। যাহা ছিল, এই সকালবেলা একজনকে ধার দিয়াছি।

ক্ষি। দোহাই তোমার,—এ বিপদে রক্ষা কর। আমি হ্যাণ্ড-নোট লিখিয়া দিতেছি। তুমি জান, আমার অংশের বাড়ী ঘর আছে, জমি জমাও আছে—বিক্রয় করিলে সুদসহ পঞ্চাশ টাকা আদায় হইতে পারিবে, তাহা নিশ্চয়। অন্যমন করিও না—আমি বড় বিপদে পড়িয়া বড় আশা করিয়াই তোমার নিকটে আসিয়াছি!

ব। আমার কাছে ত টাকা নাই-ই। তবে যদি দিদির তহবিলে বিশ পঁচিশ টাকা থাকে!

ক্ষি। যে তহবিলেই থাকে, আমায় দাও। কিন্তু বিশ পঁচিশ টাকাতে কিছুই হইবে না। অন্ততঃ চল্লিশটা করিয়া দাও।

ব। এখন ঘুমাও—পরে দেখিব তখন।

ক্ষি। আমার ঘুম হইবে না,—তুমিও আমার জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার কর, আ'জ আর ঘুমাইও না। বাড়ীর মধ্যে যাও,—ঠিক করিয়া আইস।

ব। যতদূর হয়, একপ্রকার হইবেই এখন,—এ রৌদ্রে কিছু যাইতে পারিবে না। একটু পরেই দেখা যাইবে। এখন ঘুমাও।

এই কথা বলিয়া ক্ষিতীশের বন্ধুপ্রবর একটা 'পাশের বালিস' কোলের দিকে টানিয়া লইয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন, এবং অচিরাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষিতীশের নিদ্রা নাই,—সে চিন্তার দারুণ দাহজ্বালায় শয্যার উপরে

পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ক্রমে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। ক্ষিতীশের নিকট বোধ হইতে লাগিল যেন, সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই,—কিন্তু বন্ধুর বিরক্তি জন্য ডাকিতেও সাহস করিতেছিল না। যদি সে বিপদে পড়িয়া টাকার জন্য না আসিত, তবে এতক্ষণ ডাকিয়া তুলিতে পারিত,—এমন কতদিন ঘুমাইতেও দেয় নাই, কিন্তু আজি তাহার সে সাহস নাই। ক্রমে জ্যৈষ্ঠের প্রবল রৌদ্রতাপ কমিয়া আসিল,—ক্ষিতীশের বন্ধুর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ঘুমাও নি?"

ক্ষি। পোড়া চক্ষে ঘুম আইসে নাই।

ব। (হাসিয়া) খুব বউ-পাগ্‌লা—যাই হোক্‌। 'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে, অভাগার ঘোড়া মরে'—তা এত চিন্তাই বা কি? যদিই মরে, আবার বিবাহ করিও,—বিবাহের বাজার আ'জ কা'ল বড় সস্তা!

ক্ষি। আমার মত দরিদ্রের স্ত্রী না থাকাই মঙ্গল,—কিন্তু একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইবে, ইহা হইতে কষ্টের কথা আর কি আছে?

ব। যাহারা টাকা খরচ করিয়া দেবেন ডাক্তারকে দেখাইতে পারে না,—তারা বুঝি সবাই মরিয়া যায়? আর দেবেন ডাক্তারকে দেখাইতে টাকাই বা অত লাগিবে কেন? তারত দুই টাকা করিয়া ভিজিট।

ক্ষি। রোগ শক্ত,—ক'দিন আসিতে হইবে, কে জানে! তা ছাড়া ঔষধের দাম আছে,—পথ্য আছে।

ব। পথ্যও কি তোমাকেই কিনিতে হইবে। কেন, তার ভাইয়ের বাটীতে আছে, সে দেবে না?

ক্ষি। নাও দিতে পারে,—দরিদ্রের স্ত্রীর জন্য কে অত করিতে যায়?

ব। তবে সেখানে রাখ কেন? রাগ করিও না, তুমি বড় স্ত্রীর বাধ্য। সে যা বলে, তাই কর,—ইহাতে কষ্ট না পাইবে কেন? আজ যদি বাড়ীতে থাকিতে, তবে কি এতটা কষ্ট— অভাব সহ্য করিতে হইত?

ক্ষি। বর্ত্তমান বাড়ীর অবস্থা আরও শোচনীয়।

"তবুও সেটা নিজের বাড়ী!"—এই কথা বলিয়া বন্ধু উঠিয়া গেলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র সেই স্থানে বসিয়া আকাশ-পাতাল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে ক্ষিতীশের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল,—পাছে তিনি বলেন,—'টাকার সন্ধান হইল না'। কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। হাণ্ডনোট লিখিয়া দিবার কথা শুনিয়া তাঁহার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল। তবে বিষয় এবং আসল টাকা ও তাহার তিন বৎসরের সুদের সামঞ্জস্য করিয়া, তিনগুণ হিসাব মনে মনে খতাইয়া দেখিয়া—ত্রিশ টাকা হাতে করিয়া লইয়া আসিলেন।

শয্যায় উপবেশন করিয়া অতি গম্ভীর বদনে বলিলেন,—"নিজের হাতে টাকা না থাকিলে এমন বিপদেও পড়িতে হয়! দিদির কাছে অনেক বলিয়া কহিয়া এই ত্রিশটি টাকা আনিয়াছি। সে কেবল তোমার জন্য—নতুবা আমি ওসব মেয়েলী ফেসাদের মধ্যে যাই না। সুদ প্রতি টাকায় দুই পয়সার হিসাবে।"

ক্ষি। তাই।

ব। একখানা হাণ্ডনোট লেখ।

কাগজ কলম কালী সেই স্থানেই ছিল। ক্ষিতীশচন্দ্র হ্যাণ্ডনোট লিখিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদির নামে লিখিব না কি ?"

ব। না,—আমার নামেই লেখ। মেয়ে মানুষের নামে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ক্ষিতীশের বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, অধিক মাত্রায় সুদ আর দলীলখানি লেখাইয়া লইবার জন্যই বন্ধুবরের দিদির নাম প্রকাশ করা। যাহা হউক, তিনি টাকা পাইলেন, ইহাই যথেষ্ট ! তখন দলীল লিখিয়া দিয়া টাকা ত্রিশটি গণিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব। কি রকম—এখনই না কি ?

ক্ষি। হ্যাঁ,—সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছান চাই।

ব। তোমার স্ত্রী কেমন থাকেন, সংবাদ দিও।

"দিব"— এই কথা বলিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

নন্দন গ্রাম হইতে রঘুনাথপুর যাইতে হইলে মধ্যপথে দেবেন্দ্র ডাক্তারের বাড়ী,—একটু বামপার্শ্বে আধক্রোশখানেক রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হয়। ক্ষিতীশচন্দ্র সেই পথ ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বাবু তখন আরাম চৌকিতে বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। সেখানে অন্য কেহ ছিল না। ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—"আসুন, খবর কি ?"

ক্ষিতীশ পার্শ্বে স্থাপিত একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"রোগীর খবর অধিক কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেখান হইতে আসিয়াছি।"

ডা। কোথায় গিয়াছিলেন ?

ক্ষি। আপনাকে সকালে বলিয়াছিলাম, চেষ্টা করিয়া আপনাকে কিছু দিতে পারিব,—সেই চেষ্টাতেই গিয়াছিলাম।

এই বলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর সম্মুখস্থ টেবিলে রক্ষা করিলেন।

দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"দশ টাকা কিসের জন্য? আমার ভিজিট দুইটাকা, আর ঔষধের দাম আন্দাজ একটাকা।"

ক্ষি। আমার অবস্থা অতি শোচনীয়—নিত্য দিতে পারিব কি না, সন্দেহ; যাহা সংগ্রহ হইল, আপনার কাছে দাখিল করিলাম। আপনি রোগীকে আরোগ্য করুন,—কবে আবার দিতে পারিব, জানি না। তবে ফাঁকি দিব না—সংগ্রহ হইলেই দিব।

ডা। আপনি দুইটি টাকা আমাকে দিয়া বাকি লইয়া যান,—প্রয়োজনমত দিবেন।

ক্ষি। আপনার নিকট গচ্ছিত থাক,—নতুবা আমার অনেক অসুবিধা আছে।

ডাক্তার বাক্সের মধ্যে টাকা রাখিয়া বলিলেন,—"বাজার হইতে গোটা কয়েক বেদানা লইয়া যাইবেন, আর দুগ্ধ সেবন করিতে দিবেন,—রোগীকে না খাইতে দিয়া, বড়ই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ক্ষিতীশ বিদায় হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্র ডাক্তার সবিশেষ যত্ন সহকারে ক্ষিতীশের স্ত্রীর চিকিৎসা করিলেন। পনর ষোল দিন যথারীতি ঔষধাদি সেবন করিয়া সেজবউ নিরাময় হইলেন। কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল,—ডাক্তার বলিয়াছিলেন, এখন কিছুদিন বলকারক ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঔষধ দেবেন্দ্র ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে ক্ষিতীশ লইয়া আসিতেন,—পুরাতন মিহি চাউল, 'জীবিত মৎস্য' বা অন্যান্য পথ্য যাহা পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থের সংসারে সচরাচর থাকে না, তাহাই ক্ষিতীশ ক্রয় করিয়া আনিতেন। এইরূপে আরও একমাস কাটিয়া গেল,—সেজবউ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সেবার আষাঢ় মাসের শেষে রথযাত্রা,—গ্রামের অনেকে ৺জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন করিবে, ক্ষিতীশের শাশুড়ীও যাইবেন। বিরাজমোহিনী মাতার তীর্থগমন জন্য দশটাকা প্রদান করিল।

সন্ধ্যার পর স্বামীকে নিকটে ডাকিয়া সেজবউ বলিল,—"মা কাল সকালে ঠাকুরবাড়ী যাবেন, দিদি দশটাকা দিয়াছে, তুমি কি দিবে?"

তখন ক্ষিতীশের ধার করা টাকা নিঃশেষিত হইয়া এক টাকা বার আনা তহবিলে মজুদ দাঁড়াইয়াছিল। ঢোক্ গিলিয়া বিশুষ্কমুখে ক্ষিতীশ বলিলেন,—"তাইত, আমার ত হাতে এখন কিছুই নাই।"

মুখ ঘুরাইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া সেজবউ বলিলেন,—"নাই বলিলে চলিবে কেন? আমার মা'ত,—জ'ন্মে ত সবই কর্‌লাম! যা হোক্, এ সময়ে কিছু দিতেই হইবে।"

ক্ষি। দেওয়া উচিত, তাহা আমি জানি। না দিতে পারিলে. লজ্জা. তাহাও জানি। কিন্তু উপায় যে নাই,—যাহা ঋণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই তোমার অসুখে ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

সে। ও আমার পোড়াকপাল! তুমি বুঝি তাই গেরো বাঁধিয়া বসিয়া আছ! তা' এমন কি কেহ করে না;—তা' যদি এত কষ্ট হয় তবে খরচ না করিলেই পারিতে,—দাদার আমার যেমন জুটিল্ল তেমনই না হয় চিকিৎসা করাইতেন। পরমায়ু থাক্‌লে তাতেই বাঁচ্‌তাম। আর আমার মত হতভাগীর বাচাই বা কেন? যার পরণে কাপড় নাই, গায়ে একখানা অলঙ্কার নাই,—যে মায়ের তীর্থ-ধর্ম্ম করিতে একটি পয়সাও দিতে পারে না,—তাহার মরাই মঙ্গল। যদি মাকে কিছু না দাও,—আমি আফিং খাব। এমন লজ্জা অপমান আমার কখনই সহ্য হবে না।

ক্ষি। যাহা নাই, তাহা কোথায় পাইব বল? আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও পূরা দুইটি টাকা বাহির হইবার উপায় নাই,—এক টাকা বার আনা আছে।

সে। চাই না তোমার টাকা,—আমার মা কি ফকির, না বৈষ্ণব যে, এক টাকা বার আনা ভিক্ষে দেবে? তোমার টাকা না পাইলে মার ঠাকুরবাড়ী যাওয়া বন্ধ হবে না।

ক্ষি। আমি দীনহীন,—আমার সাহায্যে তাঁহার কি হইবে?

সে। কিছু হইবে না,—তবু তোমার আক্কেলত দশে ধর্ম্মে বুঝিতে পারিবে!

ক্ষি। যাহার টাকা নাই, বুঝি তাহার মনুষ্যত্বও নাই।

সে। একটি টাকা কি ব'লে দেবো?

ক্ষি। নাই যে,—যদি উহা খরচ হইয়া যাইত, কিছুই দিতে পারিতাম না।

সে। এক টাকা দেওয়াও যা, কিছু না দেওয়া তা।

ক্ষি। সে কথা সত্য,—তবে কখনও যদি সময় হয়, তখন এ দুঃখ দূর করিও।

সে। আমার পোড়া অদৃষ্টে সময় আর হইবে না! মরণই আমার মঙ্গল।

এই সময় ক্ষিতীশের শ্যালক হরিচরণ পাড়া হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার মাতা ও তনুর মা দাওয়ায় বসিয়াছিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্ষিতীশ কোথায়?"

মাতা উত্তর করিলেন,—"ঘরের মধ্যে আবার কোথায়?"

হরিচরণ দাওয়ায় উঠিয়া বসিলেন এবং ক্ষিতীশকে বাহিরে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ক্ষিতীশ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিচরণ বলিলেন,—"ব'স, কাজ আছে।"

ক্ষিতীশ একপার্শ্বে উপবেশন করিল। হরিচরণ বলিলেন,—"এখন তুমি কি করিবে স্থির করিতেছ?"

ক্ষিতীশ কথা না কহিতে তনুর মা বলিলেন,—"কি আবার করিবে, শিবু আরাম হ'ল, এখন তাহাকে লইয়া বাড়ীর ছেলে বাড়ী যান।"

হরিচরণের মাতা বলিলেন,—"বাড়ীতেও মহাসুখ, ছুঁড়ীর হাড়ে কালী দিয়া ছাড়িয়াছে। উনিও ত পেটে দুটো ভাত পান না।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আমি যাহা স্থির করিতেছি, ক্ষিতীশও শুনুন,—তোমরাও শোন, যদি সকলের মত হয়, তবে ক্ষিতীশ তাহাই করুন।"

সর্ব্বাগ্রে ক্ষিতীশই বলিলেন,—"কি বল?"

হ। ওপাড়ার রামদা একটা আড়ত করিবেন,—তার দু'জন লোকের দরকার; আমি ক্ষিতীশের কথা বলিলে তিনি স্বীকৃত হইলেন,—কিন্তু আপাততঃ মাসিক বেতন ছয় টাকা। কিছু দিন পরে দশ টাকা পর্য্যন্ত হবে।

ত—মা। ছয় টাকায় দু'জনের খোরাকী চলিবে, না আর কিছু হবে? সে মনে আমার নিকট ভাল বোধ হয় না।

হ। খোরাকী কি উহার মধ্যে হয়? খাওয়াটা আমার মধ্যেই চলিবে। আমি একা সমস্ত কাজ কর্ম্ম দেখিতে পারি না। একটু মাঠটা দেখ্‌বেন,—আমার এখানেই খাওয়া দাওয়া চলিবে।

ত—মা। সেখানে কাজ করিবে, না তোমার কাজ দেখিবে?

হ। একটু সুবিধা আছে। রামপুরের বাজারে আড়ত হইবে কি না,—ক্ষিতীশ দশটার সময় খাইয়া যাইবে।

ত—মা। আসিবে কখন?

হ। সন্ধ্যার পর।

ত—মা। তা হ'লে সকালে তোমার কাজ-কর্ম্ম দেখবে?

হ। হাঁ।

ত—মা। আমার নিকট তাহা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্বশুর-বাড়ী থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া খাওয়া মোটেই ভাল নহে। উহাতে অনেক কথা জন্মে।

হ—মা। কিন্তু খান কোথায়?

হ। দেখুন, উনিও বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমার যতটুকু সাধ্য, আমি তাহা চেষ্টা করিলাম।

হ—মা। মা দুর্গার আশীর্ব্বাদে তুমি আমার বেঁচে থাক,—তুমি

নহিলে হতভাগিনীর আমার আর উপায় কি? এমন অদৃষ্টও আমি করিয়াছিলাম যে, মেয়েটার কপালে একবিন্দুও সুখ হইল না!

ক্ষি। হাঁ, ঐ কাজই আমি করিব। কবে যাইতে হইবে?

হ। আর তিন দিন পরে।

ক্ষি। তবে তাহাই হইবে।

তারপরে রাধাচরণের কথা বলিব। রাধাচরণ হরিচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—সে বাইশ বৎসর বয়সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে,—তাহার মত ছেলে আর হয় না। সকলেই বলে সে হাকিম হইবে,—হাকিম হইলে তাহার একজন বাজার সরকারের প্রয়োজন; অতএব ক্ষিতীশের শ্বাশুড়ী ভরসা করেন, তখন ক্ষিতীশই সেই কাজ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিবে,—এখন ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়া রাধুকে বাঁচাইয়া রাখিলে হয়।

তারপর ঠাকুর বাড়ী যাইবার বন্দোবস্ত বিষয়ের কথা উঠিল। সে কথার মর্ম্ম ঃ—মাতার যে সেখানে যাইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না; ঘোষাল পাড়ার পাঁচজন যাইতেছে বলিয়াই যাওয়া — না যাইলে লোকে নিন্দা করিবে! নতুবা তাঁহার মত রত্নগর্ভার আবার জগন্নাথ দর্শন কি? দুইটী পুত্র, সাক্ষাৎ জগন্নাথ বলরাম।

গল্পের যখন জমাট উত্তমরূপ বাধিয়া উঠিল, তখন হরিচরণের গুড়ুকের প্রয়োজন হইল। বলিলেন,—"র'তে এখনো আসে নি, হুঁকাটা কি বাহিরে আছে?"

হরিচরণ কর্ম্মসংস্থান ও অন্নদানে স্বীকৃত হইয়া ক্ষিতীশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার একটু তামাকু সাজিয়া না খাওয়ান ক্ষিতীশের পক্ষে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বিবেচনায় "আমিই দেখিতেছি" বলিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র হুঁকার অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা আটটার সময় মজঃফরপুর ষ্টেসনে গাড়ী উপস্থিত হইল পাঁচকড়ি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং টিকিট-বাবুর হাতে টিকিটখানি প্রদান করিয়া ষ্টেসনের বাহিরে গেল।

বঙ্গ পল্লীতে চিরপালিত বিদেশগমনে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পাঁচকড়ি ষ্টেসনের বাহিরে গিয়া বিষম বিভ্রাটে পড়িল। যে দিকে চাহে, সেই দিকেই পশ্চিমদেশীয় লোক,—তাহার আবাল্যের পরিচিত মানুষের মত একটি মানুষও সে দেখিতে পাইল না! মাথায় বড় বড় পাগড়ী বাঁধিয়া, নাগোরা জুতা পায়ে দিয়া পাদবিক্ষেপে ভদ্রলোকেরা গমনাগমন করিতেছে। কুলী মজুরেরাও তাহার দৃষ্ট মানুষের মত নহে। সে অনেক খানি পথ আপন মনে চলিয়া গেল,—কিন্তু কোথায় যাইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না! একজন সেই দেশীয় ভদ্রলোক দেখিয়া বাঙ্গালাতে জিজ্ঞাসা করিল,—"ডাক্তার বাবুর বাসা কোথায়?"

ডাক্তার বাবু মজঃফরপুরে অনেক। সে ভদ্রলোক ঠিক করিতে না পারিয়া, ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ ডাক্তার বাবুর বাসা খুঁজিতেছ? ডাক্তার বাবু এখানে অনেক আছে।"

পাঁচকড়ি তাহার অগ্রজের নাম করিল। সে চিনিতে পারিল না। বলিল,—"ঐ সম্মুখে ডাকঘর। ডাকঘরে দুইজন বাঙ্গালি বাবু আছেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, সব খবর জানিতে পারিবে।"

পাঁচকড়ি তখন ডাকঘর অভিমুখে গমন করিল।

ডাকঘরের বারেন্দায় গিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে,—ভিতর

হইতে একজন বাঙ্গালীবাবু তাহা দেখিয়া ত্বরিতপদে বাহিরে আসিলেন, এবং অতি ভদ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি দেখিতেছি আমাদের দেশের লোক, এবং আপনি যে এখানে নূতন আসিয়াছেন, তাহাও বুঝিতেছি,—আপনি কোথায় যাইবেন ?”

বাঙ্গালা কথা শুনিয়া এবং আবাল্য পরিচিত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া পাঁচকড়ি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল,—“আপনার অনুমান সত্য ;—বঙ্গদেশ হইতে আমি সবে মাত্র এই গাড়ীতে এখানে আসিয়াছি। আমার দাদা এখানে ডাক্তারী করেন, তাঁহার বাসায় যাইব। কিন্তু কোথায় তাঁহার বাসা আমি তাহা জানি না।”

বা। আপনার অগ্রজের নাম কি ?

পাঁ। দানীশচন্দ্র রায়, তিনি সরকারী ডাক্তার।

বা। ও, বুঝিয়াছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, পিয়ন চিঠি লইয়া বাহির হইতেছে, ডাক্তারখানার চিঠিও থাকিতে পারে, আপনাকে সেখানে পঁহুছাইয়া দিয়া যাইবে।

পাঁ। আর কতদূর ?

বা। অধিকদূর নহে,—সহরের মধ্যস্থলে।

এই সময় পিয়নেরা চিঠি লইয়া বাহির হইল। বাঙ্গালী বাবুটি একজন পিয়নকে ডাকিয়া বলিলেন,—“এই বাবুটিকে সরকারী ডাক্তারখানা দেখাইয়া দিও। ইনি ডাক্তারবাবুর ভাই। পথশ্রান্ত হইয়াছেন, আগে ইহাকে ডাক্তারখানা দেখাইয়া দিয়া তুমি অন্যত্র যাইও।

পিয়ন পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

সহরের মধ্যস্থলে সরকারী ডাক্তারখানার অট্টালিকা উন্নত শীর্ষ উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। অট্টালিকার সম্মুখে প্রকাণ্ড গেট। গেটের মধ্যে অনাবৃত স্থলে তখন রোগীর শয্যা, রোগীর খট্টা রৌদ্রে

দেওয়া হইয়াছে,—নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যগণ চারিদিকে কার্য্য করিয়া ফিরিতেছে। পাঁচকড়ি নিত্য নির্ভীক্,—সে প্রায় কোন বিষয়েই বিচলিত হইত না। পিয়নের সঙ্গে পরিচিতের ন্যায় সেখানে প্রবিষ্ট হইল।

যেখানে ডাক্তার বাবু বসিতেন, পিয়ন তাহা জানিত,—পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া সে তথায় গেল। দানীশচন্দ্র তখন টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি পাঠ করিতেছিলেন। পিয়ন সেলাম করিয়া বলিল, —"হুজুর, এই বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

দানীশ মস্তকোত্তলন করিলে, পাঁচকড়িকে সম্মুখে দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে উদ্বেলিত হইল। শুষ্ক হৃদয়ে স্নেহের বন্যা প্রবাহিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল —"কিরে তুই কোথা থেকে? বাড়ীর সব ভাল ত?"

পাঁচকড়ি পার্শ্বের দেওয়ালে ছাতাটি হেলান দিয়া রাখিয়া বলিল,—"সকলে জীবিত আছে বটে!"

"যা এখন বাসায় যা" সেখানে সব কথা শুনিব, "পথে বিশেষ কষ্ট হয় নাই ত,"—এই কথা বলিয়াই তিনি একটি ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে, পাঁচকড়িকে বাসায় রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, "বাসায় সকলকে বলিয়া আসিস, এই বাবু আমার ভাই। সকাল সকাল স্নানাদির যোগাড় করিয়া দেয়।"

পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এখন যাবেন না?"

দা। আরও দুই ঘণ্টা পরে আমি যাইব। তুই বাসায় গিয়া স্নান করিয়া জলটল খেগে।

পাঁ। আমি এখানে এক বিপদে পড়িয়াছি, কাহারও কথা ভাল বুঝিতে পারি না। আপনার বাসায় যারা আছে, তারা কি সবাই এ দেশের লোক?

দা। (হাসিয়া) পাচক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী।

"যাক্ বাঁচা গেল"—এই কথা বলিয়া দেওয়ালগাত্র হইতে ছাতাটি লইয়া পাঁচকড়ি ভৃত্যের সঙ্গে বাসায় চলিয়া গেল।

যথাসময়ে দানীশ বাসায় আসিয়া আহারাদি অন্তে পাঁচকড়ির নিকট বাটীর সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। তাঁহার প্রাণে অনুতাপের একটা তপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, আমি মাসে মাসে যতটা টাকা উপার্জ্জন করিয়া অপব্যয় করিতেছি,—উপরন্তু মাসে মাসে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছি; কিন্তু আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতাগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে!'

এ অনুতাপ দানীশের এই প্রথম নহে। কিন্তু হৃদয়-বল না থাকিলে মানুষ কেবল অনুতাপে পাপের আগুণ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না! প্রকাণ্ড গৃহদাহে দুই বিন্দু জলের মত, সেই অনুতাপ পাপ-বহ্নি-শিখাকে আরও যেন প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। সে অনুতাপ বিষকুম্ভে কয়েকবিন্দু ক্ষীর মাত্র। পাপকার্য্যে মত্ত হইয়া মানুষ যখন বড় অবসাদে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার চিত্তে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে;—অনুতাপ বিবেকের পুণ্য-প্রতিধ্বনি। যাহার হৃদয়ে বল আছে, সে সে ধ্বনি শুনিয়া জাগরিত হয়,—পাপের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে সেই ভাগ্য কয় জনের হয়? যাহারা তাহা পারে না, তাহারা দীপশিখায় পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় পাপবহ্নিতে ঝাঁপ দেয়; আবার পোড়ে—আবার অনুতাপ করে। দানীশেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

দাদার কাছে সকল কথা জানাইয়া. পাঁচকড়ি বলিল,—"তিন চারি দিনের মধ্যে আপনি একবার বাড়ী চলুন।"

দানীশ বলিল,—"বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এখন ছুটি

পাইব বলিয়া আশা হইতেছে না। এখানে এখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এ সময়ে আমাকে ছাড়িবে না!"

পাঁ। খুব লোক মরিতেছে না কি ?

দা। হাঁ,—এ সময় এখানে আসা তোর ভাল হয় নাই!

পাঁ। কেন,—রোগের ভয় ? আমি ওসব মানি-টানি না। মহা-মারি ভগবানের সংহারিণী লীলা। মরা-বাঁচাও জীবের লীলা। যারা বলে রোগ সংক্রামক, তাদের নিতান্তই বুদ্ধির দোষ!

দানীশ বুঝিলেন, শিক্ষাবিরহিত পাঁচকড়ির এরূপ জ্ঞান স্বাভাবিক।

পাঁচকড়ি বলিল,—"কত দিন পরে বাড়ী যাইতে পারিবেন ?"

দা। ঠিক কি করিয়া বলিব ? ছুটীর দরখাস্ত করি,—তারপর যেমন হয় জানিতে পারিব।

পাঁ। তবে আ'জকার ডাকেই কিছু টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠান। নতুবা বাড়ীর লোক না খাইয়া মারা যাইবে।

দা। তুই বাড়ী যাবি না ?

পাঁ। আমি দিনকতক দেশটা দেখি। আপনার ছুটির মঞ্জুর হইলে তারপরে একত্রে যাইব।

দা। আমার ইচ্ছা নয় যে, এই প্লেগের সময় তুই এখানে থাকিস্।

পাঁ। সে জন্য আপনার কোন ভয় নাই। বাড়ী গিয়াও আমার কোন সুখ নাই। একবাড়ীতে থাকিব, অথচ শচীকে পাইব না,—তাহা কখনই সহ্য হইবে না। টাকা আ'জই পাঠাইবেন ত ?

দা। টাকা ত তহবিলে নাই। বাসা খরচ জন্য গোটা দশেক টাকা আছে।

পাঁ। আ'জ তাই পাঠিয়ে দিন। তারপরে আবার দেবেন।

দানাশ স্বীকৃত হইল। পাঁচকড়ি টাকা লইয়া তখনই ডাকঘরে চলিয়া গেল,—সে আসিবার সময় ডাকঘর চিনিয়া আসিয়াছিল। ডাকঘরে গিয়া দশটাকা মণিঅর্ডার করিল, এবং মাতার নিকট চিঠি লিখিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাঁচকড়ি ডাকঘরের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া নগরে বাহির হইল। সারা সহরখানি ঘুরিয়া সে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

বাসার সম্মুখে তখন একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, গাড়ীখানা মূল্যবান্ এবং অশ্ব দুইটি হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। অশ্ব ও অশ্বযানের অবস্থা দেখিয়া পাঁচকড়ি বুঝিল, কোন ভদ্রলোক বাড়াতে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কোন কার্য্যেই সে বিঘ্ন দেখিতে পায় না, মুহূর্ত্ত চিন্তা না করিয়া সে বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল।

যে গৃহে দানীশ থাকে, সে গৃহে তখন মধুর হারমোনিয়মের স্বরের সহিত মধুর রমণী কণ্ঠের স্বর উত্থিত হইতেছিল। পাঁচকড়ি ব্যাপার দেখিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। দেখিল, এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী দানীশের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরে হারমোনিয়ম রাখিয়া চাবি টিপিয়া বেলো করিয়া গান গাহিতেছে। তাহার গায়ে জামা, পায়ে জুতা-মোজা,—মাথার চুলে বেণী বাঁধা। মেয়েমানুষের এমন সাজ—এমন ব্যবহার, তাহার চক্ষে নূতন দৃশ্য।

পাঁচকড়ি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। গান গাহিতে গাহিতে যুথিকার নয়ন দরজার দিকে পতিত হইল দেখিল, একটি তরুণ যুবক একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। গান বন্ধ করিয়া যুথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মহাশয়?"

পাঁচকড়ি বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যুথিকা মনে মনে হাসিল; ভাবিল,—লোকটা ভারি বোকা,

একটা কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। কিন্তু মানুষটা সুপুরুষ বটে—আলাপ পরিচয়ের নিতান্ত অযোগ্য নহে। বয়স অতি অল্প,—মোটে গোঁফের রেখা দিয়াছে, হয় ত সেই জন্যই এত মুখচোরা।

দানীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, —"গান বন্ধ করিয়া কি ভাবিতেছ ?"

যুথিকা একবার দানীশের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর অন্য-মনস্কভাবে বলিল,—"ঐ লোকটির কথা।"

দানীশ হাসিয়া বলিল,—"ও আমার ছোট ভাই, দুই ভাইকেই আর ভাবিও না!"

দানীশ কথাটা রহস্য করিয়াই বলিয়াছিল, কিন্তু যুথিকার হৃদয়ে তাহা উজ্জ্বলতর ভাবে বিকাশিত হইল। তাহার মনে হইল, তাহাতে দোষ কি ? অমন চোখ, অমন মুখ,—অমন সরল দৃষ্টি কয় জনের আছে!"

যুথিকা হারমোনিয়মের চাবি বন্ধ করিয়া বলিল,—"ইনি কবে আসিয়াছেন ?"

দা। আজ সকালে।

যু। এখানে কতদিন থাকিবেন ?

দা। স্থির নাই। উহার ইচ্ছা লইয়া কথা।

যু। উনি কি কলেজে পড়েন ?

দা। না, ও লেখা পড়া ভাল জানে না। বাল্যকালে মাথার ব্যায়রাম হইয়াছিল, তাই ডাক্তারেরা অধ্যয়নাদি মানসিক পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

যু। আহা! অমন সুন্দর পুষ্পটি নির্গন্ধ।

দা। এক গুণ আছে।

যু। কি ?

দা। সুন্দর হারমোনিয়ম বাজাইতে পারে,—সুন্দর গাহিতে পারে।

যু। তবে ডাক না।

দা। কিন্তু আমার সম্মুখেই গাহিবে না।

যু। অশিক্ষিত এবং পল্লীবাসী কি না! হায়, এ কুসংস্কার কত দিনে যে বঙ্গভূমি হইতে বিদূরিত হইবে! পবিত্র সঙ্গীত, পবিত্রভাবে পিতা পুত্রে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদরে, ভ্রাতা-ভগিনীতে, স্বামী স্ত্রীতে, এমন কি শ্বাশুড়ী জামাইতে এক বিছানায় বসিয়া মুখোমুখী চোখোচোখী হইয়া গাহিতে না পারিলে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সাধন হইবার সম্ভাবনা নাই।

দা। তুমি অন্য সময়ে উহার গান শুনিতে পারিবে।

যু। কা'ল সকালে তুমি যখন ডাক্তারখানায় যাইবে, আমি আসিয়া গান শুনিব।

দা। সেই ভাল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শঙ্খ-কুন্দ-ধবল জ্যোৎস্না ধরাবক্ষে পতিত হইয়া সর্ব্বত্র আলোকিত করিয়াছে। পাঁচকড়ি বাসা হইতে বহির্গত হইয়া সহরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাইতেছে,—কোথায় যাইবে, প্রয়োজনই বা কি, তাহা সে অবগত নহে। বুঝি ভ্রমণই একমাত্র উদ্দেশ্য। সে হন হন করিয়া সহরের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

এই দিকে দরিদ্রপল্লী। অনতিপ্রসর পথ,—অবিন্যস্ত বৃক্ষবহুল সুতরাং জ্যোৎস্নালোক সর্ব্বত্র সমানভাবে পতিত হইতে পারে নাই।

যখন যেখানে মহামারি উপস্থিত হয়, তখন সেখানকার দরিদ্রপল্লী লইয়া টান পড়ে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব এই দিকেই অধিক। প্লেগের ভীষণ আক্রমণে সে পাড়া শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহারও মুখে জল দিবার লোক নাই। অধিকাংশ লোক সরকারী ডাক্তারখানায় মরিতেছে, যাহারা ভয়ে ডাক্তারখানায় যায় না, তাহারা বাড়ীতে মরিতেছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারাও আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া কম্পিত-দেহে কাল কাটাইতেছে। যাহাদের রোগ এখনও হয় নাই, কখন হইবে, কখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে ম্রিয়মান,—উৎসাহশূন্য, উদ্যমহীন। সন্ধ্যার পরে কেহ আর পথে বাহির হয় না,—ভয় এবং অনুৎসাহ—যেন সে পাড়ায় ঘনাইয়া বসিয়াছে।

পাঁচকড়ি চলিয়া যাইতেছিল, সহসা থামিয়া দাঁড়াইল। সেই পথে একজন স্ত্রীলোক আসিতেছিল। যখন উভয়ে নিকটবর্ত্তী

হইল, তখন চন্দ্রালোকে পাঁচকড়ি দেখিল, রমণী কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে সমুপস্থিতা। সে বিচিত্র বস্ত্র পরিহিতা এবং রৌপ্যাভূষণের ভারে পুষ্পিতা ব্রততীর ন্যায় অবনত দেহা। চক্ষু ডাগর ও উজ্জ্বল; বিস্তৃত ভ্রূযুগ মধ্যে একটু রক্তরেখা।

রমণী অতি বিনীত এবং করুণস্বরে কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু পাঁচকড়ি তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

পাঁচকড়ি রমণীর ভাষা বুঝিতে না পারিলেও, ইহা বুঝিয়াছিল যে, রমণী কোন কারণে বিপন্না; এবং কোন মানবের সাহায্য প্রার্থিনী। সে ফিরিয়া দূরে দূরে চাহিয়া রমণীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

কিয়দ্দূর যাইয়া রমণী পথের উপরে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ গত হইল, কেহ আসিল না। রমণী আবার চলিতে লাগিল। রমণী যতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল,—পাঁচকড়ি ততক্ষণ পথপার্শ্বস্থ একটা দেবদারু বৃক্ষের ছায়ান্ধকারে দেহ লুকাইয়া ছিল,—রমণী চলিতে আরম্ভ করিলে, সেও চলিতে লাগিল।

সহর পরিত্যাগ করিয়া রমণী বাহিরের রাস্তা ধরিল—অর্দ্ধ মাইল পথ চলিয়া গিয়া, রাস্তারধারে একটা ইন্দারার নিকটে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সর্ব্বত্র জনশূন্য। দূর প্রান্তর হইতে উদাস সমীরণ বহিয়া আসিতেছিল। সমীরান্দোলিতা লতার ন্যায় রমণী কম্পিত দেহা এবং শুষ্কপত্রের মর্ম্মরে ত্রাস-কম্পিতা হরিণীর ন্যায় ভীত-চকিত দর্শনা।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রমণী ফিরিতেছিল, সহসা দুইজন বলিষ্ঠ যুবক সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণী তাহাদিগকে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বুঝি মনে করিল, উতলা হইয়া এখানে

আসিয়া ভাল করি নাই। মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিল। রমণীর নাম যোশি। যোশি জাতিতে মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

ত্রাস-কম্পিত কণ্ঠে একজনকে লক্ষ্য করিয়া যোশি বলিল,—"আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাকে যে হনুমানজির কবচ দিতে চাহিয়াছিলেন, দিন। বড় বিপদ বলিয়াই আপনার কথামত এই রাত্রে এখানে আসিয়াছি। আমার বাপ প্লেগে মারা গিয়াছেন. মাও রোগাক্রান্তা হাসপাতালে গিয়াছেন,—আমি, আমার দিদি, আর একটি ছোট ভাই আছি,—যাহারা যাহারা হনুমানজির কবচ লইয়াছে, তাহাদের বাড়ী প্লেগ হওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি দিতে চাহিয়াছেন, তাই আসিয়াছি, সঙ্গে কেহ আসিল না। বড় বিপদে না পড়িলে, এমন স্থানে, এমন সময়, একা কখনই আসিতাম না। একজন আসিতে চাহিয়া আসিল না। কিন্তু এসময়, না আসিলে আপনি ফিরিয়া যাইবেন,—তাই একাই, আসিয়াছি।

যুবক হাসিয়া বলিল,—"একা আসিয়াছ তাতে কি হইল? এ কবচ আর কাহাকেও দিই না। হনুমানজির মন্দিরের আমিই সেবক, আমার নিকট ভিন্ন অন্য কোথাও মিলে না।"

যো। তাই জানিয়াই ত এমন স্থানে আসিয়াছি।

যু। ভালই করিয়াছ, কিন্তু এই মহামূল্য কবচের পরিবর্ত্তে আমায় কি দিবে?

যো। আমি অনাথা,—আমি কি দিব? আপনি দয়া করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, তাই আসিয়াছি। আমার কি আছে কি দিব?

যু। তোমার যাহা আছে, তাহা বুঝি রাজরাণীরও নাই। তোমার ঐ সযৌবন দেহকান্তি আমাকে দাও। আমি যদিও হনুমানজির সেবক—প্রকাশ্যে বিবাহ করিতে পারি না। কিন্তু তোমাকে রাজরাণীর

মত সুখে রাখিব, তুমিও আমার হও। তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মাতাও যখন রোগগ্রস্ত হইয়া হাঁসপাতালে গিয়াছে, তখন মরিবে কি মরিয়াছে। কোথায় দাঁড়াইবে? আমি তোমাকে বুক হইতে নামাইব না,—তোমার সুখের জন্য হনুমানজির ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকিবে।

পদদলিত ফণিণীর ন্যায় যোশি মস্তকোত্তলন করিল; ভয় ও রোষে অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল, কাজ ভাল হয় নাই। সন্ন্যাসী মোহান্তের মনেও যে, পাপ বিরাজিত থাকিতে পারে, সে কথা সে মনেও করিতে পারে নাই। যোশি কাঁদিয়া ফেলিল, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় প্রান্তরস্থ হরিৎ শষ্পের উপর ঝরিয়া পড়িল।

যুবক বলিল,—"তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার সৌভাগ্যশশির উদয় হইল।"

যো। আমি সে সৌভাগ্য চাহি না,—আপনার কবচও চাহি না। আপনি মোহান্ত—হনুমানজির সেবক। আপনি আমার পিতা, আমি চলিলাম। আমায় ক্ষমা করুন,—আমি বড় অনাথা।

যু। কোথায় যাবে? এত কৌশল করিয়া তোমাকে এখানে আনিয়াছি কি চলিয়া যাইবার জন্য?

যো। আপনি ধার্ম্মিক,—হনুমানজির পূজক। ধর্ম্ম স্মরণ করুন,—সতী রমণীর অপমান হনুমানজি সহ্য করিবেন না।

যোশি চলিয়া যাইতেছিল, পাষণ্ড তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল। যোশি চীৎকার করিয়া উঠিল,—যুবকের সঙ্গে অপর যুবক ছুটিয়া আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—মোহান্ত সবলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

অনতিদূরে একটা বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া পাঁচকড়ি সমস্ত দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। শুনিয়া বড় অধিক কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে এবং কথোপকথনের ভাবে কতক কতক বুঝিয়া

সে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইতে পারিতেছিল। বুঝিতেছিল, রোগ-ভয়ে ভীতা সরলাকে রোগনিবারক কবচ দান করিবার প্রলোভনে; সেই নরপশু তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, সেই নির্জ্জন স্থানে আনিয়াছে। সে কথোপকথন শুনিয়া অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতেছিল। তারপরে যখন তাহারা অসহায়া কিশোরীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য পশু-বল প্রকাশে সমুদ্যত হইল, তখন পাঁচকড়ি সিংহবিক্রমে ঘটনাস্থলে লম্ফ দিয়া পড়িল। সে ভাবিল না যে, তাহারা ভীমকান্তি দুইজন বলিষ্ঠ পুরুষ, আর সে একা। সে তাহা কখনও ভাবে না; কাজের সময় উপস্থিত হইলেই সে কাজ করিত।

বাধা প্রাপ্ত হইয়া যুবকদ্বয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, যুবতীকে পরিত্যাগ করিয়া পাঁচকড়িকে পশুবলে সংহার করিতে ধাবমান হইল।

সতীর সতীত্ব রক্ষার্থে পাঁচকড়ি যে বিপদে ঝাঁপ দিয়াছে,—মহাশক্তি তখন তাহার শরীরে আবির্ভূতা,—যুবকদ্বয় তাহার সে মহামহিমান্বিতা শক্তিবলে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যোশি প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল।

সহসা মহান্তের একটা প্রবল চপেটাঘাতে পাঁচকড়ি ঘুরিয়া পড়িল, ঠিক সেই সময় দুইজন কনষ্টেবল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোশি কাঁদিয়া সকল কথা জানাইল। তাহারা যুবকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিল।

পাঁচকড়ির তখনও জ্ঞান হয় নাই। তখনও তাহার দেহ শষ্পশয্যায় শায়িত। একজন কনষ্টেবল যোশিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ লোকটিও কি তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল?"

যোশি কারুণ্যকণ্ঠে কহিল,—"না। উনিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। উনি না থাকিলে এতক্ষণ পাষণ্ডেরা আমাকে কোন্ অন্ধকার রাজ্যে লইয়া যাইত,—বুঝি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিত।

একজন গিয়া পাঁচকড়ির নাকের কাছে হাত দিল, তারপরে হাত ধরিয়া টানিল। পাঁচকড়ি মূর্চ্ছিত হইয়াছিল; অনেকক্ষণ মুক্তবাতাসে থাকিয়া জ্ঞান হইতেছিল, কনষ্টেবলের টানাটানিতে সে উঠিয়া পড়িল।

পাঁচকড়ি চারিদিকে চাহিল। সকল কথা মনে পড়িল, এবং পাষণ্ড-দ্বয় যে, পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে ও রমণীর সতীত্ব রক্ষা পাইয়াছে, ইহাতে সে বড় আনন্দিত হইল।

তখন সে কনষ্টেবলকে বলিল,—"রমণীকে তোমরা বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিও, আমি চলিলাম।"

তাহারা পশ্চিমদেশীয় লোক, কিন্তু পাঁচকড়ির বাঙ্গালা বুঝিল, এবং ইহাও তাহারা বুঝিল যে, পাঁচকড়ি হিন্দি জানে না। যে প্রাচীন, সে খুব সরল করিয়া বলিল,—"এই মেয়েমানুষটিকে কি তুমি চেন?"

পাঁ। না।

ক। তুমি এখানে কেন আসিয়াছিলে?

পাঁ। সহরের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে রমণীকে একাকিনী এই পথে আসিতে দেখিয়া কৌতূহল হইল, তাই উহার পশ্চাদনুশরণ করিয়াছিলাম।

ক। এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হইবে।

পাঁ। যাহা সত্য, তাহা কেন বলিব না।

ক। তোমাকে থানায় যাইতে হইবে। কোথাকার লোক, কোথায় চলিয়া যাইবে,—থানায় গিয়া দারোগাবাবুর সাক্ষাতে সমস্ত বলিয়া যাইতে হইবে।

পাঁ। প্রয়োজন হয়, চল।

তখন কনষ্টেবলেরা আসামী দুইজন, যোশি এবং পাঁচকড়িকে লইয়া সহরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। থানার দারোগা বাসাবাড়ার মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ কেহ রন্ধন করিতে গিয়াছিল, কেহ আহার করিতে গিয়াছিল, কেহ শয়ন করিয়াছিল, কেহ বাঞ্ছিত সন্ধানে গমন করিয়াছিল,—কনষ্টেবলদিগের মধ্যে অনেকে পাহারায় বাহির হইয়াছিল।

কনষ্টেবলদ্বয় থানায় পঁহুছিয়া যোশি ও পাঁচকড়িকে চত্বরস্থ বকুল-তলায় বসাইয়া রাখিয়া একজন দারোগাবাবুর অনুসন্ধানে গমন করিল। একজন আসামীদ্বয়কে লইয়া হাবিলদারের নিকট গমন করিল।

তখন দিগন্ত ভাসাইয়া জ্যোৎস্নাবন্যা সীমা পার হইয়াছিল। ধীর-সমীর বকুল-বাস বুকে করিয়া দিক হইতে দিগন্তর পথে চলিয়া যাইতেছিল।

যোশি ও পাঁচকড়ি বকুলতলে পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছিল,—সর্ব্বত্র নীরব। জ্যোৎস্নাকিরণে কিশোর-কিশোরীর অঙ্গদ্যুতি উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

যোশি এক একবার পাঁচকড়ির দিকে চাহিতেছিল। পুলকে তাহার দেহ পূর্ণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল—এমন মানুষ পৃথিবীতে কয়টি আছে? পরের জন্য যে আপন প্রাণ আহুতি দেয়, সে মানুষ না দেবতা! আমরা যেখানে বসিয়া আছি, এ পৃথিবী না স্বর্গ!!

আর পাঁচকড়িও যোশির চন্দ্রালোক-বিভাসিত প্রস্ফুট পঙ্কজের ন্যায় মুখখানি এক একবার স্থির-নয়নে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে-

ছিল। তাহার সদানন্দ প্রাণে সে সৌন্দর্য্য প্রবেশ করিয়া এক মহা ভাবের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল,—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মা আমার, এই রমণীরূপে উছলিয়া পড়িতেছেন। মা যে আমার সৌন্দর্য্যস্বরূপিণী! বিশ্ববাসী রূপে মুগ্ধ, তাই মা আমার জীবগণকে বাঁধিবার জন্য চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা-পরিশোভিত; নভঃস্থল ও জীবজন্তু-তরুতৃণপরিবৃতা নদ-নদীমেখলা ধরণী হইতে নিত্য সৌন্দর্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রমণীরূপে দেখা দিতেছেন। তাই বিশ্বের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি হইতেছে। এই সৌন্দর্য্য লইয়া মা আমার কখন কন্যা, কখন ভগিনী, কখন স্ত্রী, কখন মাতৃরূপে দেখা দিতেছেন। আর আমরা মোহ-মুগ্ধ নয়নে সে রূপের দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। কিন্তু আমাদিগের তৃষিতনয়নের আকুলদৃষ্টি সেই অশরীরিণী সৌন্দর্য্যরাণীকে হৃদয়-কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি কি? সে প্রতিবিম্ব হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয় সত্য, কিন্তু ধরা যায় কি? চিত্রকরের তুলিকা সেখানে শিথিল হইয়া পড়ে, মুখের ভাষা মূক হইয়া যায়, ব্যাখ্যা নির্ব্বাক হইয়া থাকে। ইহা ইন্দ্রিয়াধিকারের অতি দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়; ধরিতে গেলে ধরা দেয় না, ডাকিলে নিকটে আসে না।

পাঁচকড়ির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল,—সে ভক্তিগদগদকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিল।

এই সময় একজন কনষ্টেবল আসিয়া যোশি ও পাঁচকড়িকে ডাকিল। তাহরা চলিয়া গেল।

একটি টেবিল-চেয়ার শোভিত কক্ষমধ্যে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে,—তিনিই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিসকর্ম্মচারী। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল।

সুন্দরকান্তি কিশোর-কিশোরী আসিয়া তাঁহার টেবিলের ধারে দাড়াইল। একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া, ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যোশি ও পাঁচকড়ি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকল কথা বর্ণনা করিল।

দারোগা পাঁচকড়িকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি বাঙ্গালী হইয়া ইহার সঙ্গে মিশিলে কেমন করিয়া?"

পাঁ। সকল কথাই ত বলিয়াছি।

দা। সে কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাঁ। তবে কি বিশ্বাস করেন?

দা। কেবল বিশ্বাস নহে, প্রমাণও হইয়া গিয়াছে। তোমরা দুই জনে পলায়ন করিতেছিলে, মহান্তমহারাজ বন্ধুসহ ঐ পথে আসিতে-ছিলেন, দেখিতে পাইয়া তোমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

পাঁ। কি অভিপ্রায়ে পলায়ন করিতেছিলাম?

দা। দুই জনে দুরভিসন্ধি পূরণ জন্য।

পাঁ। মায়ে-পোয়ে কি দুরভিসন্ধি পূরণ মহাশয়? এ যে আমার মা! দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। যোশি অবনতমুখী হইল।

দা। তুমি এখানে কি কাজ কর?

পাঁ। কোন কাজ করি না,—দাদার কাছে আসিয়াছি।

দা। তোমার দাদা কি এখানে কোন কাজ করেন?

পাঁ। হাঁ,—তিনি সরকারী ডাক্তার।

দা। দানীশ বাবু?

পাঁ। হাঁ।

দারোগা দানীশবাবুকে চিনিতেন। পুলিস সাহেবের বাসায় পুলিস সাহেবের সহিত একত্রে চা-চুরুটের সদ্ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন,

এবং পুলিসসাহেবের সহিত যে, ডাক্তারবাবুর সবিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তাহাও জানিতেন।

দারোগা বাবু কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"তুমি কিছু মনে করিও না। মোকদ্দমার সত্য-মিথ্যা স্থির করিবার জন্য আমরা প্রথমে অনেক বাজে কথার উত্থাপন করিয়া থাকি। যাক্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

পাঁ। কি বলুন?

দা। এই ঘটনা লইয়া যদি মোকদ্দমা কোর্ট পর্য্যন্ত লওয়া যায়, তবে স্ত্রীলোকটির কিছু ক্ষতি আছে?

পাঁ। কি ক্ষতি?

দা। উহার স্বামী উহাকে গ্রহণ করিতে না পারে, এবং অনেকে অনেক রকম কথা বলিতে পারে।

পাঁ। আপনি বয়োবৃদ্ধ, যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।

দেবদেবীর উদ্দেশ্যে সাধারণ প্রদত্ত দেবধন মহান্ত মহারাজগণ সেবায়েৎগণ যে প্রকারে ব্যয় করিয়া থাকেন; এস্থলে সেই প্রকারেই তাহার কিঞ্চিৎ দারোগাবাবুর পকেটস্থ হইয়াছিল—অধিক হইবার আশা পাইয়াছিলেন—এইরূপ অনেকে অনুমান করেন।

যাহা হউক, দারোগাবাবু পাঁচকড়িকে সদুপদেশ দানে বাধিত করিয়া, কথাটা যাহাতে আর কেহ শুনিতে না পায়, এমন কি দানীশ বাবুও না শুনিতে পান তাহার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাঁচকড়ি স্বীকৃত হইল।

তখন একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া পাঁচকড়ি যোশিকে বাড়ী পঁহুছিয়া দিল। যখন পাঁচকড়ি যোশির নিকট হইতে বিদায় লইল,

তখন সে আবেশ-তরঙ্গ-নেত্রের করুণ-দৃষ্টিতে পাঁচকড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। পাঁচকড়ি স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেল।

পাঁচকড়ি যখন বাসায় উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

পাচক বলিল,—"এত রাত্রি কোথায় ছিলেন ?"

পাঁ। সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম!

পা। ভাল নয়, —এ বিদেশ যায়গা, এমন করা কি ভাল ?

পাঁ। দাদা কিছু বলিয়াছেন কি ?

পা। না, তিনি সন্ধ্যার পরেই বাসা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। রোজই যান।

মনে মনে বলিল,—"তোমারই ত দাদা। তুমি আসিয়াই রাত্রি দুপুর করিলে, কা'ল হইতে হয় ত আর সারা রাত্রির মধ্যে বাসায় আসিবে না!

দশম পরিচ্ছেদ।

দানীশের সহিত যুথিকার পরামর্শ হইয়াছিল যে, তৎপর দিবস সকালে যুথিকা আসিয়া পাঁচকড়ির গান শুনিয়া যাইবে, কিন্তু সকাল বেলা সঙ্গীত-মাধুর্য্য পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পায় না, এই অজুহাতে যুথিকা সকালে না আসিয়া সন্ধ্যার পরে আসিল।

আকাশ সে দিন পরিষ্কার ছিল, এবং চন্দ্রকিরণে দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছিল।

যুথিকা যখন বাড়ীর মধ্যে আগমন করিল, তখন পরামর্শানুসারে দানীশ বাড়ী ছিল না। দানীশ জানিত, যুথিকা শিক্ষিতা—যুথিকা প্রেমিকা; কেবল বিশুদ্ধ পবিত্র সঙ্গীত শ্রবণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য!

যুথিকা আসিবামাত্র ভৃত্য দানীশের বসিবার ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। যুথিকা আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু কোথায়?"

ভৃ। বাহিরে গিয়াছেন।

যু। ছোটবাবুকে ডাকিয়া দে।

ভৃত্য গিয়া ছোটবাবুকে সে কথা বলিল। ছোটবাবু ওরফে পাঁচকড়ি তখন সন্ধ্যার প্রাণায়াম সমাপ্ত করিয়া একটা রসগোল্লায় কামড় দিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সেটা গলাধঃকরণ করিয়া পাচককে জিজ্ঞাসা করিল,—"ও মাগীটা কে গা?"

পা। বাঙ্গালী মেমসাহেব। এখানকার খৃষ্টানী মেয়ে স্কুলের কর্ত্তা।

পাঁ। এখানে আসে কেন?

পা। কি জানি,—শুনিয়াছি, ইংরাজী পড়া মেয়ে-পুরুষ একত্রে বসিয়া ইয়ারকী দেয়। সাহেব মেমেও দেয়। ওতে নাকি দোষ হয় না।

পাঁ। মাগীর চরিত্র ভাল ত?

পা। সাত টাকা মাহিনায় ভাত রাঁধিতে আসিয়া, অত বড় বড় লোকের খবর জানিব কি প্রকারে বাবু?

পাঁচকড়ির যদিও তাহার নিকটে যাইতে ইচ্ছামাত্র ছিল না, তথাপি এদেশের নিয়ম—কায়দা-কানুন জানে না, যদিই বা অভদ্রতা বা দোষ হয়, এই ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি যে গৃহে যুথিকা বসিয়াছিল, সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। যুথিকা মৃদু হাসিয়া মোহন-স্বরে বলিল,—"বসুন। আমি অনেকক্ষণ আসিয়া আপনার প্রতীক্ষায় আছি।"

সে কথার কি উত্তর করিতে হয়, পাঁচকড়ি তাহা খুঁজিয়া পাইল না। যে কথা সে মনে করিতে যায় সেই কথাই,—একেবারে তাহার উদর মধ্যে ডুবিয়া পড়ে, কিছুতেই আর তাহাদের সন্ধান করিতে পারে না। সে কোন কথা বলিতে না পারিয়া একটু হাসিয়া একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

যুথিকা বলিল,—"আপনি ভাল গায়িতে পারেন, তাই আপনার এখানে গান শুনিতে আসিয়াছি। হারমোনিয়মটা খুলিয়া লইয়া একটি গান করুন।"

পাঁচকড়ি এবার কথা কহিল। বিনীতভাবে বলিল,—"আমি গাহিতে পারি কে বলিল?"

যু। কেন, আপনার দাদা—ডাক্তারসাহেব।

পাঁচকড়ি চমকিয়া উঠিল। যুথিকা হাসিয়া বলিল,—"আপনি কি

লজ্জিত হইলেন। উহা পল্লীগ্রামে অবস্থানের ফল। গান অতি পবিত্র জিনিষ—উহা স্বর্গীয় পদার্থ। কাহারও নিকট উহা বলিতে লজ্জা নাই!”

পাঁচকড়ি ভাবিল—তবে তাই। সে হারমোনিয়ম খুলিয়া একা চাবি টিপিয়া সজোরে বেলো করিয়া গাহিল,—

করুণাসাগর হরি এসে কর পূজা গ্রহণ;
দীনহীনের হীনশক্তিতে যা' হ'য়েছে আয়োজন।
পত্র-পুষ্প-ফল-জল দৃশ্যাদৃশ্য যে সকল
তোমারি তা' নিজস্ব ধন জানে না বল কোনজন,
তা' ব'লে কাঙ্গালের নিধি করিবে কেন হেলন;
(ওগো) প্রভু-দত্ত বেতন এনে করায় না কি প্রভু ভোজন?
ভোগের পাত্র মন্দ ব'লে যেয়ো না চরণে ঠেলে
যারা স্বর্ণপাত্রে আহার করে খায় না কি পাতে কখন?
যৎসামান্য উপকরণ দেখে তোমার রাগ কি কারণ
অণু হ'তে বিরাট সৃষ্টি নয় কি তোমার জগৎ জীবন?
আত্মা হ'তে সৃষ্টি হয় ইহাই ত বেদের বচন,
তবে বদ্ধ আত্মা পরমাত্মায় হবে না কেন মিলন?

হারমোনিয়মের সঙ্গে পাঁচকড়ির মধুর কণ্ঠ মিলিত হইয়া গীত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে গান গীত হইল,—তারপরে পাঁচকড়ি গান সমাপ্ত করিয়া কপালের স্বেদনীর মুছিয়া ফেলিল। যুথিকা বলিল,—“আপনার গলার স্বর, আপনার হারমোনিয়ম শিক্ষা, অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু গানটি অতি কুরুচিমাখা—অমন গান ভদ্রলোকের গাহিতে নাই।”

পাঁচকড়ি বুঝিতে পারিল না, ঠাকুরদেবতার গান কুরুচিমাখা কেন হইবে? সে কোন কথা কহিল না, বিস্ময়-সূচক চাহনিতে যুথিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুথিকার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল,—"আপনি বোধ হয়, ঐ গানটির বিষয় বুঝিতে পারেন নাই! সেই হরিঠাকুর—হরি এই নাম কাণে গেলেই সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনাতট, সেই কদম্ববৃক্ষ—ক্ষমা করিবেন, আর বলিতে পারিব না—সেই সকল জঘন্য কথা মনে পড়ে। তায় উপর আবার—কুরুচি,—বিষম কুরুচি—পূজার আয়োজন -ঈশ্বরের ভোজন—ভোগের পাত্র—হায় হায়, একজন শিক্ষিত ভদ্র লোকের গৃহে একজন শিক্ষিতা ভদ্র মহিলার সম্মুখে এ গান অন্যে গাহিলে এতক্ষণ আমার মূর্চ্ছা হইত—কিন্তু আপনাকে ভালবাসিয়াছি,—প্রাণের সমস্তটুকু লইয়াই আপনাকে ভালবাসিয়াছি,—তাইতে এতক্ষণ বসিয়া আছি। অধিনীর সবিশেষ অনুরোধ, আর কখনও অমন গান গাহিবেন না। আর একটি গান করুন। আমি বড় আশা করিয়া আপনার দুয়ারে আসিয়াছি,—একটি ভাল গান গাহিয়া আমার আশাতপ্ত হৃদয় শীতল করুন।"

পাঁচকড়ি সে সকল কথার অর্থ সম্যক্‌প্রকারে হৃদ্‌গত করিতে পারিল না। তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি গান গাহিব?"

যুথিকা কটাক্ষ-বিদ্যুৎ বিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"কেন প্রেম-সঙ্গীত। আপনি কি জানেন না, প্রেমেই জগৎ বাঁধা! প্রেম—প্রেম—পবিত্র প্রেম বিনা জগতের কোন অস্তিত্ব নাই।"

পাঁচকড়ি ভাবিল,—"ইংরেজী পড়িলে মানুষ ক্ষেপে না কি? যা কথা বলে তাও বোঝা যায় না,—আর স্বভাব-চরিত্র ত ঠিক উন্মাদের মত। কিন্তু তাহা হইলেও সে তেমন একজন বাঙ্গালী মেমসাহেবের কথা উপেক্ষা করিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোলের

উপর হারমোনিয়ম রাখিয়া প্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বেলো করিতে করিতে গাহিল,—

ওগো, তোমার দুয়ারে আমি তাই,
আমি যাহা চাই তুমি তাই।
জীবনের ঘুম-ঘোরে, পূজি গো নিতি তোমারে,
বিরল-বিরহ-বাসে তোমারে ধেয়াই ॥
নদ-নদী উপবন, উচ্চ শির শৈলগণ,
সকলেরি মাঝে দেখি রয়েছ লুকাই।
সাগরে ধরার 'পরে, কর মোর ধরি করে,
সুধীরে বিজলী পথ যাও গো দেখাই ॥
সুনীল অম্বর 'পরে, কোনও এক পরীদলে,
বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে ল'তেছে ভুলাই ॥

গৃহে কাচমধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। সেই তীব্র উজ্জ্বল আলোকতলে পাঁচকড়ি গান গাহিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডলে সিন্দুর মার্জ্জিত মুক্তার ন্যায় স্বেদবিন্দু উজ্জ্বল আলোকে শোভা পাইতেছিল,—কিন্নর কণ্ঠের মধুরস্বর লহরে লহরে ক্রীড়া করিতেছিল। বাসনা-লালসার অদম্য উচ্ছ্বাসপূর্ণহৃদয়া যুথিকা স্থিরনয়নে তাহা দেখিতেছিল,—নিস্পন্দিহৃদয়ে তাহা শুনিতেছিল। তাহার হৃদয়ে অদম্য লালসা জাগিয়া বসিল,—সে কাঁপিতে লাগিল। পাঁচকড়ির গান সমাপ্ত হইল।

যুথিকা কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"আপনার গান বুঝি স্বর্গের জিনিষ। আমার জ্ঞান হইতেছিল, আপনি এই স্বর্গীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সৌন্দর্য্যদেবতারূপে আমার মন-প্রাণ হরণ করিতেছিলেন।"

পাঁচকড়ি মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনি সন্তুষ্ট হইলেন, ইহাতে আনন্দিত হইলাম।"

যু। আমার একটি অনুরোধ আছে, রাখিবেন কি ?

পাঁ। কি বলুন।

যু। আপনি যে কয়দিন এখানে আছেন, প্রত্যহ একবার করিয়া আমার ওখানে যাবেন কি ?

পাঁ। কেন ?

যু। আপনার গান আমাকে পাগল করিয়াছে।

পাঁ। যাহাতে মনের বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে, তাহা আর না শোনাই ভাল।

যু। আপনার বড় কঠিন প্রাণ।

এই সময় বাহিরে একটা ভারি গোলযোগ উঠিল। ভৃত্যের চীৎকার তাড়নায় সমস্ত বাড়ীখানা যেন কম্পিত হইতেছিল। পাঁচকড়ি বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—"ব্যাপার কি ?"

যুথিকা বলিল,—"চাকর-বাকরে বকাবকি করিতেছে, ওদিকে আমাদের কান দিবার প্রয়োজন কি ?"

পাঁচকড়ি সে কথায় কর্ণপাত করিল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল। তখন ব্যাপার কি দেখিবার জন্য যুথিকাও দরোজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রাঙ্গণে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ধব্ ধব্ করিতেছিল। একটি অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে—সে কঙ্কালসার। ভৃত্য তাহাকে বাহির করিয়া দিবে, সে কিছুতেই যাইবে না। সে কাতরে বলিতেছে, "আমার বড় ব্যায়রাম হইয়াছিল—হাঁসপাতালে, দশ দিন হইল রোগ সারিয়া বাহির হইয়াছি, জগতে আমার কেহ নাই।" ভৃত্য তাহাকে না তাড়াইয়া ছাড়িবে না।

পাঁচকড়ি অনাহারশীর্ণ রোগজীর্ণ বৃদ্ধের অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

যুথিকা ডাকিয়া বলিল,—"আপনি এদিকে সরিয়া আসুন। উহার কি রোগ হইয়াছিল বলা যায় না,—যেরূপ চেহারা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, এখনও রোগ সারে নাই,—শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন—কোন সংক্রামক রোগও হইতে পারে। আমার বড় ভয় হইতেছে।"

পাঁচকড়ি সে কথা কানেও তুলিল না। বৃদ্ধ বলিল,—"বাবা, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নাই।"

ভৃত্য কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—"এখানে কে তোর জন্যে খাবার করিয়া রাখিয়াছে? শীগ্গীর দূর হ'—নহিলে পাহারাওয়ালা ডাক্‌চি।"

বৃদ্ধ। ওগো, আমার উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই। এই দেখ, পেটটা ধড় ধড় করিতেছে,—আমায় কিছু খেতে দাও।

ভৃ। খেতে দিচ্চি তোকে লাঠি—র'স্ ত শালা।

"র' বাপু, অত গরম হ'চ্চিস্ কেন"—ভৃত্যকে এই কথা বলিয়া পাঁচকড়ি পাচককে ডাক দিল। পাচক আসিলে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে কিছু খাবার দিতে পার?"

পা। "এখন কোথায় পাব? যে ক'জন লোক, সেইরূপ খাবারই প্রস্তুত আছে। আর আপনি উহাকে এখানে আসিতে দিবেন না—মথুরা উহাকে তাড়াইয়া দিক্। আমাদের বাবু ওতে বড় চটেন।"

যুথিকা বলিল—"চটিবারই কথা। ওরূপ লোকদের প্রশ্রয় দিলে নিরাকার ব্রহ্ম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।"

"কিন্তু আমাদের ঠাকুর দেবতা ওদের অযত্নে আরও চটিয়া যান।" এই কথা বলিয়া পাঁচকড়ি তাহার জন্য যে গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহে ছুটিয়া গেল। সে বাড়ী হইতে যে খরচ আনিয়াছিল, খরচ বাদে

সাত আনা পয়সা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। সে সেই সাত আনা পয়সা বাহির করিয়া লইয়া আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল,—"আমার সঙ্গে দোকানে এস, তোমায় খাবার দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ। বাবা, একঝোঁকে এখানে এসে প'ড়েছি। আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌চে—পেটে যে একটা দানাও নেই।

পাঁচকড়ি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। তারপরে ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া লইয়া বাটীর বাহির হইল। রাস্তার উপরে একটা ভাল যায়গায় তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া দোকানে গেল, এবং পুরি, আলুর দম, কিছু মিষ্ট ও এক ঘটী জল আনিয়া বৃদ্ধের পার্শ্বে উপবেশন করিল। বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিয়া সমস্ত খাবারগুলা খাওয়াইয়া দিয়া জলঘটী খাইতে দিল। তারপরে ঘটীটি দোকানদারকে ফিরাইয়া দিল, এবং দ্রব্যগুলির মূল্য পাঁচ আনা দিয়া অবশিষ্ট দুই আনা আগামী কল্য ভোজনের জন্য বৃদ্ধকে দিয়া বলিল,—তুমি এখন কোথায় যাবে?"

বৃদ্ধ। আমাকে যেমন রক্ষা ক'র্‌লে বাবা, ভগবান্ তোমাকে এম্নি ভাবে চিরকাল রক্ষা কর্ব্বেন। এখন তুমি বাড়ী যাও—আমার গাছতলা আছে।

পাঁচকড়ি বাসায় ফিরিয়া গেল। তখন দানীশ আসিয়াছে, এবং যুথিকার সহিত গল্প করিতেছে দেখিয়া, পাঁচকড়ি আহার করিতে পাচকের নিকট গমন করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষার লতার মত অপ্রতিহত গতিতে যুথিকার লালসা বাড়িয়া উঠিল। সে পাঁচকড়িকে চায়,—পাঁচকড়ি এখন তাহার ধ্যেয়। কিন্তু শিকারোন্মুখী ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া হরিণশিশু যেমন দূরে দূরে সরিয়া যায়, পাঁচকড়ি তেমনি দূরে দূরে সরিয়া থাকিত। তাহার হৃদয় বিশ্বমাতার স্তন্য সুধাধারায় অভিষিক্তিত—সে রমণী মাত্রকেই মায়ের মূর্ত্তি বলিয়া জানিত—সে সৌন্দর্য্যে কখনও তাহার প্রাণে একবিন্দুও কালিমা-দাগ পতিত হইত না, মাতৃভক্তিতে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিত!

তাহার পরে একমাস গত হইয়া গিয়াছে,—যুথিকা তাহার বাসনা-বিষে যত জ্বলিতেছে, পাঁচকড়িকে বাঁধিবার জন্য তত চেষ্টা করিতেছে, পাঁচকড়ি তত পিছাইয়া পড়িতেছে। প্রথম প্রথম যুথিকার আহ্বানে, তাহার বাড়ী গমন করিত, কিন্তু ক্রমে যুথিকার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, ক্রমে সে সেখানে যাওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এখন সংবাদ পাইলেও যুথিকার বাড়ী যায় না। তবে যে দিন নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পড়ে, সে দিন না গিয়া পারে না।

সে দিন শ্রাবণী পূর্ণিমা। সহর যুড়িয়া ঝুলনোৎসবের আনন্দ তুফান। আকাশ মেঘ শূন্য—দিকে দিকে জ্যোৎস্নার রজতোচ্ছ্বাস।

পাঁচকড়ি যুথিকার নিতান্ত অনুরোধে তাহার বাড়ীতে গিয়াছে। অট্টালিকা সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে দুইখানি আসনে দুইজন উপবিষ্ট। পাশের কৃত্রিম ঝরণা হইতে ঝর্‌ঝর্ শব্দে জল পড়িতেছিল, হাসনাহেনা ফুটিয়া সৌরভে দিগন্ত মধু-মাতোয়ারা করিতেছিল। পাঁচকড়ি হার-মোনিয়ম লইয়া মৃদু গ্রামে বাজাইতে আরম্ভ করিল।

যুথিকার প্রস্ফুটিত পঙ্কজবৎ মদিরারুণ নয়ন পাঁচকড়ির মুখের উপর স্থাপিত। সমীরস্পর্শে অলকগুচ্ছ কপোলের উপরে স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। হৃদয়াবেগোন্মত্ত প্রাণে কম্পিতকণ্ঠে যুথিকা পাঁচকড়িকে বলিল,– "একটা গান গাও।"

এখন যুথিকা পাঁচকড়িকে 'তুমি' 'তোমার' প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করে এবং পাঁচকড়িকে অনুরোধ করিয়া ঐরূপ বলায়।

হঠাৎ চ্যুতশাখাগ্রে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। পাঁচকড়ি গাহিল,—

চাঁদিনী এ রাতি তোমার মূরতি
ছাইয়া ব'সেছ সারাটি দেশ।
ফুলের সুবাসে মলয়ার শ্বাসে
সেজেছো বঁধুয়া মোহন বেশ!
রহিতে না পারি গুমরিয়া মরি
কাটিয়া যেতেছ হৃদয়-দেশা,
কর হৃদি আলা ঘুচে যাক্ জ্বালা
বাজুক বেহাগ-করুণা-রেস।

যুথিকা আবেস-তরল নেত্রে পাঁচকড়ির চন্দ্রালোকবিভাসিত সুন্দর আনন সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার সেই তাম্বুলরাগরঞ্জিত কোমল রক্তোষ্ঠ স্পর্শ করিতে প্রবল বাসনা হইতে-ছিল। পাঁচকড়ি গান সমাপ্ত করিল। যুথিকা হাসিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল।

শরাহত সিংহ যেমন গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিয়া উঠে, পাঁচকড়ি সেমনই লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিল,—"কেন মা, আমাকে এমন অকরুণা? আমি যে, তোমার সন্তান।"

ফুলকান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূর্ত্তি তখন উন্মাদিনীর ন্যায়। বলিল,—"প্রাণতম, আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি তোমারই! তুমি ভাবিতেছ, তোমার দাদার সহিত আমার ভালবাসা আছে,—কিন্তু তাহা নহে। যুথিকা জগতে কাহাকেও ভাল বাসে নাই—সকলের ভালবাসা লইয়াই চলিয়াছি, এইবার তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ,—প্রাণের প্রদীপ, আমাকে রক্ষা কর। তুমি টাকা উপার্জ্জন করিতে পার না—তাহাতে ক্ষতি কি? আমি মাসে মাসে অনেক টাকা বেতন পাই,—তোমাতে আমাতে আজন্ম তাহাতেই সুখে কাটাইব। আমার সঞ্চিত অর্থও অনেক আছে,—তোমার চরণে সে সকলই অর্পণ করিব। তুমি আমার হও। আমি তোমার দাসী হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইব।

গভীর অমাবস্যা নিশিথে প্রেতমূর্ত্তি দর্শনে পথিক যেমন ভয় পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, পাঁচকড়িও তদ্রূপ দিগ্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া গেট পার হইয়া রাস্তা বহিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঐ ঘটনার পরদিন রাত্রে আহারাদি অন্তে দানীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে নিকটে ডাকিয়া, কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে তুমি কি মনে করিয়া আসিয়াছ ?"

পাঁচকড়ি বিনীতস্বরে বলিল, "বাড়ীতে শান্তি নাই—সুখ নাই, তাই এখানে আসিয়াছি। আর আপনি খরচপত্রও পাঠান না. তাই বলিবার জন্য।"

দা। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না।

পাঁ। কোথায় যাইব ?

দা। বাড়ী।

পাঁ। বলিলাম ত বাড়ীতে আর সুখ-শান্তি নাই। এমন কি মেজবৌ শচীকে আমার কাছে পর্য্যন্ত আসিতে দেন না।

দা। তোমার মত গুণধরের ঐরূপ পুরস্কারই যোগ্য।

পাঁচককড়ি চমকিয়া উঠিল। তাহার সদা সহাস মুখে কালি ঢালিয়া দিল। বুঝিতে পারিল না. সে কি অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু কোন অপরাধ যে হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল। কেন না, বিনা অপরাধে তাহার দাদা কখনই রাগ করিবেন না. এবং রাগ যে করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, দাদাবে জিজ্ঞাসা করে. সে কি করিয়াছে—কেন তিনি তাহার উপরে রাগ করিয়াছেন। কিন্তু সাহসে কুলাইল না, নিরবে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কোন প্রকার উত্তর না পাইয়া দানীশ বলিলেন,—"একটি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা তোমার নাই, পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন কাটাইতেছ,—আবার এত বাদরামি !"

পাঁচকড়ি এবার জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বিনীত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কি করিয়াছি ?"

অধিকতর উত্তেজিত স্বরে দানীশ বলিলেন,—"কি করিয়াছ! মূর্খের নানা দোষ! থানার দারোগার মুখে তোমার সব গুণ শুনিতে পাইয়াছি!"

পাঁচকড়ি দাড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। বুঝিতে পারিল, দারোগা সেদিনকার রাত্রির সেই ঘটনা বিপরীতভাবে দাদাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। সে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু দানীশ বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিলেন,—"এত সাহস তোমার প্রাণে! তুমি কি মহান্ত মহারাজের নামে আবার মিথ্যা অপবাদ চাপাও—পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া কর! যদি তাঁহারা তোমায় আমার ভাই বলিয়া চিনিতে না পারিতেন. তবে উপযুক্ত সাজাই পাইতে! যাহা হোক,—তোমার এখানে আর থাকা হইবে না—আমি শুদ্ধ মারা পড়িব। আ'জ রাত্রেই তুমি চলিয়া যাও। এই নাও, তোমার রেলভাড়ার চারি টাকা—রাত্রি এগারটায় যে গাড়ী ছাড়ে, তাহাতেই যাওয়া চাই।"

পাঁচকড়ি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার স্বভাব সে কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতে ভালবাসে না। এখানেও স্বভাবমত কার্য্য করিল। দানীশের কথার প্রতিবাদ করিল না। বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইল। কেবল ছল ছল নেত্রে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া অতি করুণ-বিনীতস্বরে বলিল, "ন'বৌ আপনাকে বাড়ী যাবার জন্যে বড় অনুরোধ ক'রেছিলেন।"

দানীশ বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—"এই যে, ভায়ার আমার কাব্য শাস্ত্রে খুব দখল হ'য়েছে। মা গেল, দাদা গেল, ভাইবৌ'রা গেল—ন'বৌর অনুরোধ জানান হ'ল!—আরে ছিঃ!"

পাঁচকড়ি বড় অপ্রতিভ হইল। তথাপি বলিল,—"বাড়ীর জন্যে কিছু খরচ দিবেন কি?"

"দিতে হয়, পাঠাইয়া দিব। দশটা বাজিয়া সাত মিনিট হইয়াছে—এর পর গেলে, গাড়ী ধরিতে পারিবে না। ঐ গাড়ীতে তোমার যাওয়া চাই-ই।"

দানীশ এই কথা বলিলে, পাঁচকড়ি আর দ্বিরুক্তি করিল না। তাহার কাপড় চোপড় ও ছাতাটি লইয়া বাটীর বাহির হইল। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী,—বিশ্বের অন্ধকার রাজপথে আসিয়া ছাইয়া পড়িয়াছে। দূরে দূরে এক একটা কেরোসিনের আলোক জ্বলিয়া সে অন্ধকারকে নাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল। রাজপথ তখন জনশূন্য,—কচিৎ দুই একখানা ছেকড়া গাড়ী ঝন্‌ঝন্ করিতে করিতে ষ্টেসনাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল। আর স্থানে স্থানে দুই একটা দেশী কুকুর ধূলার উপরে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছিল। পাঁচকড়ি ব্যাগ হাতে করিয়া সেই অন্ধকার-মাখা রাস্তা দিয়া হন হন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

পাঁচকড়ির প্রাণে যে কোন প্রকার দাগ লাগিয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। সে গুন্‌গুন্ করিয়া আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"গভীর ঘন-ঘটা ঘোর প্রকাট বামার কলেবরে,
ভীষণ ভ্রুকুটী-ভঙ্গি উলাঙ্গিনী কে শবোপরে।"

এগারটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে পাঁচকড়ি যাইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। গাড়ী তখন আসে আসে,—অনেক যাত্রী টিকেট কিনিয়া প্লাটফরমে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। টিকিট লইবার ঘরের দিকে দুই চারিজন লোক ছিল। একটি বৃদ্ধ সেখানে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল।

পাঁচকড়ি ষ্টেসনে গিয়া গাড়ী আসিবার বিলম্ব নাই শুনিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতার একখানি টিকেট কিনিয়া আনিল। তার পরে প্লাটফরমে যাইতে উদ্যত হইয়া, হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, একজন বৃদ্ধকে দরোজার নিকট কাঁদিতে দেখিয়া আসিয়াছি। তখন সে তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ফিরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কাঁদিতেছ কেন বাপু?"

বৃদ্ধ বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বাবা!"

পাঁ। কি হইয়াছে, খুলিয়া না বলিলে বুঝিব কি প্রকারে? গাড়ী আসিবার আর বিলম্ব নাই—বল, তোমার কি হইয়াছে।

বৃ। আমি বাঙ্গালী—

পাঁ। তা ত তোমার কথাতেই বুঝিতে পারিতেছি।

বৃ। আমার ছেলে এই দেশে চাকুরী করিত—এক বাবুর বাড়ী ভাঁড়ারী ছিল। তাহার প্লেগ হইয়াছিল—বাবু তাহাকে হাঁসপাতালে দিয়া দেশে চলিয়া যায়।

পাঁ। তার পর?

বৃ। আমি সেই সংবাদ পেয়ে এখানে এসেছিলাম। বাবা আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আ'জ সকালে চিরকালের তরে চ'লে গিয়াছে। "হায়, আমার মত হতভাগা আর কে আছে গো! এই বুড়ো বয়সে অমন ছেলে হারিয়েছি গো!"

পাঁ। সবই আপন আপন কর্ম্মফল,—আর এখানে বসিয়া কাঁদিয়া কি করিবে? গাড়ী আসিবার বিলম্ব নাই—ঐ বুঝি গাড়ী আসিতেছে—হাঁ, ঐ শব্দ শোনা যাইতেছে। শীঘ্র চল। তুমি কোথা যাবে?

বৃ। হা ভগবান্,—মহাশয়, আমি কলিকাতায় যাইতাম, কিন্তু যাইবার উপায় নাই,—আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ছেলের শোকে বড় কাতর ছিলাম--টিকিট করিবার যায়গায় বড় ভিড় দেখে, একটি বাবুর হাতে টিকিটের দাম দিয়াছিলাম—তিনি নিজের টিকিট করিতে গেলেন, আমারও টিকিট আনিয়া দিবেন। কিন্তু বাবুর দেখা আর পেলাম না,—ষ্টেসনের বাবুদের জানালাম, তাহারা বলিলেন—জুয়াচোরে ঠকাইয়াছে! মহাশয়, আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম,—একে পুত্রশোক!—তাতে সারা দিন কিছু খাইনি—হাতে আর একটি পয়সাও নাই। "ওগো, আমার কি হবে গো।"

বৃদ্ধের ক্রন্দনের বেগ সমধিক বৃদ্ধি পাইল, এবং ঠিক এই সময় গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনের প্লাটফরমে দাড়াইল। ষ্টেসনে গাড়ী আসিল, বৃদ্ধ তাহাতে উঠিয়া যাইতে পারিল না জানিয়া, সে একেবারে আকুল হইয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া, বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচকড়ি তাহার অবস্থা অবগত হইয়া ব্যথিত হইল এবং নিজের টিকিটখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল,—"শীঘ্র যাও, গাড়াতে ওঠ গে।"

বৃদ্ধ বলিল—"ওগো, তুমিই কি আমার টিকিট আনিতে গিয়াছিলে? তোমার হাতেই কি টাকা দিয়াছিলাম? আহা,—তোমাকে কত লোক জুয়াচোর ব'লেছে। তাই ত বলি—ভদ্রলোকের সন্তান কি সামান্য টাকার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়! আমি বড় গরিব—টিকিট আনিয়া না দিলে আমার বড়ই দুর্গতি হইত!"

পাঁচকড়ি বলিল—"আর সময় নাই, তুমি গাড়ীতে ওঠ গে।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল, এবং গেট পার হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল—গাড়ী মহা শব্দে ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচকড়ির যাওয়া হইল না। তাহার দাদা তাহাকে কেবল বাড়ী পঁহুছিবার গাড়ীভাড়াটা মাত্র দিয়াছিলেন,—সে কলিকাতার টিকিট

করিয়াছিল,—সামান্য কয়েক পয়সা মাত্র তাহার নিকট উদ্বৃত্ত ছিল। সে আর টিকিট কিনিবে কি দিয়া? কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র চিন্তা হইল না। সে ব্যাগটি হাতে করিয়া ষ্টেসনের বাহিরে চলিয়া গেল।

ষ্টেসনের অনতিদূরে খাবারের দোকান। দোকানের রেলযাত্রী ভদ্রলোকগণ উপবেশন, শয়ন ও জলযোগাদি করিয়া থাকেন। পাঁচকড়ি সেই দোকানে গিয়া আশ্রয় লইল। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। দোকানের সম্মুখে একখানা তক্তপোষের উপরে ছিন্ন মাদুর পাতা ছিল—পাঁচকড়ি তাহার উপরে আপনার ব্যাগ মাথায় দিয়া শয়ন করিল; এবং অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে কলিকাতায় যাইবার আর একখানা গাড়ী ছিল। গাড়ী আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একখানা অশ্বযানে করিয়া কয়েকটি বাঙ্গালী যুবক আসিয়া সেই দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

সে দোকানখানা দিন রাত্রিই খোলা থাকিত। বাঙ্গালী বাবুরা আসিয়া পাঁচকড়ি যে তক্তপোষের উপরে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহার উপর উপবেশন করিলেন এবং নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অতি উচ্চ হাসি নানা ভঙ্গীস্বর ও দুই একটা গানের ভাঙ্গ চরণের আবৃত্তিতে বেশ একটু গোলযোগের সৃষ্টি হইল, সে গোলযোগে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল,—সে উঠিয়া বসিল।

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনাকে বাঙ্গালী দেখিতেছি, আপনি এখানে কেন?"

পাঁ। আমার দাদা এখানে থাকেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

যু। কোথায় যাইবেন?

পাঁ। আপাততঃ কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলাম। আপনারা কোথায় যাইবেন ?

যু। কলিকাতায়।

পাঁ। কোথায় গিয়াছিলেন ?

যু। কয় বন্ধু মিলিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম।

তার পর তাহারা জলযোগ করিল। একজন ঘড়ি ও রেলওয়ের সময় নিরূপণ তালিকা খুলিয়া দেখিয়া বলিল,—"গাড়ী আসিতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা সময় আছে। ততক্ষণ একটা গান হোক, হারমোনিয়মটা খোল না যদু।"

তাঁহাদের মধ্যে এক যদুনাথই ভাল গায়ক। যদু কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হওয়ায় তিনি অপরকে গাইতে অনুমতি করিলেন. তিনি আবার অপর একজনের উপরে ভারার্পণ করিলেন; এইরূপে পরস্পর পরস্পরের উপরে ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে এক যুবক পাঁচকড়িকে ধরিল। বলিল,—"যদিও বলিবার আমার কোন অধিকার নাই, তথাপি বলিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া আপনি যদি একটি গাইতেন। আমরা বিদেশে এইরূপ স্ফূর্ত্তি করিয়াই কাটাইতেছি।"

পাঁচকড়ি কোন আপত্তি না করিয়া হারমোনিয়মে বেলো করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। সে মধুর স্বর শুনিয়া যুবকগণ মোহিত হইতে লাগিল।

গান হইতেছে এমন সময় টিকিট লইবার ঘণ্টা পড়িল। একজন যুবক বলিল,—"একজন গিয়া টিকিট আন, গান বন্ধ করা হবে না। তারপরে গাড়ী আসিলে গাড়ীর মধ্যে বসিয়াও গান গাহিতে গাহিতে যাওয়া যাইবে; কেমন মহাশয়, আমাদের সঙ্গে যাইতে আপনার কোন আপত্তি নাই ত ?"

পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল,—"আপনারাও কলিকাতায় যাইবেন, আমিও কলিকাতায় যাইব; সুতরাং আপনাদের সঙ্গে যাইতে আপত্তি কেন হইবে? বরং আমোদে প্রমোদে যাইতে পারিব। কিন্তু আমার কাছে ভাড়ার টাকা নাই, এ গাড়িতে আমার যাওয়া হইবে না।"

"কুছ-পরোয়া নাই—সে জন্য আটকাইবে না, এই বলিয়া সেই যুবক গিয়া তাহাদের চারিখানা ও পাঁচকড়ির একখানা এই পাঁচখানা টিকিট করিয়া আনিল; তারপর যথাসময়ে গাড়ী আসিলে পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।"

পাঁচকড়ির ভাড়ার টাকার জন্য কোন অভাব হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যুথিকার নিকট হইতে যে দিন পাঁচকড়ি পলায়ন করিয়াছিল, সেই দিন হইতে যুথিকার প্রাণে নিরাশ-প্রেমের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যুথিকা—বিলাসিনী যুথিকা এতদিন বুঝি সে জ্বালা জানে নাই। যেখানে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে—যেখানে সে নয়নেঙ্গিত করিয়াছে, সেই-স্থানেই সাফল্যলাভ করিয়াছে। নিরাশ-প্রণয়ের বিষম বিপদে কখনও জ্বলে নাই। তাই সে বড় কাতর হইয়া পড়িল। পাঁচকড়ি ব্যতীত আর কাহাকেও তাহার ভাল লাগিত না,—অন্তঃপ্রবাহিত চির সঞ্চিত এক সুখ-সৌন্দর্য্যের নেশায় সে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে দিন রাত্রি পাঁচকড়িকে ভাবিত।

শিকারোন্মুখী ব্যাঘ্রীর দৃষ্টি হইতে ছাগশিশুকে সরাইয়া লইলে, তাহার হৃদয়ে যেমন যুগপৎ ক্রোধ ও ক্ষোভ জ্বলিয়া উঠে,—যুথিকা যখন শুনিতে পাইল, দানীশ তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে,—সারা মজঃফরপুরে পাঁচকড়ি আর নাই—তখন যুথিকার হৃদয় সেইরূপ ক্রোধে ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নর হউক, নারী হউক, যে কখন সংযম শিক্ষা করে নাই,—তাহার হৃদয়ে লালসা জাগিলে, তাহা নিবৃত্তি হয় না, - দণ্ডে দণ্ডে আরও বৃদ্ধি পায়; ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করে। যুথিকা পাঁচকড়ির বিরহ সহ্য করিতে পারিল না।

একদিন মধ্যাহ্নকালে দানীশকে লইয়া এক পরামর্শ আঁটিল। দানীশ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিল না—সে পতঙ্গ, পুড়িবার জন্য আরও অগ্রসর হইল।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

যুথিকা আরাম চৌকিতে দেহ-যষ্টি ঈষৎ হেলাইয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি বিষণ্ন স্বরে বলিল,—"আর পারি না! অসহ্য বেদনা। ডাক্তারবাবু, এমন করিয়া আর কত দিন যাইবে?"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন যুথিকা, তোমার আবার কি হইয়াছে?"

যু। ডাক্তারবাবু, তুমি আমি ভিন্ন বাসায় থাকি, ইহা আমার সহ্য হয় না। তোমাকে মুহূর্ত্ত বিদায় দিলে বড়ই কষ্ট হয়।

দা। যুথিকা—প্রাণতমে! তবে আমি কি বাসাবাড়ী উঠাইয়া দিয়া তোমার এখানে থাকিব? অথবা তুমিই আমার বাসায় গিয়া থাকিবে?

যু। হাঁ, ভাল কথা! তোমার সে ভাইটির নাম কি? ও—মনে হইয়াছে,—পাঁচকড়ি! তাঁহাকে তুমি বাড়ী পাঠাইয়া দিলে কেন?

দা। সে তেমন লেখা পড়া জানে না;—বাড়ী গেলে সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম্ম দেখিতে পারিবে। চাকুরী-বাকুরীও করিতে পারে না।

যু। না পারুক—কিন্তু বেশ সরল ও বুদ্ধিমান্। তাকে অমন বাজে কাজে না রাখিয়া যেমন হউক একটা কাজ-কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করান উচিত। আমি তাকে বড় স্নেহ করি। তা' তোমার সম্বন্ধের গুণেই হউক, আর তার সরলতা গুণেই হউক। যাক্,—আমি যে কথা বলিতেছিলাম। তোমাতে মজিয়াছি ডাক্তারবাবু,—তুমি আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছ, এখন উপায় কি? আমার একটি কথা রাখিবে কি?

দা। সে কি যুথিকা,—তোমার কথা আমি রাখিব না? এ প্রাণ কেবল তোমারি জন্য—

যু। আমি তা' জানি। জানি বলিয়াই এমন মরণ মরিয়াছি; কথা কি জান ডাক্তারবাবু, এখানে যদি আমরা এক বাসায়—একত্রে বাস করি, লোকে বড় নিন্দা করিবে। এখনই অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিতেছি,—উভয়েই চাকুরী ত্যাগ করিয়া চল, কলিকাতায় যাই।

দা। তার পর?

যু। তার পর কি? মনের কষ্ট দূর হইবে,—সেখানে উভয়ে এক বাসায় থাকিব। সংসার চলিবে কি করিয়া? তার জন্য ভাবনা কি? আমার প্রায় পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে,—বিক্রয় করিয়া, ঐ টাকা দিয়া একটা ঔষধালয় খুলিও। আমাদের কি চলিবে না?

দানীশ ভাবিল—যুথিকা, তোমার এত প্রেম! আমার জন্য তোমার এত স্বার্থ ত্যাগ!

বলিল,—"যুথিকা, তুমি এত ভালবাস,—তোমার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে—তাহাই হইবে।"

যু। হইবে নয় ডাক্তারবাবু, এই মাসেই নোটিস দাও, আমিও দেই। আগামী মাসে আমরা উভয়েই কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইব।

দানীশচন্দ্র পুলকিত প্রাণে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এবং কলিকাতার বাস সম্বন্ধে আরও নানাবিধ পরামর্শ আঁটিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

যুথিকা সে পরামর্শের মধ্যে একথাও বলিয়া রাখিল যে ডাক্তার-

খানার তত্ত্বাবধান জন্য পাঁচকড়িকে আনিতে হইবে। দানীশ বুঝিলেন, তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া পাঁচকড়িকে যুথিকা বড় স্নেহ করে।

দানীশচন্দ্র চলিয়া গেলে, যুথিকা উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল,—পাঁচকড়ি, প্রাণের পাঁচকড়ি, তোমাকে লাভ করিবার জন্য আর এক নূতন কৌশলের সৃষ্টি করিলাম। আমার কষ্ট-সঞ্চিত অর্থ রাশির মায়া পরিত্যাগ করিলাম,—তুমি এ চির-শান্ত-হৃদয়ে যে আগুন জ্বালাইয়াছ, তুমি ব্যতীত তাহা মিটিবে না। তোমাকে আমার বাসায় রাখিব—যেরূপেই পারি, তোমাকে আমার করিব—অবশেষে দানীশকে দূর করিয়া দিব। সে কাজে এখানে অনেক আপদ বিপদ থাকিতে পারে, তাই তোমাকে পূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় চলিলাম। কঠিন, নির্দ্দয়, পাষাণ;—এত জানিয়াও কি আবার তেমনি করিয়া পরিত্যাগ করিবে।"

তারপর সে নিস্তব্ধ হইয়া একবার চারিদিকে চাহিল। কোথাও কেহ ছিল না,—কেবল দেওয়ালের ঘড়িতে শব্দ হইতেছিল।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন শ্রাবণ মাসের শেষ বেলায় গাড়ী হইতে নামিয়া পাঁচকড়ি বাড়ী চলিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে সাত আনা মূল্যের একটি ছোট ঢোলক,—শচী বাজাইবে। বাম হস্তে একটি পুঁটুলী—তন্মধ্যে কয়েকখানি নূতন বস্ত্র, শচীর একটা জামা, একজোড়া জুতা ও একটা বাঁশী।

পাঁচকড়ি মজঃফরপুরের ষ্টেশন হইতে যাঁহাদিগের সহিত কলিকাতায় গিয়াছিল,—তাঁহারা সকলেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র। পাঁচকড়ির সহিত আলাপ আপ্যায়িতে এবং পাঁচকড়ির গানে তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পাঁচকড়িকে আপনাদের সহায়রূপে কিছুদিন রাখিয়া তৎপরে পাথেয়স্বরূপ কুড়িটি টাকা দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচকড়িও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতায় দীর্ঘদিন সুখ-সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়া বাড়ী ফিরিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া পাড়ার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, পাঁচকড়ি তাহাকেই শচীর কথা জিজ্ঞাসা করিল, এবং সে ভাল আছে শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

সে কোথাও দাঁড়াইল না—মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী চলিল। কত দিন যে সে শচীকে দেখে নাই। যাইবার সময় যে, সে শচীকে কোলে লইতে পায় নাই। যাইতে

যাইতে একবার তাহার সারা প্রাণখানি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মেজবউ যদি শচীকে কোলে লইতে না দেন! তবে পাঁচকড়ির বাড়ী গিয়া কি ফল! শচীই যে, তাহার প্রাণের বন্ধনী—শচীই যে, তাহার সংসারের সর্ব্বস্ব। আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তাই কি হইতে পারে! মেজবউ এতদিনও কি তাহাই মনে করিয়া বসিয়া আছেন! মানুষের রাগ হয়,—তাই কি এতদিন থাকে! আমার ভাইপো,—আমার বংশধর—আমার বুকের ধন, আমি কোলে লইতে পারিব না কেন?

পাঁচকড়ি হন হন করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল, এবং প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"শচী!"

শচী উত্তর দিল না। পাঁচকড়ি পুনরপি ডাকিল। নিস্তার বাহির হইয়া বলিল,—"কে ছোট বাবু বাড়ী এসেছো! শচী ঘুমিয়েছে। চল চল—কত্তামা, এই তোমার কথা বলে ভাব্‌ছিলেন।"

পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"মেজোবউ কোথায়?"

নিস্তার ইঙ্গিতে জানাইল, সে কথায় কাজ নাই,—কত্তামার ঘরে চল, সব জানিতে পারিবে।"

পাঁচকড়ি আর কোন কথা না বলিয়া, মাতার গৃহে গমন করিল,—ততক্ষণ বড়বউ, ন'বউ, ও কর্ত্রীঠাকুরাণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই দানীশের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঁচকড়ি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। শুনিয়া মাতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ন'বউ বসিয়া পড়িল।

পাঁচকড়ি আপনার অবস্থা বলিল, তারপরে পুটুলি খুলিয়া তিন বৌর তিনখানা ও মায়ের একখানা, এই চারিখানা কাপড় বাহির করিয়া দিল। মা আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"বড় আগুনে

বড় জল দিয়াছিস্ বাবা, আমাদের একবারে কাপড় নাই। পয়সা কিছু আনিতে পারিয়াছিস্ কি ?”

পাঁচকড়ি শুষ্ক হাসি হাসিল। বলিল,—“আমি কি পয়সা আনিবার মানুষ! বাবুরা দয়া করিয়া কুড়িটি টাকা দিয়াছিলেন,—কাপড় চোপড় কিনিয়া, রেল ভাড়া দিয়া সাত টাকা নয় আনা আছে, এই নাও।”

জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া বড় বধূর দিকে ফেলিয়া দিল। তারপরে জিজ্ঞাসা করিল,—“হ্যাঁ মা, মেজবৌ শচীকে আমার কাছে আসিতে দেবেন ত? না দিলে কিন্তু আমি কিছুতেই শুনিব না। কতদিন তাকে কোলে লই নাই।”

মাতা বলিলেন,—“কি জানি বাবা; তোর দাদা বাড়ী এসেছেন।”

পাঁ। তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার চল্‌চে ?

মা। পৃথক হ'য়ে খাওয়া-দাওয়া হ'চ্চে।

পাঁ। সত্যি ? দাদা এসেও গোলযোগ মিটান নাই ?

মা। মিটাবেন, না আরও পাকিয়েছেন। পৃথক্ হওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে।

পাঁ। তুমি কিছু বলনি ?

মা। বাকি রাখি নাই। উত্তরে বলিলেন,—‘মানুষটাকে তোমরা সকলে মিলে ক্ষেপিয়ে তুলেছ, এখন আমি আর কি করিতে পারি!’ তা' পৃথক্ হ'য়ে সুখী হয়, হোক্।

পাঁ। তোমাদের খরচ-পত্র দিচ্চেন ?

মা। আমার খোরাকী বাবদ মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দিবেন।

পাঁ। বৌ দিদিদের ?

মা। না, তা দেবেন কেন ?

পাঁ। কে দেবে ?

মা। ভগবান।

পাঁ। যাক্, অত ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে পাগল হইবার প্রয়োজন কি ? শচী ঘুমথেকে উঠলে হয়, একটু কোলে নিয়ে বাঁচি। জামা পরিয়ে, জুতা পরিয়ে, ঢোলটা তার কাঁধে দিলে, ভারি খুসি হবে—না মা ?

মা। তা'ত হবে—এখন তোর কাছে দিলে হয়।

পাঁ। দেবেন না ?

মা। কি জানি !

পাঁ। দেবেন বৈ কি ! আমি তার কাকা,—সে আমার সর্ব্বস্বধন ! তাকে আমার কাছে দেবেন না ? আমি মেজবৌর কাছে অপরাধ ক'রে থাকি, তিনি আমাকে গালি দেবেন—শচীকে আমায় দেবেন না কেন ? শচী কি তাঁর ? আমার নয় ?

এই সময় শচীকে কোলে করিয়া নিস্তার বাহিরে আসিল। দূর হইতে দেখিয়া পাঁচকড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার স্নেহ-বাহু প্রসারণ করিল। সুপ্তোত্থিত বালক বহুদিন পরে ছোটকাকাকে দেখিয়া অভূতপূর্ব্ব ভাবে উল্লাসিত হইল, এবং ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে আসিয়া ক্ষুদ্র বাহুযুগলে সজোরে কাকার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। পাঁচকড়ি তাহার মুখকমলে শতচুম্বন করিয়া, যে গৃহে ঢোলক ও জামা জুতা ছিল, তথায় আসিতেছিল, কিন্তু পারিল না।

গৃহমধ্য হইতে মেজবৌ সে দৃশ্য দেখিয়া দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিস্তারকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন, ও তৎক্ষণাৎ শচীকে লইয়া তাঁহার নিকট দিবার জন্য আদেশ করিলেন।

যতীশচন্দ্র নিস্তারকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কাকার নাম ক'রে যাকে ডেকে আন্‌ত।"

নিস্তার চলিয়া গেলে। পার্শ্বের জানালার ধারে আসিয়া মেজবৌ দাঁড়াইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই যতীশের মাতা আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন, এবং বিষ্ণুচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরপো কি আমাকে ডেকেছ?"

বিষ্ণুচন্দ্র হাতের হুঁকা পার্শ্বের দেওয়ালে হেলান দিয়া রাখিয়া বলিলেন,—"হ্যা বৌ, আমি আসিয়াছি; অনেকদিন তোমাদের সংসারের খবর-টবর লই নাই;—পরস্পর অনেক কথা শুনি; তাই একবার এলাম।"

যতীশচন্দ্রের মাতা বলিলেন,—"জগতে তেমন লোক আমাদের আর নাই! সংসারের খবর শুনিয়া কি করিবে ঠাকুর পো; এখন আমার মৃত্যু হইলেই হাড় জুড়াইত।"

তাঁহার চক্ষু পুরিয়া জল আসিল।

বিষ্ণুচন্দ্র যতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দানীশের কোন সংবাদ পাইয়াছ?"

য। কি জানি, পেঁচো সেখানে গিয়াছিল,—কা'ল এসেছে। আমি সব শুনিও নি।

বি। কেন, তোমার ভাই—বিশেষ আর একভাই সেখান হইতে আসিল, তুমি কোন খবরই নিলে না?

য। আমি আর ওসব খবরের মধ্যে নই।

বি। কেন, যোগধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে সংসারের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াছ না কি?

য। প্রায় তাই,—আমি সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। দু'এক-দিনের জন্য বাড়ী আসি, দুটো খাই—আবার যেখানকার মানুষ সেই খানে চলিয়া যাই।

বি। কোথায় খাও? তোমার মায়ের নিকট?

য। না।

বি। তবে? স্ত্রীর কাছে?

য। হুঁ।

বি। কেন?

য। কি করি?

বি। কি করি কেন? যদি স্ত্রী মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একত্র থাকিতে অস্বীকার করে, পৃথক্ হোক্—তাহাকে মাসিক বৃত্তি দাও—তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কাছে থাকনা কেন?

যতীশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন,—"তোমার মা কি খান?"

য। আমি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দেই।

বি। গুদামভাড়া? ভাল,—তোমার বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ন'ভ্রাতৃবধূ এবং অন্যান্য সকলে কি খায়?

য। আমি জানিব কি প্রকারে? সকলের সঙ্কুলান করা আমার অবস্থায় কুলায় কৈ?

বি। ছিঃ ছিঃ, যতীশ; "তুমি মানুষ হইয়া কথাটা মুখে আনিতে তোমার লজ্জা করিল না! কুলায় না বলিয়া তাহারা শুকাইয়া মরিবে—আর তুমি ও তোমার স্ত্রী সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে, পরিবে, খাইবে! যাহা আন, তাহাই ভাগ করিয়া খাও—একবেলা সকলে উপবাস দাও, একবেলা খাও, সেই ত হিন্দুর ছেলের কাজ।"

য। তাহাইত হইতেছিল,—

বি। বন্ধ হইল কেন?

য। একটা লোককে সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। একটু সহ্য করিয়া গেলেই কোন গোল হইত না।

বি। সে একটা লোক কে? তোমার স্ত্রী বোধ হয়? তা' একটু সহ্য করিয়া যাওয়ার উপদেশ অপরকে না দিয়া, তাঁহাকে দিলে না কেন? তিনি তোমার স্ত্রী—অপরের উপর অপেক্ষা তাঁহার উপর তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

যতীশ চন্দ্র কথা কহিলেন না।

বিষ্ণুচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,—"আমি শুনিলাম, কা'ল পাঁচু আসিয়া তোমার ছেলেকে কোলে লইয়াছিল, কিন্তু মেজবৌমা, তাহা লইতে দেন নাই। কেন,—তাহা হইল কেন? পাঁচু তাহাতে প্রাণে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছে জান—বুঝিতে পার?

য। তা' যার ছেলে সে যদি নাই নিতে দেয়, তবে অত কাড়া-কাড়িই বা কেন?

বিষ্ণুচন্দ্র বিদ্রূপের উচ্চ হাসি হাসিলেন। বলিলেন,—"যতীশ, তোমাকে আগে মানুষ বলিয়া ধারণা ছিল; আজ জানিলাম, তুমি একটা আস্ত জন্তু—বদ্ধ বানর! হায়, রমণী কি ভয়ঙ্করী! যাক্, আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা শোন"—

য। কি বলুন?

বি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, এবার তোমার মহলের এই গোলযোগে তুমি প্রায় দুই তিন হাজার টাকা উপরি রোজগার করিয়াছ,—কেমন সত্য কি না?

য। আজ্ঞে না! ওটা কি জানেন—পরের ধন সকলেই বেশী দেখে!

বি। না হোক্, কিছু কম হবে। কিন্তু তোমার মাকে তাহা হইতে পাঁচশত টাকা দিতে হইবে। উনি সেই টাকা দিয়া পাঁচু দ্বারা লাঙ্গল করাইয়া—ব্যবসা করাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

য। আজ্ঞে এত টাকা—

বি। এ তোমাকে দিতেই হইবে।

য। আমি একথার উত্তর আজ দিতে পারিলাম না—কাল দিব।

"ভাল তাহাই হইবে। কিন্তু আমার কথার উত্তর না দিয়া কাল যেন চলিয়া যাইও না।"—এই বলিয়া বিষ্ণুচন্দ্র দাবা হইতে নামিয়া চলিয়া গেলেন।

যতীশচন্দ্রের মাতাও ধীরে ধীরে রন্ধন গৃহাভিমুখে গমন করিলেম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যতীশচন্দ্র গৃহমধ্যে গমন করিলেন,—মেজবৌও জানেলার পার্শ্ব হইতে যতীশচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে গমন করিলেন, এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"যত খোসামুদে মিন্সেরা আসেন কেবল ওদের দাও,—টাকা যেন গাঙের জল।"

যতীশচন্দ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি সব শুনেছ নাকি?"

নথ নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া গৃহিনী বলিলেন,—"শুন্‌বো না কেন? যেমন গাঁ, তেমনি ভদ্রলোক—তেমনি বিচার!"

য। সে কথা ঠিক। এখন বিষ্ণুকাকা যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার কি?

গৃ। কি, টাকা দিবার কথা?

য। হাঁ।

গৃ। এক পয়সাও না। টাকা আমাদের, আমরা দিব কেন? না দিলে উনি কি করিবেন?

য। কি আর করিবেন; কিন্তু—

গৃ। কিন্তু কি? দেবে? তা দাও,—আমার শচীর হাতে টুক্‌নি দাও। তুমি কি আমার কচি ছেলের কথা একবারও মনে ভাব না। ষাটের ও আমার কি খেয়ে মানুষ হবে? আমি এক পয়সাও দেব না,—তা' যাহাই ঘটুক!

য। শোন বলি,—দশেও নিন্দা করিতেছে, একটু ধর্ম্মেরও হানি

হইতেছে। এবার প্রায় তিন হাজার টাকার উপরে আনিয়াছি,—তাহা হইতে শো তিনেক টাকা দাও। তাই ভেঙ্গে লাঙ্গল গরু করিয়া পেঁচো একরূপ করিয়া চালাক্।

গৃ। এক পয়সাও না।

য। আহা, ওদের বড় কষ্ট হইয়াছে! পেঁচোর কথা শুনিয়া তখন বাস্তবিকই আমার প্রাণ বিচলিত হইয়াছিল,—

গৃ। ওরে আমার দয়ার সাগর রে!—না আমি এক পয়সাও দিব না। আমার শচীকে এক মুঠা মুড়ী দিবার লোক নাই। আজ যদি ওরা রাজা হয়, আমার শচীর কি! শচী আমার যে কাঙ্গালের ছেলে, সেই কাঙ্গালের ছেলে থাকিবে! তুমি একটি পয়সাও বাজে খরচ করিতে পারিবে না।

যতীশচন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কথা মিথ্যা নয়—আজ যদি আমি মরিয়া যাই, বা ব্যায়রামে পড়ি, শচীকে কে দেখিবে? তবে ওরা বড় কষ্টে পড়িয়াছে,—আমার সিন্ধুকে টাকা বোঝাই, অথচ আমার মা-ভাই এক মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে! কিন্তু কি করিব—গৃহিণী যাহা বলে, তাহাও মিথ্যা নয়—শচী আমার কি খাইয়া মানুষ হইবে!

পার্শ্বের কুঠারীতে শচী নিদ্রা যাইতেছিল,—সে এই সময় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রীতে ছুটিয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন।

সে গৃহে একটি মৃৎ প্রদীপ টীপ্ টীপ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে ক্ষীণ আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয় নাই। শচী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“ও বাবা!—উহুঃ—দ'লে গেল, পুলে গেল। আমাকে মেনি কাম্‌লে দিয়েতে।”

'মিনি' শচীর পোষা বিড়াল। শচী আকুলভাবে কাঁদিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিল! সে যেন ভীষণ যাতনার হৃদয়ভেদী আৰ্ত্তনাদ!

যতীশচন্দ্র তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং আলোর কাছে লইয়া দেখিলেন, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গোড়ায় কামড়ের দাগ,—ঝর্ ঝর্ ধারায় রক্ত ঝরিতেছে!

ছেলে ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিল। মুখ চোখ নীলবর্ণ হইতে লাগিল। যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"দেখত, বিছানায় বিড়ালটা আছে কি না!"

মেজবৌ তাড়াতাড়ি প্রদীপ লইয়া শয্যাপার্শ্বে গেল, এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল,—কৈ, বিছানায় ত বিড়াল নাই। তক্তাপোশের নিচে দেখিল,—দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! এক ভীষণ বিষধর সর্প. তক্তাপোশের পায়া জড়াইয়া গর্জ্জন করিতেছে!

যতীশচন্দ্র তাহা দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে সর্পদষ্ট পুত্র ক্রোড়ে করিয়া বাহির হইলেন, মেজবৌও কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

যতীশচন্দ্র বাহির হইয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"পেঁচো, পেঁচো, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে রে। শচীকে সাপে কাম্‌ড়েছে।"

পাঁচকড়ি পাড়া হইতে আসিয়া চিড়া ও গুড় খাইতে বসিয়াছিল। সে গালের চিড়া দূরে ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ওঝা ডাকিতে বাগ্দী পাড়ায় ছুটিয়া গেল।

রামা বাগ্দী সাপের বড় ওঝা,—পাঁচকড়ি তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল। কিন্তু তখন শচীর দেহে প্রাণ ছিল না,—শচী-পাখী তখন শিকলি কাটিয়া কোন্ অজানা দেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে!

বাড়ীর সকলে তাহার পার্শ্বে পড়িয়া আছাড় খাইয়া খাইয়া কাঁদিতেছে! কিন্তু হায়! যে যায়, সহস্র ক্রন্দনেও সে আর ফিরিয়া চাহে না।

পাড়ার দশজন আসিয়া জুটিল এবং স্নেহ করুণার অধীর, শচীর কচি দেহ তাহার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসিল।

সর্পদষ্ট দেহে আগুন দিতে নাই—জলে ভাসাইতে নাই, শ্মশান-তটে রাখিয়া আসিতে হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তখনও নিশার অন্ধকার মর্ত্ত্য ছাড়িয়া যায় নাই। আকাশের গায়ে প্রভাহীন দুই চারিটি তারকা তখনও বিরাজ করিতেছিল। তখনও নিশাচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। তখনও নিশাচর বাতাস ঊষার আগমন অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল।

এই সময় পাঁচকড়ি ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া শ্মশানতটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বুঝি শচীকে খুঁজিতে আসিয়াছিল,—গতরাত্রে সে দেহ যে, এই স্থানে ফেলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোথায়? সর্ব্বত্র শূন্য!

শ্মশান-তট ধৌত করিয়া নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। শূন্য বায়ু হো হো করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে শবভূক্ শৃগাল-কুক্কুর কলরব করিতেছে! 'শচী—প্রাণাধিক শচী; কত দীর্ঘ দিন যে তোমায় কোলে লই নাই বাপ;—একবার কি আসিবে না? বুক যে, একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে!'—পাঁচকড়ির নীরব বক্ষ হইতে নীরব ভাষায় এই কাহিনী উঠিয়া দিগন্ত ভাসিয়া গেল। কেহ তাহার উত্তর করিল না,—কেহ সে কথা কাণে করিল না।

পাঁচকড়ি এত ডাকিল, তবু কেহ সাড়া দিল না। তখন তাহার মনে হইল, শচীহীন জগতে থাকিয়া লাভ কি! সে সংসার ত্যাগ করিয়া গেল,—আমরা কি পারি না! ঐ যে জলরাশি, উহার তলে শুইলে সকল জ্বালা শীতল হয় না? আত্মহত্যার পাতক হইবে? পাপ? পাপ কি? পাপের জ্বালা? এ জ্বালার চেয়ে সে জ্বালা কি বেশী? কেহ চাহিয়া দেখিল না—এ বুকে কত জ্বালা জ্বলিতেছে! হা ভগবান্!

তুমি না মঙ্গলময়,—তোমার রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন? শচীকে হারাইতে হয় কেন?

সে কথার উত্তর আসিল। ওপারের কূল হইতে কে যেন মেঘমন্দ্র স্বরে ডাকিয়া বলিল,—"এই ধ্বংসনীতি নিষ্ঠুরতার কারণ নহে! এই সংহারে দয়া ভাসিয়া উঠে—হাহাকার ছুটিয়া চলে। ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হয় না!"

পাঁচকড়ি কাতর কণ্ঠে বলিল,—"আমার প্রাণের তার ছিন্ন করিয়া, আমার সুরভরা বীণা ভাঙ্গিয়া দিয়া কি লাভ হইল?"

উত্তর হইল,—"তুমি আমি কেন গো? জড় ও অজড় সর্ব্বত্র সমান বিধি! শোক কেন? কে আসে, কে যায়? ভ্রান্তি সব—ভুলিয়া যাও।"

"কাহাকে?—শচীকে? তাকি ভোলা যায়? সে যে, আমার সর্ব্বস্ব!"

"মিছে কথা! যখন আসিয়াছিল, তখন ডাক নাই,—ডাকিলেও আসিত না। এখন গেল, যাইতে বল নাই, বলিলেও যাইত না। যাওয়া আসা—ভুল!"

"তবে শচী,—প্রাণের শচী, একবার দেখা দিয়া যা। একবার কোলে উঠে যা,—তোর মা যে, আমায় তোরে কোলে লইতে দেয় নাই!"

ঠিক এই সময় পাঁচকড়ির পশ্চাতে কে একজন হন হন করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে পাঁচকড়ি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই; তারপরে চিনিল—সে তাহার মেজদাদা।

"তোর মা যে, আমায় তোরে কোলে লইতে দেয় নাই!"—"প্রাণাধিক, পাঁচকড়ি,—এত ভালবাসতিস্? আয় ভাই, আজ

আমরা এক তীর্থের যাত্রী এক দেবতার দর্শনার্থী। আর ওকথা তুলিস্ না।”

যতীশচন্দ্র ভ্রাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। পাঁচকড়িও কাঁদিতে লাগিল।

তারপরে দুই ভ্রাতায় বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

যতীশচন্দ্র মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—“যার জন্যে সঞ্চয় করিতেছিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। বুঝি তাহার কাকা-কাকীদের ফাঁকি দিতেছিলাম—বুঝি তাহাকে একা ভোগ করিব বলিয়া বিভাগ করিতেছিলাম—তাই সে বংশের তিলক, সকলের নিধি, আমায় একার হইয়া থাকিল না—আমারই পাপে চলিয়া গেল! আর না মা,—আজ পেঁচোকে ও আমাকে একত্রে ভাত দাও, খাইয়া জন্মের মত চ যেখানে চাকুরী করি, সেই স্থানে চলিয়া যাই—যাহা পাইব, মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব। শচীহারা বাড়ীতে আর ফিরিব না।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যতীশচন্দ্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে তিন চারি দিন চাকুরী স্থলে যাইতে দিলেন না।

এই তিন চারি দিন মধ্যে তাঁহাদের সংসারের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

যতীশচন্দ্র আর পৃথক্ থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। মেজবৌ পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও আর সে বিষয়ে লক্ষ্য করিলেন না। তখন সকলেই আবার পূর্ব্ববৎ একান্নবর্ত্তী হইলেন। ন'বৌ প্রাণপণে পুত্রশোকাতুরা মেজ জায়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

শচীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মেজবৌর বিধবা ভ্রাতৃবধূ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুত্র রামসেবককে লইয়া সে দিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যতীশচন্দ্র গৃহমধ্যে বসিয়া পুত্রশোকাতুরা পত্নীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার শ্যালক-পত্নী ও শ্যালক-পুত্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুত্রহারা রমণী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রামসেবকের মাতাও চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিলেন।

মেজবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বৌ, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমার ঘর শূন্য—কোল শূন্য—বুক শূন্য।"

রামসেবকের মাতা বহুপ্রকার উপমা ও পৌরাণিকী কথার অবতারণা করিয়া ননদকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তৎপরে উপসংহারে রামসেবকের হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহার ক্রোড়ের সমীপে

বসাইয়া দিয়া বলিলেন,—"উদর আর সহোদর বিভিন্ন নয়; এই তোমার ভাইয়ের ছেলে—একেই নিজের ব'লে কোলে নাও। আ'জ হ'তে তোমার—আমার নয়।"

মেজবৌ সে কথার আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন না। যতীশচন্দ্র বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। নিস্তারিণী আসিয়া রামসেবক পরে রামসেবকের মাতাকে রান্নাঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

আহারের সময় যতীশচন্দ্র মাতাকে বলিলেন—"মা" যাহা অদৃষ্টে ছিল, হইয়া গেল। আমি আর শচীশূন্য বাড়ীতে স্থির থাকিতে পারিতেছি না, সেজন্যও বটে, আর মহালে নানাবিধ গোলযোগ, সেজন্যও বটে;—আ'জ শেষ রাত্রে চলিয়া যাইব,—হাঁটিয়াই যাইব কারণ, আমাকে ম্যানেজারের বাড়ী হইয়া যাইতে হইবে; তিনি বাড়ী আসিয়াছেন।

মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবে আস্‌বি আবার?"

য। তা' এখন বলিতে পারি না। বোধ হয় আর আসিব না।

মাতা। বালাই! অমন কথা মুখেও আনিও না।

য। পূজার মধ্যে আর আসা হ'বে না। কার জন্যই বা আসিব। সে নাই—যাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিত। এখন একটা কথা বলিয়া যাই।

মা। কি বল্?

য। পেঁচোর একটা বিবাহের যোগাড় কর। আমার আশা আর করিও না—বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ক্ষিতীশকে বাড়ী আনাইবার চেষ্টা দেখ। রামসেবক আর রামসেবকের মা আসিয়াছে.—বোধ হয় শীঘ্র যাবে না। সেজন্য তোমরা কিছু বলিও না। আর আমার সঞ্চয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই—যাহার জন্য সে আয়োজন

ছিল, সে ফাঁকি দিয়া পালাইয়া গিয়াছে। এখন আমি মাসে মাসে যাহা পাইব, তাহা দ্বারাই সংসার চলিয়া যাইবে।

মা। তোমরা যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, তাহাই হইবে। তবে অত উতলা হইও না,—সকলি ভগবানের হাত।

য। ভগবানের দোষ কি মা? সবই জীবের কর্ম্মফল!

লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিধাতার কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। মনুষ্য-বুদ্ধি সে গূঢ় রহস্যের দুর্ভেদ্য যবনিকা অপসারিত করিতে পারে না।

পুত্রশোক-সন্তপ্ত যতীশচন্দ্র গৃহিনীকে বুঝাইলেন,—"আমরা অতি ক্ষুদ্র। আমরা সংসারের প্রত্যেকের স্নেহাস্পদ, কুলতিলক নিধিকে সকলের স্নেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম,—বুঝি তাই সে ব্যথিত-বিরক্ত হইয়া আমাদের স্নেহ-নীড় ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে! আর না—সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবনের বাকি গণা দিন কটা, কাটাইয়া দাও।"

মেজবৌ তাহাতে অস্বীকৃত হইল না।

তারপর শেষ রাত্রে উঠিয়া যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে ডাকিলেন। বলিলেন,—"যতক্ষণ ভোর না হয় আমার সঙ্গে চল্। ভোর হইলে, তুই ফিরিয়া আসিস্। একটু রাত্রি থাকিতে না গেলে, রৌদ্রে কষ্ট পাইতে হইবে।"

পাঁচকড়ি মোটা একগাছা বাঁশের লাঠি লইয়া দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দুই ভ্রাতাই নীরব,—দুইভ্রাতাই হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ বেদনা লইয়া পথ বহিয়া চলিয়াছেন। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে ঝিল্লির তান-লয়হীন করুণ রব তাঁহাদের ভগ্নহৃদয়ের বেদনাকে সুপ্ত হইতে দিতেছে না। সেই পথ কত যুগ-যুগান্তরের অতীত স্মৃতি বক্ষে

লইয়া পড়িয়া আছে ; গ্রাম্য চৈত্য-বৃক্ষ তেমনই মাথা তুলিয়া মূকভাবে অতীত জীবনের অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—সকলই তেমনই আছে ; কেবল তাঁহাদের হৃদয়ের সে সুখ-শান্তি নাই, সে প্রফুল্লতা পূর্ণতা নাই,—এখন তাহা শূন্য—জড়তা ও অবসাদে পূর্ণ !

ক্রমে তাঁহারা গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে উপস্থিত হইলেন। মাঠ ছাড়াইয়া নদী তীরের পথে পড়িলেন। তখন উষার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। চন্দ্রের রশ্মি মলিন হইয়া উঠিয়াছে,—নৈশ অন্ধকার উষার রক্তিম অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যালোক-ভয়ে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে ,আর উপরে সুনীলাকাশে প্রভাতের শুকতারা পৃথিবীর পানে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে যতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে বলিলেন,—"তবে তুই ফিরিয়া যা। ভোর হইয়া আসিল, আমি চলিলাম। সকলি থাকিল—যাহা রোজগার করিব, মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব।"

রুদ্ধকণ্ঠে, করুণ-কাতর স্বরে পাঁচকড়ি বলিল,—"আমার কাছে ! আমি সংসারের গুরু-ভার-সহনে অক্ষম। যা' ছিলাম—তাও নেই। পাগলের প্রাণের বন্ধনী শচী ছাড়িয়া গিয়াছে। বাড়াতে থাকিলে—শচীহীন বাড়ীতে থাকিলে বাঁচিব না। আমাকে না দাদা,—তুমি কর্ত্তা—তুমি দাদা, যাহা জান, করিও। আমি শীঘ্রই বাড়ী হইতে পালাইব।"

যতীশচন্দ্রের পুত্রশোক সন্তপ্ত হৃদয় অনুতাপের উষ্ণ অশ্রুতে গলিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"পাঁচু, ভাই ; এত দিন কি একটা ভ্রান্ত মোহ-জালে আমার নয়ন আচ্ছন্ন ছিল। তখন বুঝি নাই, মানুষের দুর্ব্বল শান্তির পশ্চাতে কল্যাণময় বিধাতার সামান্যমাত্র অঙ্গুলী হেলনে প্রতিকূল স্বার্থের নিষ্পেষণ, মানুষের কূটবুদ্ধি কোথায় ভাসিয়া যায় ! ভগবান্ আমার শচীকে কাড়িয়া লইয়া আমার জ্ঞান-

চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন—বুঝাইয়া দিয়াছেন—অত কেন ? স্বার্থান্ধ হইয়া একেলার জন্য সর্ব্ব-স্নেহাস্পদের যাবতীয় ভালবাসা কুড়াইয়া লইবে কেন ? দু'দণ্ডের মধ্যে যে, সে চলিয়া যাইতে পারে, তাহা ভুলিয়া যাও কেন ? যাহা কর্ত্তব্য—যাহা করিতে হয়, তাহা কদাচ ভুলিও না। ভুলিলে প্রত্যবায় ভোগী হইবে স্থির নিশ্চয় !"

"না ভাই, কোথাও যাস্‌না,—আমি তো'র উপর অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, শচীকে তোর কোলে দিতে দেয় নাই, তা' শুনিয়াও প্রতিকার করি নাই—অধিকন্তু, তার মতেই মত দিয়াছি ! আমার অপরাধ— সেই গুরু অপরাধ ক্ষমা করিস্।

"ক্ষমা—ক্ষমা কি দাদা ? আমি :তোমার ছোট ভাই"—পাঁচকড়ি আর কথা কহিতে পারিল না ! তাহার কম্পিত দেহ খানি বাহু বেষ্টন করিয়া যতীশচন্দ্র শিরশ্চুম্বন করিলেন।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিরাট অনন্ত সীমাহীন আকাশতলে সে দৃশ্য মধুর ! সে দৃশ্য পবিত্র ভ্রাতৃ প্রেমের অনন্ত ভাণ্ডারের এক অদ্বিতীয় চিত্র !

তারপরে অশ্রুভারাকীর্ণ নয়নে দুই ভাই দুই দিকে চলিলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের রৌদ্র অত্যন্ত উগ্র হইবার পূর্ব্বেই পাঁচকড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সমস্ত বাড়ী খানা যেন শচীর অভাবে হাহাকার করিতেছিল। বাড়ীর বৃক্ষ-লতা গুলাও যেন শচীর জন্য ম্লানভাবে কালযাপন করিতেছিল।

পাঁচকড়ি বাড়ী আসিয়া মেজবৌর নিকটে গমন করিল। তিনি তখনও শুইয়া ছিলেন। করুণস্বরে ডাকিয়া বলিল,—"বৌ, ওঠ। কাঁদিয়া ফল নাই, দেহপাত করিলেও সে মাণিক আর মিলিবে না—যদি মিলিত, পাঁচকড়ির নিরর্থক দেহ দানে এতক্ষণ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতাম।"

মেজবৌ উঠিয়া বসিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন,—"সে যে তোমার জন্য ছুটিয়া যাইত, আমি হতভাগিনী তাহাকে যাইতে দিতাম না!—তাই বুঝি—সেই রাগে সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। শচী! ফিরে আয় বাবা, তোর ছোট কাকা, তোর ঘরে এসেছে। আর আমি তোকে বাধা দেব না বাবা—একবার ফিরে আয় বাবা!"

কেহ সে কথার উত্তর করিল না। পাঁচকড়ির চক্ষু বহিয়া প্রবল জলস্রোত বহিল,—সে কোঁচার কাপড়ে চক্ষু ঢাকিল।

রামসেবকের মা তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাঁচকড়িকে বলিলেন,—"ও কি গো, এখন কি অমনি কোরে কাঁদাতে আছে! যা'তে ভুলে যায়, কোথায় তাই কোরবে, না আরও সেই সব কথা মনে জাগিয়া দিয়ে কাঁদাচ্চ? রামা—রামা, আয় তোর পিসির কাছে আয়—তোকে দেখে তবু প্রাণটা একটু যুড়াবে এখন। যাও গো, তুমি এখন বাহিরে যাও।"

পাঁচকড়ি চলিয়া গেল।

সেই দিবস ব্যবস্থা হইল, রামসেবক ও রামসেবকের মাতা স্থায়ী-ভাবে সেই বাড়ীতে থাকিবেন। রামসেবক তাহার পুত্রহারা পিসি মাতার পালক পুত্র হইবেন।

পাঁচকড়ি তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, পাঁচকড়ির মাতা বা অন্য কেহই সে কার্য্যে প্রীত হইল না। তবে মেজবৌর ব্যবস্থার উপরে কথা কহে, এমন কেহ সে বাড়ীতে ছিল না।

এই ঘটনার পনর দিন পরে পাঁচকড়ি দানীশের এক পত্র পাইল। পত্র কলিকাতা হইতে আসিয়াছে।

দানীশ লিখিয়াছে—

"অনেক দিন তোমাদের পত্র পাই নাই। পরস্পর শুনিলাম, দাদার ছেলে মারা গিয়াছে—বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু নিয়তির উপরে মানুষের হাত নাই। আমি এযাবৎ খরচ পত্র পাঠাইতে পারি নাই, তাহার অনেক কারণ আছে;—জীবনের উপর দিয়া অনেক আপদ বিপদ চলিয়া গিয়াছে। আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। এখানে একটি বড় রকমের ডাক্তারখানা খুলিয়াছি। একা সকল কাজ দেখিতে পারি না। বাড়ীতে তোমারও বিশেষ কোন কাজ নাই। পত্রপাঠ এখানে আসিবে। তুমি থাকিলে কাজ-কর্ম্মের খুব সুবিধা হইতে পারিবে। পরের উপরে বিশ্বাস করা যায় না; তোমার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। বাড়ীর খবর লিখিও। ইতি আশীর্ব্বাদক—

শ্রীদানীশ।

পাঁচকড়ি পত্র পড়িয়া সকলকে শুনাইল। মেজবৌ ভাল-মন্দ কোন উত্তরই করিলেন না। সংসারের কোন বিষয়েই তিনি ছিলেন

না—পুত্র-শোকাতুরা জননীকে কেহ সে বিষয়ে লিপ্ত করিতেও চেষ্টা করিত না।

পাঁচকড়ির মাতাও শচীর শোকে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে সকল দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইত। এত শোক-দুঃখের মধ্যেও সংসারটি যদি পুনর্গঠিত হয়, এই নব আশায় বুক বাঁধিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন—"ছেলেটার স্কন্ধ হইতে যদি অপদেবতা নামিয়া থাকে, তবু ভাল! তুই যা। মজঃফরপুর ছেড়েছে, এখন বোধ হয়, ভাল হবে।"

ন'বৌ কত দেবতার নিকটে কত প্রার্থনা করিল,—কত পূজা মানিল "মা কালীর পায়ে বুক চিরিয়া রক্ত দিব বলিয়া মাগো তাঁহার মতিগতি ফিরাইয়া দেও! হে হরি, তাঁহার সুমতি দাও, তোমার সওয়া পাঁচ আনার 'লুট' দিব! বাবা সত্য নারায়ণ, একবার অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাও—তোমার পাঁচ সিকার শিরনি দিব।"

তাঁহারা সেই সরলার কথায় এবং বুকচেরা একবিন্দু রক্তের—পাঁচ আনার বাতাসার পাঁচ সিকার শিরণির লোভে, তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে পাঁচকড়ির কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল। পাঁচকড়িও শচীহীন বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া স্থির হইতে পারিবে ভাবিয়া, আগ্রহ সহকারে সেই দিন রাত্রের গাড়িতেই কলিকাতায় রওনা হইল।

পাঁচকড়ি যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করিতেছিল, তখন ন'বৌর বড় ইচ্ছা করিতেছিল, বলিয়া দেয়—"একবার যেন তিনি এক দিনের জন্যও বাড়ী আসিয়া দেখা দিয়া যান।"—কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিল না! বুকের কথা, বুকেই মিলাইল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্ষিতীশ চন্দ্রের কাহিনীটা এই সময় একবার বলিতে হইল।

রামপুরের বাজার তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। মাসিক ছয় টাকা বেতনের জন্য প্রত্যহ বেলা সাড়ে নয়টার সময় তথায় গমন করেন, এবং রাত্রি আটটার পরে বাড়ী ফিরিয়া আইসেন। প্রত্যূষে উঠিয়া শ্যালকের আবাদের জমি তত্ত্বাবধারণ—মাঠে মাঠে ঘুরিতেন ;—তারপরে স্নান করিয়া কোন দিন উষ্ণান্ন, কোন দিন পর্য্যুষিতান্ন, এবং কোন দিন বা জলযোগ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া যাইতেন।

আজ রামপুরের হাট। সপ্তাহে দুই দিন এই হাট বসে। হাটের দিন তরকারী, মৎস্য, দাইল, চাউল প্রভৃতি দ্রব্য সে বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে, এবং নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক সকল কয়দিনের মত প্রয়োজনীয় তৈজস তরকারী সংগ্রহ করিয়া রাখে। প্রত্যহ বাজার বসে না, তবে দোকান থাকে, অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

রাত্রি প্রায় ন'টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি,—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; টীপ্ টীপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

সেই সময় স্কন্ধে একটা তরকারির মোট, হস্তে একটা মৎস্য, বগলে কতকগুলি রজকধৌত বস্ত্র লইয়া অতিশয় ক্লান্তদেহে ক্ষিতীশচন্দ্র রামপুরের হাট করিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিচরণ তখন বাড়ীর মধ্যে বসিয়া মাতা ও ভগিনীদিগের সহিত খোস গল্প করিতেছিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্রের নগ্নপদ—কর্দ্দমে সমাচ্ছন্ন ; পরিধেয়, উত্তরীয় বস্ত্র,

মস্তক—সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, সে মূর্ত্তি যদি ক্ষিতীশের মাতা বা ভ্রাতারা দেখিতেন, তাঁহাদের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত ;—কিন্তু হরিচরণ হাসিয়া ফেলিলেন। হরিচরণের মাতাও হাসিলেন। ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন,—"আ, আবাগীর বেটা, একরত্তি বুদ্ধিও ধর না।"

ক্ষিতীশের স্ত্রী ভ্রূকুটী করিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। কিন্তু কেহই সে ভার নামাইল না,—ক্ষিতীশচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। সেগুলি অতি কষ্টে নামাইতে নামাইতে করুণ-ব্যথিত-স্বরে বলিলেন,—"মা দুর্গে, তোর মনে আরও কি আছে, মা!"

হরিচরণ হাসিয়া বলিলেন—"কি হে, নিদেন ডাক কেন ?"

ক্ষিতীশচন্দ্র বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"অবস্থা যখন নিদেন, তখন নিদেন ডাক ভিন্ন আর কি হইবে বল !"

হ। তুমি নিতান্ত বোকা তাই, এত রাত্রি করিয়া কষ্ট পাইয়াছ। ও কি, পায় কি ?

ক্ষি। অন্ধকারে একখানা ইটে হুঁচোট লাগিয়া আঙ্গুলের আগাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

হ। আহা ; তামাক খাবে ?

ক্ষি। খাব বৈকি—রও আগে দম নেই।

হ। কি কি আন্‌লে ?

ক্ষি। মাছ, পটল, আলু্ সব এনেছি।

হ। আমার তা ?

"আমার তা" অর্থে 'অহিফেন'। হরিচরণ একটু একটু অহিফেন সেবন করিতেন।

ক্ষি। আনিয়াছি, কিন্তু অল্প।

হ। কতটুকু ?

ক্ষি। সিকি ভরি।

হ। এত কম কেন ?

ক্ষি। পয়সায় কুলায় নি। এ মাসের মাইনে প্রায় আগেই লইয়া শোধ করিয়াছিলাম,—তারপরে আজ যা সামান্য পেলাম, হাট-খরচেই গেল।

হ। তোমার ঐ দোষ,—আগেই সব খাইয়া বসিয়া থাক।

ক্ষি। ক্ষুধা বেশী।

হ। ধোবা বাড়ীর কাপড়গুলা আনিয়াছ ?

ক্ষি। হাঁ, আনিয়াছি।

হ। একটু তামাক খাও—তামাক আনিয়াছ ?

ক্ষি। আনিয়াছি—কিন্তু একটু রও, বুকটায় বেদনা ধরিয়া গিয়াছে। একটু পরে তামাক সাজ্‌চি।

হ। অমন আল্‌সে কেন তুমি,—আল্‌সে মানুষের কোন কালেই কিছু হয় না। তামাক সাজিয়া এক ছিলিম খাও—তারপরে হাত-পা ধুইয়া কাপড়-চোপড় ছাড়।

ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিলেন, হরিচণের অহিফেনের মৌতাত ধরিয়াছে ; এক ছিলিম তামাক সাজিয়া না দিলে অব্যাহতি নাই। অগত্যা তখনই তামাকু সাজিয়া নিজে একবার টানিয়া হুঁকাটী হরিচরণের হস্তে প্রদান করিলেন ; পরে হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন।

শ্বাশুড়ী বলিলেন—"আজ :আমাদের সব ঘোষেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, তোমারও ছিল। তা' তুমিত যাইতে পার নাই। অবেলায় খেয়ো, হরি বা শিবু কেউ রাত্রে খাবে না। একা তোমার জন্যে আর রাত্রে রাঁধা যায় না—তুমি দু'টো চিড়ে খাইয়া থাক। কি বল ?"

"তাই হ'বে।" ক্ষিতীশচন্দ্র মুখে এই কথা বলিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার জঠরানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল!

যথাসময়ে দুই মুষ্টি চিপিটক, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ গুড় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া শয়ন-গৃহে গমন করিলেন।

সেজবৌ গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আনিয়াছ?"

অতীব নম্র করুণ স্বরে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"না।"

"না? বেশ্!" এই কথা বলিয়া সেজবৌ এক লম্ফে শয্যাপরি উঠিলেন, এবং একটা বালিশ টানিয়া আছাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"যম, তুমি আমাকে রাখিয়া উপোস্ কর কেন? না, আমার মত পোড়াকপালীকে নিতে তোমারও অশ্রদ্ধা হয়? কত ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা যে আমি করেছিলাম, তা' ব'ল্‌তে পারি না! হা ভগবান্,—আমার পাপের কি শেষ নাই?"

এক নিশ্বাসে এতটি কথার অবতারণা করিয়া সেজবৌ শয্যার উপরে সটান ভাবে শয়ন করিলেন।

অতিশয় কাতরভাবে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন—"শোন, আমার কথাটাই শোন—আমার কোন অপরাধ নাই; আমার থাকিলে কি আমি তোমাকে একটা জামা আনিয়া দিতে নারাজ? কি করিব বড় কষ্টে আছি; ভগবান্ যদি কখন মুখ তুলিয়া চান, তবেই মনের দুঃখ যাবে, নচেৎ এ জীবনটাই বৃথা হইল!

"আর আদরে কাজ নেই—খুব আদর হোয়েছে। আমার পোড়া কপাল- আমি নেহাত বেহায়া, তাই তোমার মত লোকের কাছে জিনিষ চাই"—এই বলিয়া সেজবৌ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

ক্ষিতীশ বলিলেন,—"কি করিব, মাসে ছ' টাকা মাইনে পাই—

তাহা হইতেই হাট খরচ আমাকেই করিতে হয়। আট হাটে আট টাকার কমে হয় না,—তোমার দাদা একটি পয়সাও দেন না।"

পদদ্বয় পালঙ্ক-বক্ষে আছাড় দিয়া বিকৃত স্বরে সেজবৌ বলিলেন,—"তুমি আসল কলি। দাদা আমাদের দুটো মানুষের খেতে দিচ্ছেন, আর কোথায় তুমি এক পয়সার মাছ, দুটো বেগুন কি একটা কাঁচকলা এনে মাথা কিনিতেছ। তা বেশ্—সে আর তোমায় করিতে হইবে না। তুমি তোমার চেষ্টা দেখ,—আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

অতঃপর সেজবৌ ক্ষিতীশকে সে শয্যায় গিয়া অনর্থক সেজবৌর প্রাণে বেদনা দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। ক্ষিতীশও সাহস করিতে পারিলেন না।

ক্ষিতীশচন্দ্র শয্যায় স্থান না পাইয়া, কক্ষতলে বসিয়া অন্য পুস্তক অভাবে নূতন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়িতে লাগিলেন।

তারপরে সেজবৌ নিদ্রিত হইলে, শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিয়া কোনরূপে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে উঠিয়া হরিচরণ ক্ষিতীশচন্দ্রকে বলিলেন,—মাঠে মজুর যাইতেছে, কতক মজুরকে দক্ষিণ মাঠে আর কতক মজুরকে হাজরা-তলার মাঠে আইল বাঁধিতে দিয়া, তবে তুমি কাজে যাইও।"

ক্ষিতীশচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"দক্ষিণ মাঠে গিয়া মজুরদিগকে কাজ দেখাইয়া, বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আবার হাজরাতলার মাঠে গিয়া, মজুরদের কাজের বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতে বেলা দুপুর হইয়া যাইবে,—তারপরে কাজে যাইব কখন্? এ কয়দিনই বেলায় যাইতেছি বলিয়া, তাঁহারা বকিতেছেন।"

হ। তারা বকিলে আমি কি করিব,—এ কাজও ত দেখা চাই। ছ'টাকায় ত আর দু'টা মানুষের খাওয়া চলে না!

ক্ষিতীশচন্দ্র সে কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। একখানি চাদর স্কন্ধে করিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

বেলা দশটার পরে শ্রান্ত-ক্লান্ত-ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ মুখে যখন ক্ষিতীশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, বাটীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।—হরিচরণের বড় ভগিনীপতি আসিয়াছেন।

তাঁহার নাম রাইচরণ দে; তিনি ঢাকার একটা পাটের কলের ওজন সরকার। সে কার্য্যে অনেক চুরি, সুতরাং অনেক পয়সা রোজগার। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে। দেখিতে কদাকার, লেখাপড়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কিছুদিন করিয়াছিলেন মাত্র। লেখাপড়ায় যাহাই হউক, তিনি প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন করেন, তাঁহার স্ত্রীর অঙ্গে অনেক অলঙ্কার, কাজেই তাঁহার সম্মানও সমধিক

তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেক নর-নারী উপবিষ্ট। তিনি হাসিমুখে

সকলের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন করিতেছেন; হরিচরণের মাতা জামাতার আহারাদির উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র আসিয়া তৎপদে প্রণত হইলেন। রাইচরণ ক্ষিতীশের বিষয় চিঠিপত্রে সমস্ত অবগত ছিলেন। একটু হাসিয়া, একটু ব্যঙ্গের সুর বাহির করিয়া বলিলেন,—"কি ভায়া যে, কেমন আছ?"

ক্ষি। আজ্ঞে, একরূপ আছি ভাল।

রা। কোথায় গিয়াছিলে?

ক্ষি। মাঠে। কতকগুলা মজুর পাওয়া গিয়াছে, তাই তাদের কাজ দেখাইতে গিয়াছিলাম।

রা। তা বেশ্,—হরিবাবুর একটু সাহায্য করাত চাই।

ক্ষি। আপনার বাড়ীর সব ভাল?

রা। ভাল।

ক্ষিতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ী হুঁকা লইয়া তামাক সাজিলেন, নিজে ধূমপান করিয়া, রাইচরণের হস্তে হুঁকাটি প্রদান করিলেন। তারপরে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রান্নাঘরে গিয়া শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাত হইয়াছে?"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া শ্বাশুড়ী উত্তর করিলেন,—"এর মধ্যে ভাত হ'ল কি প্রকারে? জামাই এসেছে, দেখ্‌চোনা?—তোমার গায় মনুষের চামড়া একেবারেই নেই বাপু!"

ক্ষি। আমাকে যে এখনি বাজারে যাইতে হইবে।

শ্বা। তা' কি করিব! এক দিন নয় নাই গেলে!

ক্ষি। একটা বড় জরুরি কাজ ছিল।

শ্বা। তা' ব'লে আর হ'বে কি? ভাত হ'তে এখনও অনেক

দেরি। এই সবেমাত্র কেবল রাইচরণের সরু চাউলের ভাত চাপাইয়াছি। তারপরে মাছের ঝোল হ'লে, তোমাদের ভাত চড়্‌বে।

ক্ষি। সে এখনও অনেক দেরী। তবে আজ আর যাওয়া হইল না। জলখাবার কিছু আছে কি ?

শ্বা। না তাড়াতাড়িতে মুড়ী ভাজা হয় নাই,—একটু গুড় নাও, আর ঐ ঘটীটায় জল আছে, খাও।

ক্ষিতীশচন্দ্র গুড় ও জল খাইয়া, চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিলেন। সে দিন কাজে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইল; কারণ, তিনি জানিতেন, সে দিন কতকগুলি জরুরি কার্য্য ছিল। কিন্তু যাইবেন কি প্রকারে ? গত কল্য সেই দশটার সময় যে কয়টি অন্ন উদরে পড়িয়াছিল,—ক্ষুধায় তাঁহার শরীর তখন কাঁপিতেছিল।

রাইচরণ স্নান করিয়া ক্ষীর-সর-নবনীত ও কয়েকটি গোল্লার যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া, তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আগমন করিলেন। হরিচরণও স্নান ও জলযোগ করিয়া সেখানে আগমন করিলেন। পাড়ার শ্যামাচরণ, হরিদাস ও বিমলকুমার তথায় আসিয়া যুটিলেন। সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ক্ষিতীশচন্দ্রের উপরেই তামাক সাজিবার ভার অর্পিত হইল,—তিনি তামাক সাজিয়া আনিলেন। তারপরে তাসখেলা আরম্ভ হইল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে রাইচরণ ও হরিচরণের আহারের ডাক পড়িল। ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমিও যাইব নাকি ?"

উত্তর হইল—"না! তোমার এখনও হয় নাই।"

ক্ষিতীশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ম্লানমুখ অন্য দিকে ফিরাইলেন। রাইচরণ ও হরিচরণ উঠিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"ক্ষিতীশবাবুর আহার কখন হইবে ?"

[illegible]

[illegible]
[illegible] Sim a street [illegible]

ক্ষি। যখন পাইব।

বি। বুঝ্‌তে পাল্লে না, চাকুরে জামাই এসেছে, তাঁর আহারের উদ্যোগটা একটু ভালরকম আছে—সম্বন্ধীবাবুরও সেই সঙ্গে হবে। আর ইনি "গৃহ-পালিত" কিনা, ইহাঁর বুকুড়ীচা'লের ভাত—এখনও হয় নাই।

শ্যা। রাগ করিও না ক্ষিতীশ বাবু; তুমি লেখাপড়া জান,—বংশমর্য্যাদাও তোমাদের যথেষ্ট,—তুমি এখানে পড়িয়া থাক কেন? বাড়ীর ছেলে বাড়ী যাও,— ভাই ভাইতে বনিবনাও না হয়, পৃথক্ হইয়া বাস করিও; কিন্তু একি এ! এমন করিয়া অপমান হও কেন? শ্বশুরবাড়ীর গোলামী কি এতই ভাল লাগিয়াছে!

ক্ষিতীশ সে কথার কোন উত্তর করিলেন না।

তারপরে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাইচরণ বাবু ও তস্য শ্যালক হরিচরণ বাবু আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। হরিচরণ বাবু তখন ক্ষিতীশচন্দ্রকে বলিলেন,—"যাও তুমি আহার কর গে। হুঁকা-কল্কিটা হাতে করিয়া যাও, একটু তামাক সাজিয়া কল্কিটায় আগুণ দিয়া বুড়ীকে দিয়া হুঁকাটা পাঠাইয়া দিয়া, তুমি আহারে বসিও।"

অতি ম্লানমুখে ক্ষিতীশচন্দ্র হুঁকা লইয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন, এবং আদেশ পালন করিয়া আহারে বসিলেন।

তাঁহার জন্য মোটা চাউলের অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল। মৎস্যটা কল্য বড় কষ্ট করিয়া এবং নিজের পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া আনিলেও ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার এক টুক্‌রাও প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বুঝাইয়া বলিলেন,—"রাইচরণ অনেক দিন পরে আসিয়াছেন, মাছটা কা'ল আনিয়াছিলে, কাজে লাগিয়া গেল। কিছু ভাজা, কিছু ঝোল, কিছু অম্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হরি সঙ্গে বসিয়াছিল, কাজেই

তাহাকেও দু'একখানা দিতে হইল। ঝোলের দু'খানি মাত্র মাছ আছে, শিবু এয়োস্ত্রী মানুষ, সে দু'খানা তারই জন্য রহিয়াছে। আর সামান্য কয়েকখানা ভাজা আছে, তা' এবেলা রহিল। ও-বেলা মাছ পাওয়া যাইবে না—রাইচরণকে তাই ঝোল করিয়া দেওয়া যাইবে।"

এ যুক্তি ও বিচারের উপর অন্য কোন কথাই খাটে না, কাজেই ক্ষিতীশচন্দ্র ডাইল শাক চচ্চড়ি দিয়া যথাসম্ভব আহার করিলেন। গব্যদ্রব্য তিনি অন্য দিনও পান না,—অদ্যও পাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

রাত্রে আহারাদির পর ক্ষিতীশচন্দ্র শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন;—দণ্ডের পরে দণ্ড অতীত হইয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী আগমন করিল না। এখনও আসে না কেন? রান্নাঘরে আলো নাই—সকলেই কার্য্যাদি সমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষিতীশচন্দ্র বাহির হইলেন।

তাঁহার ঘরের পাশের ঘর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠের গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। সে স্বর তাঁহার চিরপরিচিত,—তাঁহার স্ত্রীর কণ্ঠরব। জানালা উন্মুক্ত ছিল,—চাহিয়া দেখিলেন, শয্যার উপর রাইচরণ অর্দ্ধ শয়ানাবস্থা, পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার স্ত্রী একটি প্রেমগাথা গাহিতেছে। তাঁহার তাহা ভাল লাগিল না। কিন্তু স্ত্রীকে ডাকিতেও পারিলেন না,—এমন যে অনেকেই গায়। তবে তিনি সে স্থান হইতে নড়িলেনও না,—আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

সেই সময় হঠাৎ তাঁহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষিতীশ আড়ি পাতিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধ-গম্ভীর অথচ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"শোন ত বাপু!"

ক্ষিতীশ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বাশুড়ী তাঁহাকে ডাকিয়া দ্রুতপদে তাঁহারই শয়ন-কক্ষে চলিয়া গেলেন। ক্ষিতীশও ত্বরিত-গমনে সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মুখখানা অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিলে, বাপু?"

কি। কিছুই না। বাহিরে যাচ্ছিলাম—তাই একবার চেয়ে দেখ্‌লাম।

শ্বা। ওরকম দেখ্‌তে নাই। ভগিনীপতির সঙ্গে শালীতে কত-রকম করে, তা' আবার আড়িপেতে কোন্ পুরুষে দেখে ?

ক্ষি। না মা, আমরা ত জানি, ভদ্রকামিনীগণ বড় ভগিনীপতিকে দাদার মত, এবং ছোট ভগিনীপতিকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকে। এ সব আমাদের চক্ষে নূতন !

অতর্কিতে প্রসুপ্তা ভুজঙ্গিনীর গাত্রে ঢিল নিক্ষেপ করিলে, যেমন সে জাগরিত হইয়া মাথা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে, ক্ষিতীশের শ্বাশুড়ী তেমনি ভাবে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"আমরা সব বাজারে বেশ্যা,—তাই অমন করি ! তোমার মা-বোন্ ভাল, আমরা অসতী।"

সমুন্নত-ফণা-ভুজঙ্গিনীর তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া ঢেলা নিক্ষেপকারী যেমন বিপন্ন, বিভ্রান্ত ও ভীত হয়, ক্ষিতীশচন্দ্রও তদ্রূপ হইলেন। হাতযোড় করিয়া বিনয়-নম্র স্বরে, কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"মা, আমায় ক্ষমা করুন। আমি ত দূষ্য কিছুই বলি নাই। কেবল--কেবল একবার চাহিয়া দেখিয়াছিলাম মাত্র।"

শ্বাশুড়ীর ক্রোধের তাহাতেও শান্তি হইল না। তিনি বলিলেন,—"কেন তুমি দেখ্‌বে ? অমন অবিশ্বাসী প্রাণ তোমার মত মূর্খ লোকেরই হয়। ভাল, সে যদি ঐ সময় তার ভগিনীপতির গায়-টায় হাত দিত ?"

ক্ষিতীশের হৃদ্‌পিণ্ডটা অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। শ্বাশুড়ী তখন ক্ষিতীশের বংশ, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র হৃদয়ের সবিশেষ ব্যাখ্যান করিতে করিতে সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় তিনি বাহির হইয়া, কৌশলে কন্যাকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত কথা সালঙ্কারে শুনাইয়া দিয়া তাহাকে নিজ গৃহে যাইতে আদেশ

করিয়াছিলেন। কারণ, নাতিবিলম্বে আষাঢ়ের মেঘের মত মুখখানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া সেজবৌ স্বীয় শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং বৈশাখের ঝড়ের মত অনেকক্ষণ গোঁ গোঁ করিয়া তারপরে স্পষ্ট-ভাবে ক্ষিতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ'য়েছে কি ?"

ক্ষিতীশচন্দ্র মৃদু হাসিলেন। সে হাসি শুষ্ক,—নিরানন্দের বিকট স্ফূর্ত্তিমাত্র। বলিলেন,—"হবে আবার কি ?"

সেজবৌ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"তুমি কি দেখ্‌তে গিয়াছিলে ?"

ক্ষি। আমার শ্রাদ্ধ।

সে। সেটা অচিরে হ'লে মন্দ হয় না।

ক্ষি। আমিও ভগবানের নিকট নিত্য সে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুর্ভাগার কোন প্রার্থনাই বুঝি তিনি গ্রাহ্য করেন না !

সে। বচনে খুব মজবুদ,—সকল রকমে হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। তোমার মত স্বামী যার—তার মত হতভাগী বুঝি পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মে নাই !

ক্ষি। সে কথা মিথ্যা নয়। তবে আমি করিয়াছি কি,—আমার উপর এত জাতক্রোধ কেন ?

সে। উঃ ! 'ভাত দিবার কেহ ন,—নাক্ কাটিবার গোঁসাই।' নিজের ভগিনীপতি—তার কাছে বসিয়া একটা কথা কহিতেছিলাম,—এর জন্য আড়িপাতা হ'য়েছিল,—তারপর আবার আমার মাকে সেই জন্য যা ইচ্ছে তাই ক'রে বলা হ'য়েছে ! কেন ? অত কেন ? আছ অন্নদাস হ'য়ে, আবার সব—তাতেই অত ভ্রূকুটী কেন ?

ক্ষি। আমি কোন ভ্রূকুটী করি নাই। অন্নদাস কেন, ক্রীতদাস—গোলাম হইয়াই আছি ! ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাই থাকতে হয়। এসব স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বৈ ত নয় !

সে। তা যে যেমন মানুষ তার তেমনি থাকাই উচিত। যে যার নিজ নিজ কর্ম্মফল ভুগিবে না ত অন্যে কি তাহার হইয়া ফলভোগ করিবে?

ক্ষি। তা'ত বটেই! এখন রাত্রি অনেক হ'য়েছে;—শোবে, না কি করিবে?

সে। আমি শোব না।

ক্ষি। তবে যাও, ভগিনীপতির কাছে গিয়া আর দু'টা গান গাহিয়া আইস।

ক্রুদ্ধা সিংহীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িলে সে যেমন লম্ফ দিয়া উঠে, সেজবৌ তেমনই লম্ফ দিয়া উঠিল। গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"তবে কি আমি গান গেয়েই বেড়াই! আমার কি—"

ক্ষিতীশচন্দ্র সেজবৌর হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন,—"চীৎকার করিও না। আমায় ক্ষমা কর,—আমি তোমাকে এমন কিছু বলি নাই। এখনই তোমার মা আসিয়া আমাকে দশকথা শুনাইয়া দিবেন।"

সে। তবে এখানে থাক কেন? আমি মুখরা, আমার মা মুখরা, আমার দাদা কটুভাষী, আমরা সবাই মন্দ—তবে এ মন্দদের মধ্যে মন্দের সংসারে থাকা কেন?

ক্ষিতীশ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, আর কথা কহা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। কারণ, ক্রমেই তাঁহার স্ত্রীর গলা সপ্তমে উঠিতেছিল,—সে স্বর শুনিয়া যদি শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হন, তবেই মহাবিভ্রাট ঘটিবে। অতএব নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া, একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

সেজবৌ অনেকক্ষণ বকিয়া বকিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিবস মাঠ ঘুরিয়া আসিয়া ক্ষিতীশ যখন তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আহার করিতে গেলেন, তখন শ্বাশুড়ী তাঁহার সম্মুখে একথালা পর্য্যুসিতান্ন প্রদান করিয়া বলিলেন,—"জামাই বাড়ীতে,—এত সকালে ভাত দিতে পারিব না বলিয়া কা'ল রাত্রে ভাত রাঁধিয়া পান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

প্রফুল্লমুখে ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"বেশ করিয়াছিলেন। কা'ল ভাত হইল না বলিয়া কাজে যাইতে পারি নাই।"

"ভাত অভাবে কাজে যাইতে পারি নাই—এত বড় কথাটা শ্বাশুড়ীর প্রাণে অসহ্য বোধ হইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,— "শোন বাপু, তোমার কথাবার্ত্তা যেন চাষার মত—এই জন্যই তোমার সঙ্গে তোমার মা, ভাই-ভাজের বনিবনাও হয় না। কবে তুমি ভাত পাও নি? শেষে কি আমার ঐ কলঙ্ক রটাবে? আমার হরির কি ভাত নেই!"

ক্ষিতীশচন্দ্র বিনীত স্বরে বলিলেন,—"না না, আমি তা বলি নাই। কা'ল দাদা আসিলেন বলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া হইয়া উঠিল না কিনা।

শ্বা। এই দেখ; বাঁকাভাবে ভিন্ন তোমার কথা নেই। হাতের পাঁচটা আঙ্গুলেই সমান ব্যথা! তোমার শরীরে অত হিংসে কেন বাপু? হরি এসেছে, তাই তোমাকে ভাত দেই নি! ওমা! লোকে শুন্‌লে আমায় কি ব'ল্‌বে! ভাত-কাপড় দিয়ে পুষে এখন কিনা এই কলঙ্ক! একেই বলে দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা।

যে কথা বলিতে যান, তাহাতেই বিপরীত ফল ফলে—এস্থলে আর

কথা কহা উচিত নহে—বিবেচনা করিয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র নিঃশব্দে সেই পান্ত ভাতগুলির সৃদ্ব্যবহার করিয়া, আচমন করিয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন। সেজবৌ তখন কক্ষমধ্যে ছিলেন,—কল্য রাত্রি হইতে তিনি ক্ষিতীশচন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ক্ষিতীশ-চন্দ্র একটা তাম্বূল প্রার্থনা করিলেন,—সেজবৌ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, অধিকন্তু গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে বেলা হইয়া গেল; অগত্যা তাম্বূলের আশা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র একটা ছিন্ন জামা গায়ে দিয়া চাদর স্কন্ধে লইয়া কর্ম্ম-স্থানে চলিয়া গেলেন।

পথে তাঁহার সহিত রাধাচরণের সাক্ষাৎ হইল। রাধাচরণ তাঁহার ছোট শ্যালক। অনেক দিন পরে বাড়ী যাইতেছে। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা হইলে, উভয়েই আপন আপন গন্তব্য পথে গমন করিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র আড়তে গিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার মনিব তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন, এবং স্পষ্ট বলিলেন,—"তোমার মত লোকের দ্বারা কার্য্য চলিতেই পারে না। কা'ল চালানী মালের গাড়ীর সঙ্গে ষ্টেশনে যাইবার কথা, কিন্তু কাল তুমি একেবারেই আসিলে না। আমার কত ক্ষতি হইল, তাহা তোমরা বুঝিবে না। যাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, সে মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে,—অতএব তোমার দেনা পাওনার হিসাব পরিষ্কার করিয়া লও, আর আসিও না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র মুখ গুঁজিয়া খাতা লিখিতে লাগিলেন, যেন সে কথা কে কাহাকে বলিতেছে।

পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিয়া আড়তদার অগত্যা নিস্তব্ধ হইলেন, কিন্তু উপসংহারে বলিয়া দিলেন, "পুনরায় এরূপ হইলে সে দিন তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া আড়ত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।"

ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, যাহার অর্থ নাই তাহার পক্ষে এসকল কথা সহ্য করিতেই হইবে! কিন্তু সেখানে কোন হিতৈষী ব্যক্তি থাকিলে ক্ষিতীশকে বলিয়া দিতে পারিতেন পয়সার জন্য দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে এমন হতমান হওয়া—আত্মমর্য্যাদা হারাণো অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। ফলে এ সকলের মূল কারণ পয়সার অভাব নহে, ক্ষিতীশ-চন্দ্রের বুদ্ধির দোষই ইহার প্রকৃত ও একমাত্র হেতুভূত।

যথাসময়ে কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র আড়ত হইতে বাহির হইলেন। বাজারের মধ্যে একখানি মনোহারীর দোকানে গিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন,—দোকানী বয়সে নবীন এবং কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ক্ষিতীশের সঙ্গে তাহার একটু সম্প্রীতিও ছিল। সে দিন কলিকাতা হইতে তাঁহার অনেক জিনিসের চালান আসিয়াছিল, ক্ষিতীশ ক্রুদ্ধাস্ত্রীর সন্তোষ সাধনার্থ ধারে এক শিশি সুগন্ধি তৈল ক্রয় করিয়া লইলেন।

মনে আশা, তৈলদানে স্ত্রীর মানভঞ্জন করিবেন। শিশিটা পকেটে করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত চিত্তে ক্ষিতীশচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার তারা উত্তর আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, এবং শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণচন্দ্র আকাশে বসিয়া কৌমুদী বিতরণ করিতেছেন। একটা গৃহমধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। রাধাচরণ সেখানে বসিয়া মাইকেলের মেঘনাদ বধ পড়িতেছিল। তৎ-পার্শ্বে রাইচরণ, হরিচরণ, হরিচরণের মাতা, সেজবৌ, ওপাড়ার তিন চারিজন স্ত্রীলোক বসিয়া সে পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন।

রাধাচরণ অনেকখানি আবৃত্তি করিয়া বলিল,—"তোমরা বোধ হয় কেহই ইহা বুঝিতে পারিতেছ না, আমারও সাধ্য নাই যে আমি বেশ পরিষ্কার করিয়া তোমাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিই। অতএব এ পণ্ডশ্রমে প্রয়োজন নাই,—কাশীদাসী মহাভারত পড়ি।"

রাধাচরণের মাতা বলিলেন,—"হ্যাঁরে লোকে বল্‌চে তুই আর দিন কতক পরে হাকিম হবি, আর তুই এই বই বুঝিয়ে দিতে পাচ্চিস না?"

রাধাচরণ হাসিয়া উঠিল, বলিল,—হাকিম, না হাকিমের পেয়াদা হব? এ বড় শক্ত বই মা,—এ বুঝান সহজ নয়।

মা। তবে নয় তুই পড়িয়া যা, আর রাই বুঝিয়ে দিন।

রা। কে, দে মহাশয়? পাটের ওজনের মধ্যে এ বিদ্যা নাই মা। উনি এ বুঝাতে পারেন না। রায়মশায় বাড়ী আসেন নি?—তিনি পারেন।

মাতা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যাহা রাধাচরণের বিদ্যায় কুলাইল না,—এত টাকা উপার্জ্জনক্ষম জামাই রাইচরণ যাহা পারিবে না, তাহাই পারিবে কি না ছয় টাকা বেতনভোগী রায় মহাশয় ওরফে ক্ষিতীশ!

মাতা সে কথা বিশ্বাসই করিলেন না। বলিলেন,—"তোর যেমন কথা! রাই আমার দশজয়ী জামাই,—তুই বল্, উনি এখনি বুঝিয়ে দেবেন।"

'তবে দিন.'—এই কথা বলিয়া রাধাচরণ আবৃত্তি করিল,—

"উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি,—
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ-দুঃখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ! হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয় ধন লয় কেহ হরি।"

এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া রাধাচরণ রাইচরণের মুখের দিকে চাহিল। রাইচরণ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"ঐ মায়া দয়ার কথা হইল, ও আর বুঝ্‌তে পাল্লে না। মানুষের উপর মানুষের মায়া দয়া করা উচিত। শাস্ত্রে তাই বলিয়া গেল।"

রাধাচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় ক্ষিতীশচন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধাচরণ তাড়াতাড়ি বলিল,—"আপনি এসেছেন? দে মহাশয়, মেঘনাদবধের একটা প্যারার খুব সদর্থ করিয়াছেন;—শুনুন; এই কথা বলিয়া রাধাচরণ পূর্ব্ব-পঠিত কবিতার পুনরাবৃত্তি করিল, এবং ক্ষিতীশকে তাহার অর্থ করিতে বলিল। ক্ষিতীশ সুন্দরভাবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

খাশুড়ী কিন্তু বুঝিলেন, বড় জামাই যখন অত টাকা রোজগার করেন, তখন তিনি কিছুতেই অশাস্ত্রীয় কথা বলেন নাই। ক্ষিতীশ

যদি লেখাপড়াই জানিত তবে এত দুর্গতি উহার হইবে কেন? তাঁহাদের অন্নদাস হইয়া থাকিবে কেন?

রাইচরণ অভিমানে ফুলিয়া উঠিলেন। অভিমানের চির-সহচর ক্রোধ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু ক্রোধটা রাধাচরণের উপর না পড়িয়া পড়িল গিয়া ক্ষিতীশের উপর। ক্ষিতীশ কিন্তু ততক্ষণে নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গিয়াছিলেন।

রাইচরণ অভিমান ও ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া কক্ষমধ্যে গমন করিলেন। শ্বাশুড়ী কন্যাকে বলিলেন,—জামাইকে পান দিয়া আয়।

'জামাই অর্থে রাইচরণ, কন্যা অর্থে ক্ষিতীশের স্ত্রী শিবমোহিনী উঠিয়া গেলেন—ক্রমে হরিচরণ উঠিয়া গেলেন, রাধাচরণ অনেকক্ষণ পাঠ বন্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং যাঁহারা পাড়া হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও চলিয়া গেলেন কাজেই সে নৈশসমিতি সেই পর্য্যন্তই স্থগিত থাকিল।

সেজবৌ রাইচরণের গৃহে গমন করিয়াছেন, কাজেই ক্ষিতীশচন্দ্র তৈলের শিশিটা একস্থানে রক্ষা করিয়া জামা চাদর রাখিয়া পদধৌত করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু জলাভাব!

অগত্যা একটা ঘটী হাতে করিয়া প্রাঙ্গণে গমন করিলেন ও কূপ হইতে জল তুলিয়া আনিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন করিলেন। তার পর শুষ্কমুখে গৃহমধ্যে বসিয়া মেজবৌর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেজবৌ আর আসেন না।

ক্ষিতীশচন্দ্রের স্কন্ধে তখন দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল,—তিনি বাহির হইয়া রাইচরণের কক্ষসন্নিধানে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"একবার এঘরে এস, একটু কাজ আছে।"

রাইচরণ সেজবৌকে বলিলেন,—"যাও, আমি বাঘ, তোমার বরের ভয় করিতেছে, পাছে এক কামড় দিয়া বসি।"

ক্ষিতীশ সে রহস্যের প্রত্যুত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। সেজবৌ অতিশয় বিরক্তিভাবে গুরুপদ বিক্ষেপে আপনাদের শয়ন কক্ষে আগমন করিলেন; ক্ষিতীশ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

সেজবৌ মুখ ঘুরাইয়া চোখ উল্টাইয়া বলিলেন,—"কি হয়েছে? মরণ আর কি,—ডাকাডাকি করিতে লজ্জাও করে না!"

ক্ষি। ডাকাডাকি এই জন্যে যে কতক্ষণ আসিয়াছি একবার কি দেখাও দিতে নাই?

সে। ছিঃ ছিঃ জ্বালালে তুমি! লোকে কি বলবে বল দেখি!

ক্ষি। আমার কাছে আসিলে লোকে কি বলিবে—আর বোনাই-য়ের পাশের কাছে একা বসিয়া থাকিলে লোকে কিছু বলিবে না?

প্রতপ্ত ঘৃতকটাহে জলের ছিটা দিলে, তাহা যেমন শব্দ সহকারে জ্বলিয়া উঠে, সেজবৌ তেমনিই জ্বলিয়া উঠিলেন। রক্তমুখী হইয়া, ক্রোধ কম্পিতকণ্ঠে তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"যম, তুমি আমায় নাও—ওমা, আমি যাব কোথায়? ভগিনীপতির কাছে গিয়াছিলাম, বলিয়া আমার এত লাঞ্ছনা!"

কন্যার সে তর্জ্জন গর্জ্জন ও নাকিস্থর মাতা শুনিতে পাইলেন, তিনি ক্রোধ-কম্পিত দেহে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যা বলিলেন —"আমি গলায় দড়ী দিব—আমি না কি দে মহাশয়কে—আমার মরণ হোক্, এখনি হোক্।

"বটে! তবে রে ছোটলোকের ব্যাটা, আমার বুকে বসে খাচ্চিস্ আবার আমারই মেয়ের কুৎসা কর্‌বি। তোর জন্যে কি আমার জামাই বেয়াই বাড়ী আস্‌বে না;—না আমার মেয়েছেলে বাড়ী থাক্‌বে না।"— শ্বাশুড়ীর এই মধুর বাণী জামাতার উপর বর্ষিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই বাক্য-সুধার লহর-লীলা সমস্ত বাড়ীখানিকে আলোড়িত করিয়া তুলিল! কি একটা বিষম কাণ্ড করিয়াছে ভাবিয়া অনেকেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কর্ত্রীঠাকুরাণীর মুখে শুনিল যে ক্ষিতীশ তদীয় কন্যাকে রাইচরণের গৃহে একবার মাত্র যাইতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়াছে, এবং প্রহার করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছিল!

রাইচরণের ক্ষিতীশের উপর পূর্ব্ব হইতেই ক্রোধ সঞ্চিত ছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া তিনি বলিলেন,—"ঘর জামাই, আর পোষা কুকুর, এরা অন্য লোক বাড়ী আসিতে দেখিলে, জ্বোলে উঠে। তা' আমি আর থাক্‌চি না—কা'ল সকালে উঠেই চ'লে যাব।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"ওমা, আমি যাব কোথা! এখন যদি ঘোষ বুড়োকে পেতাম, তবে ঝাঁটা দিয়ে তার বিষ ঝাড়িয়ে দিতাম। সেই পোড়ার মুখোই ত আমার সোণার প্রতিমাকে এমন হতভাগার হাতে দিয়াছিল। আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়ে খেলে!"

হরিচরণ বলিলেন,—"শোন ক্ষিতীশ, তুমি অন্য উপায় দেখ, এখানে আর তোমার থাকা হবে না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র এত কথায় কোন উত্তর করেন নাই। এইবার বলিলেন,—"তাই হবে।"

"বেশ।"—এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রাইচরণও ক্ষিতীশের চরিত্রের নানাবিধ দোষ জড়াইয়া আছে এইরূপ মন্তব্য প্রচার করিতে করিতে তথা হইতে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে

সকলেই চলিয়া গেলেন। কেবল ক্ষিতীশচন্দ্র পরাভূত সৈনিকের ন্যায় একাকী সেই গৃহমধ্যে ভগ্ন-মনে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার হৃদয়ে তখন দাবানলের জ্বালা জ্বলিতেছিল।—কাহার জন্য কি করিলাম? সেজবৌ,—আমি যে তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, ইহা কি তাহারই প্রতিদান।' অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া একটা আকুল দীর্ঘ-শ্বাস বহিয়া গেল। তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল। রাইচরণ ও হরিচরণের আহার শেষ হইলে ক্ষিতীশের ডাক পড়িল। ক্ষিতীশ বলিলেন,—"আমি রাত্রে আহার করিব না, শরীর অসুস্থ হইয়াছে।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"বাবুর রাগ হ'য়েছে, তা' হোক্। এত রাগের ধার কেউ ধারে না।"

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে যথাসময়ে সেজবৌ আসিয়া শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ক্ষিতীশের সহিত বাক্যালাপও করিলেন না,—বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ শয্যা গ্রহণ করিলেন। ক্ষিতীশও কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বাড়ীর সকলে যখন নিস্তব্ধ হইল,—সকলেই যখন নিদ্রিত হইয়া পড়িল, তখন সেজবৌকে ডাকিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন,—"উঠিয়া আমার একটা কথা শোন।"

অত্যন্ত বিরক্তিভাবে সেজবৌ বলিলেন,—"রা'ত দুপুরের সময় তোমার আবার কি কথা! যম আমাকে কবে নেবেন যে, তোমার হাত থেকে এড়াব।"

ক্ষিতীশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আ'জই শেষ,—আ'জ হইতেই তুমি সুখে থাকিতে পারিবে! সেজবৌ,—প্রাণ হইতে তোমাকে প্রিয় ভাবিয়াছি, তোমার জন্য মাকে, সহোদর ভাইদিগকে,

ভ্রাতৃজায়াদিগকে ত্যাগ করিয়াছি,—তোমার জন্য নিজের বাড়ী ছাড়িয়া পরের দুয়ারে দাস্যবৃত্তি করিতেছি। কিন্তু তাহার প্রতিদান বেশ দিয়াছ!"

মুখ ঘুরাইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, বিকৃত কণ্ঠে সেজবৌ বলিলেন,—"আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়াছ—আমিই তোমার শত্রু। তবে কেন আমার কাছে থাকা? যেখানে সুখে থাক তুমি সেখানে গেলেই পার।"

ক্ষি। সেখানে? না, সেখানে আর যাব না। জগৎ বুঝিয়াছি—জগতের মোহ বুঝিয়াছি। এখন যেখানে টাকা আছে সেই খানেই যাব।

সে। যেখানে ইচ্ছে, সেখানে যাও, আমার তাতে কি? আমাকে ডেকে জ্বালান কেন?

ক্ষি। যদি তোমার অসুখ বোধ হয়, ডাকিব না। তুমি শোও। একটা কথা,—তোমার জন্য এক শিশি সুগন্ধি তেল আনিয়াছিলাম,—নাও, হয় ত জীবনে আর কোন জিনিষ দেওয়া ঘটিবে না।

ক্ষিতীশের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু জমিল। সুগন্ধি তৈলের শিশিটা লইয়া সেজবৌর হস্তে প্রদান করিলেন।

"অত আদরে কাজ নেই"—বলিয়া শিশিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেজবৌ শয্যার উপরে ছিল—ক্ষিতীশ শয্যানিম্নে কক্ষতলে বসিয়াছিল,—শিশিটা আসিয়া ক্ষিতীশের কপালে লাগিল, ভাঙ্গিল না, কিন্তু কপালের একস্থানে কাটিয়া গিয়া রক্তধারা বহিল। সেজবৌ একবার সে দিকে চাহিয়া দেখিয়া শুইয়া পড়িল, রক্তরোধ করিবার কোন প্রয়াস পাইল না।

ক্ষিতীশচন্দ্র ঘটীর জলে রক্ত ধুইয়া, জামা চাদর ও ভগ্নছাতাটি লইয়া বলিলেন,—"সেজবৌ, ওঠ, দরজায় খিল দাও, আমি অদৃষ্টান্বেষণে

ভাসিলাম। আর কখনও দেখা হইবে না—এই দেখাই বোধ হয় শেষ দেখা!

সেজবৌ উপাধান হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিলেন—ক্ষিতীশের চক্ষু জলভারে টলটল করিতেছে, এবং সমস্ত অঙ্গে যেন বিষাদের ছায়া মাখিয়া রহিয়াছে। কপাল হইতে তখনও রক্তস্রাব হইতেছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র আর দাড়াইলেন না। সেই নিস্তব্ধ নিশিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথিক পরিত্যক্ত নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথ বহিয়া চলিয়া গেলেন।

সেজবৌ ভাবিলেন, এখনই ফিরিয়া আসিবে। গৃহমধ্যে মৃৎপ্রদীপে ক্ষীণরশ্মি আলোক জ্বলিতেছিল,—উন্মুক্তজানালা—পথে ধীর সমীর আসিয়া তাহাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল—এই আসে এই আসে করিয়া সেজবৌ অনেকক্ষণ কাটাইলেন। কিন্তু আসিল কৈ? তবে কি আর আসিবে না? দাদা জবাব দিয়া দিয়াছেন, মা গালাগালি দিয়াছেন—আমি অভাগিনী অযত্ন করিয়াছি—শিশি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রক্তপাত করিয়াছি—তাই কি আর আসিবেন না? তবে কেন যাইতে নিষেধ করিলাম না? আমি নিষেধ করিলে, তিনি যাইতেন না। সেজবৌর চক্ষুতে জল আসিল, আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া গিয়া দরোজার কাছে গেল,—একবার প্রাঙ্গনপানে চাহিয়া দেখিল—সর্ব্বত্র নীরব, সর্ব্বত্র জনশূন্য! তারপরে দরজায় খিল দিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সেজবৌ সকালে উঠিয়া সমস্ত বাড়ীখানা শূন্য দেখিল। হরিচরণ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ছোট জামাতা কোথায়? মাঠে যাবেন না?"

অবজ্ঞার স্বরে মাতা বলিলেন,—"কি জানি, আমার ওসব ভাল লাগে না, বাপু। রাই কা'ল রাগ করিয়াছিলেন,—আ'জ সকালে চলিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন,—এখন কি বলিতেছেন?"

হ। কি আর বলিবেন,—তিনি কি আর তাই মনে করিয়া আছেন,—অমন মানুষ কি আর হয়?

মা। তা আর একবার করিয়া!

হ। আর কি তপস্যা করিয়াই ছোট জামাইটিকে পেয়েছিলে?

মা। অদৃষ্ট—আমার পোড়া অদৃষ্টের ফল!

হ। এখন গেলেন কোথায়? দক্ষিণমাঠে যে একবার না গেলেই নয়।

মা। খুঁজিয়া দেখ।

হ। শিবুকে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

মাতা তখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বড় লোকের ব্যাটা কোথায় গেলেন?"

তিনি প্রায় ক্ষিতীশকে বড়লোকের বেটা বলিয়াই ডাকিতেন। শিবু ম্লানমুখে বলিল,—"কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

মা। ওমা! যাওয়া আবার হ'ল কোথায়? বোধ হয় তবে বাড়ী গিয়াছেন—আর যাবেন কোথায়? তা যান, আমার অত শত ভাল লাগে না।

অন্য দিন ক্ষিতীশকে যে যাহা বলিত, সেজবৌর প্রাণে তাহাতে কোন ব্যথা লাগিত না। আজি যেন মাতৃবাক্য বড় তীক্ষ্ণ বলিয়া মনে হইল। সে বলিল,—"তা যাবে বৈ কি মা, চিরদিনই কি আর তোমাদের বাড়ী পড়িয়া থাকিবে!

মাতা সে কথা শুনিতে পাইলেন না। ক্ষিতীশ কা'ল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এই কথা নিয়া হরিচরণকে সংবাদ দিলেন। হরিচরণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"দেখ্‌ছো কি রকম নেমক-হারাম! এখন একটু কাজ বেশী পড়িয়াছে কি না,—তাই চলিয়া গেল।"

রাধাচরণ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং বলিল,—"কাল তোমরা তাঁহাকে যেরূপভাবে বলিলে, তাহাতে তিনি থাকিবেন কেন? তোমরা তাঁহাকে যেমন ক্ষুদ্রাশয় ভাব, বাস্তবিক তিনি তেমন নহেন। তোমরা তাঁহাকে যত হীন মনে কর বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। তবে সময় সকলের চিরকাল সমান যায় না।

ছল ছল নেত্রে সেজবউ রাধাচরণের মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা শুনিল। অন্তরের দীর্ঘশ্বাস অন্তরে চাপিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আমি শত অপরাধ করিয়াছি,—কিন্তু তিনি কখনও আমাকে রূঢ় কথা বলেন নাই।—সময় সকলের চিরকাল সমান থাকে না।"

সেজবৌ রাধাচরণকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বলিল,—একটা কথা বলিব, শুন্‌বি?

রা। বল্‌না কি?

সে। আমি পয়সা দিব তুই বাগ্দীপাড়া থেকে একটা লোক ঠিক করে আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আয়।

রা। কেন, রায় মহাশয়ের খবর জানিতে?

সে। হ্যাঁ, রাত্রে গিয়াছে—ভালয় ভালয় পঁহুছাল কি না, সংবাদটা নিতে হয়।

রা। তা যাচ্চি,—পয়সা আর তোকে দিতে হবে না। আমার কাছে আছে।

সে। বাড়ীর কেউ যেন না জান্‌তে পারে—বুঝ্‌লি। সে লোক যেন আমাদের বাড়ীতে না আসে; তুই তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আস্‌বি, আবার তার বাড়ীর থেকে খবর জেনে এসে আমাকে বল্‌বি।

'তাই হবে'—বলিয়া রাধাচরণ চলিয়া গেল।

লোক সে দিবস পাওয়া যায় নাই। তৎপর দিবস কুবীরবাগ্দী সেখানে গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"তিনি বাড়ী যান্ নি।"

রাধাচরণ সে সংবাদ তাহার দিদিকে প্রদান করিল। সেজবৌ সংবাদ শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইল। বুঝি, সেজবৌ আগে জানিত না যে, সে চলিয়া গেলে প্রাণ এমন অস্থির হইবে। হায়, যখন কপাল কাটিয়া রক্তধারা বহিতেছিল, আমি হতভাগিনী কেন তাহা মুছাইয়া দিলাম না। যখন ছল ছল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বিদায় চাহিলেন, আমি কেন পা জড়াইয়া ধরিলাম না!

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর ন'বৌ বড়বৌয়ের কোলের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিল। কান্না নীরবে—নীরবে চক্ষুর জল পড়িয়া গণ্ড ভাসাইয়া দিতেছিল।

বড়বৌ বলিলেন,—"সে কিলো কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন? আমি কয়েক-দিনের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য কান্না কেন?"

ন'বৌ করতলে চক্ষু রগড়াইয়া বলিল,—"দিদি জগতে আমার আর কেউ নাই, তোমার কাছে আছি, তুমিও চলিলে! শ্বাশুড়ী বৃদ্ধ হইয়াছেন,—লোকে বলে তিনি পাগল হইয়া পথে ছুটিয়া বাহির না হইয়া বাটী আছেন, সেই আমাদের ভাগ্য। মেজদিদি সাতেও না পাঁচেও না; এক তোমার আঁচল ধরিয়াছিলাম; তুমি গেলে এ সংসারে আমি একা থাকিব কি প্রকারে?

ব। আমার যে না গেলে নয় বোন্‌,—যত শীঘ্র পারি, তিনি একটু আরোগ্য হইলেই চলিয়া আসিব।

ন। না গেলে নয় কেন? তিনি তোমার কে? মাসীর শ্বাশুড়ী। অত দুর সম্পর্ক লোকের ব্যারাম হইলে আবার কে তাহার শুশ্রূষা করিতে যায়?

ব। যে যায় না, সে অন্যায় কাজ করে। রমণীর সে ধর্ম্ম নয় বোন্‌;—একথা তোমাকে কতদিন বলিয়াছি। সম্পর্ক সম্বন্ধ নির্ব্বিচারে রোগে শুশ্রূষা, দুঃখে দয়া, শোকে সান্ত্বনা—রমণী বুক পাতিয়া করিবে। যে ডাকিবে—যে শরণাগত হইবে, তাহারই উপকার করিতে হইবে।

ন। তবে শীঘ্র আসিও।

ব। তা আসিব বৈ কি। ন'ঠাকুরপোর চিঠি পেলে আমাকে সংবাদ দিস্।

ন। সে আশা বৃথা!—ছোটঠাকুরপো আজ প্রায় তিনমাস কলিকাতায় গিয়া এ যাবৎ পাঁচ ছয়খানা পত্র দিয়াছেন; কিন্তু তিনি একখানিও পত্র লিখিতে পারেন নি। আর ঠাকুরপোর পত্রের ভাব বুঝত?

ব। তা বুঝেছি,—সে চোখ্‌খাকী মাগী এখনও অমাবস্যার পেত্নীর মত তাঁর পিছু লাগিয়া আছে।

ন। চোখখাগী মাগীর দোষ কি! মিন্সে তার আগে আগে ধায় কেন?

বড়বৌ হাসিয়া বলিলেন,—"তুই যে বশ করিতে জানিস্ না।"

ন। তা' মিছে নয়। আমার সে ক্ষমতা থাকিলে, তুমি কি আমায় ছেড়ে যেতে পার্‌তে?

বড়বৌ ন'বৌয়ের মুখচুম্বন করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। ন'বৌও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

সেই দিন শেষ রাত্রে একখানা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া বড়বৌ কামারহাটীতে দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে চলিয়া গেলেন।

যেখানে পীড়া, যেখানে শোক, যেখানে যাতনা, বড়বৌ সেই স্থানে গিয়া নিজের বুক পাতিয়া দিতেন, ইহাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত ছিল,—এবং সেই সকল ফল-কামনা-শূন্য কার্য্য সমাধা করিয়া অপার অনাবিল মানসিক আনন্দ উপভোগ করিতেন।

বড়বৌ চলিয়া গেলেন,—সংসারে তখন মেজবৌ, ন'বৌ, শ্বাশুড়ী আর রামসেবক, রামসেবকের মাতা এবং নিস্তার থাকিল।

শ্বাশুড়ী বৃদ্ধা, তাহাতে শোকে তাপে জর্জ্জরিতা, তিনি কোন দিনই রন্ধনশালায় গমন করিতেন না। মেজবৌ পুত্রশোকাতুরা—বিশেষতঃ কখনই তিনি রন্ধনশালায় পদার্পণও করেন না। রামসেবকের মাতা কুটুম্বের মেয়ে, কাজেই তিনিও রন্ধন বা কোন কাজকর্ম্মে থাকিতেন না। সংসারের সকল কাজ—নিস্তারিণীকে লইয়া ন'বৌকেই সম্পন্ন করিতে হইত। ন'বৌ তাহাতে কোনই কষ্ট জ্ঞান করিত না। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সে কাজ করিয়াও ক্লান্ত হইত না। সে বড়বৌর শিক্ষা,—বড়বৌ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, নারী কাজ করিতে জন্মিয়াছে—সেবা-ব্রতই তাহার মহাব্রত! প্রাণপণে ন'বৌ সে ব্রতের আচরণ করিত।

উত্তুঙ্গ শৈলশিখরস্থ ব্যক্তি যেমন বায়ুর প্রবল তাড়না, রৌদ্রের খরতাপ, বৃষ্টির নির্দ্দয় প্রহার প্রভৃতির মধ্যেও প্রকৃতির দিগন্ত ব্যাপ্ত বিশ্ববিমোহন নগ্ন সৌন্দর্য্য দর্শনে একরূপ তন্ময় হইয়া থাকে,—সেইরূপ ন'বৌ স্বামীর অবহেলা, স্বামীর অদর্শন, সংসারের একান্ত অভাব আর প্রভূত খাটুনি এ সকলের মধ্যেও পতিদেবতার মন্দিরমার্জ্জন করিয়া তন্ময় হইয়াছিল। এ শিক্ষা, তাহার শিক্ষয়িত্রী বড়বৌ দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,—রমণী স্বামীর সুখের বিঘ্ন হইবে কেন? তিনি যাহাতে সুখী হন, তাহাই করুন। নারীর আবার সুখ কি? জগতের আনন্দেই নারীর আনন্দ! নারী চাহিবে পবিত্রতা, আর কার্য্য। যাহার অন্তর অনন্ত প্রেমের আকুল-উচ্ছ্বাসে অনুক্ষণ সিঞ্চিত হইতেছে, যে, অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আপনার স্বামীকে আপনার ক্ষুদ্র বুকটুকুর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তা'র আবার স্বামী-অদর্শনে যাতনা কি? তার স্বামী যদি অন্যকে ভালবাসিয়া সুখী হয়, তবে সে অসুখী হইবে কেন?

বড়বৌর এই শিক্ষায় ন'বৌ হৃদয় বাঁধিয়াছিল। তাই সে, আগে—যাঁহার মুহূর্ত্তের বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইত,—যাঁহার একটু স্পর্শের জন্য তাহার তৃষিত তনু অধীর হইয়া উঠিত,—যাঁহার প্রফুল্ল-আননের মধুরভাষ শুনিবার জন্য তাঁহার শ্রবণযুগল অধীর—হৃদয় আকুল-আবেশে উথলিয়া উঠিত, তখন সেই স্বামী-দেবতা অপরকে লইয়া আছেন, তাহাকে একবার চক্ষুর দেখাও দেখেন না, এ সকল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াও সে জীবন ধারণ করিয়া আছে। যে বিকশিত-যৌবনের মুকুলিত অনুরাগ, সেই বাঞ্ছিত ধনকে শিরীষ-কোমল বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিত,—যাঁহার প্রিয় সম্ভাষণ শুনিতে না পাইলে অভিমানে আরক্ত গণ্ডস্থলে অশ্রুমুক্তা ঝরিয়া পড়িত,—যাঁহার অনাদর আশঙ্কায় ক্ষীণ হিয়া দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত,—তাহার সেই বাঞ্ছিত এখন অপরের। যখন এ সকল কথা মনে আসিত তখন বুক ফাটিয়া যাইত,—সে মনে করিত, আমি তাঁহার সেবা করিতে না পাইলেও তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ এবং তাঁহার ঘর দুয়ারের কার্য্য যে করিতে পাইতেছি, ইহাই আমার মহা সৌভাগ্য—ইহাই আমার নারী-জন্মের সার্থকতা! তিনি গুণবান্, আমি অশিক্ষিতা—গুণহীনা। আমা-কর্ত্তৃক তাঁহার চিত্তবিনোদন আদৌ সম্ভবপর নহে,—হয়ও না,—তাঁহার আনন্দ, তাঁহার সুখ কেন নষ্ট করিব? তিনি সুখে থাকুন—কাশিতে যেন তাঁহার মাথার একটি কেশও না ছিঁড়ে,—আমি হতভাগিনী এমনি করিয়াই জীবনের বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দিব।

কিন্তু তাহাতেও ঘোর অন্তরায় ঘুটিল। রামসেবকের পাপ-দৃষ্টি সেই অপাপবিদ্ধ অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তির উপর পতিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামসেবক এই কয় মাসের মধ্যেই এ গ্রামে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বসিয়াছেন; তবে ভদ্র-সমাজে তিনি ভুলিয়াও কোন দিন গমন করিতেন না। পূর্ব্বাহ্নে বেলা ছয় দণ্ডের সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত,—কোন দিন বা তাহারও অধিক হইয়া যাইত। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, দিবা ছয় দণ্ডই হউক, আর এক প্রহরই হউক, কোন দিনই না ডাকিলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত না! তাঁহার মাতা তামাক সাজিয়া হুঁকা লইয়া যখন বিপুল ডাকাডাকি করিতেন, তখনই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত, এবং উঠিয়াই হুঁকাটি হস্তে লইয়া শয্যায় বসিয়া হুঁকা টানিয়া টানিয়া সে তামাক ছিলিমটি পোড়াইতেন। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া আর এক ছিলিম তামাক খাইয়া তবে প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থে বাহির হইতেন।

গাড়ু হাতে করিয়া ঘাটের পথে বসিয়া আরও ছয় দণ্ড কাটাইয়া দিতেন,—তখন স্ত্রীলোকদিগের স্নানের সময়—সে পথে অনেক সুন্দরীর গমনাগমন হইত,—রামসেবক লালসাময় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতেন। তদনন্তর বাড়ী আসিয়া রান্নাঘরের দাবায় পা ছড়াইয়া বসিতেন। তাঁহার মাতা অথবা পিসিমাতা তখন সেখানে বসিয়া থাকিতেন—কদাচিৎ কোন দিন কেহ তরকারী কুটিতেন, কোন দিন বা গল্প-গুজব করিতেন, ন'বৌ তখন গৃহমধ্যে রন্ধন করিত। রামসেবক পাপ-দৃষ্টির বিকৃত নয়নে এক একবার তাহার দিকে চাহিত, আর নিজের বিদ্যাবত্তা, সাহসিকতা ও রসিকতার পরিচয় দিত। সে সকল শুনিয়া তাহার মাতা আহ্লাদে কাটিয়া পড়িতেন—মনে মনে ভাবিতেন বুঝি, যে জন্মজন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াই এ রত্ন গর্ভে

ধারণ করিয়াছিলাম! তাহার পিসিমাতা কিন্তু সে সকল কথায় বড় প্রীত হইতেন না। তিনি বুঝিতেন, যে সকল আজগুবী গল্প ফাঁদিয়া রামসেবক আসর জমকাইতে চাহে, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অনধিকার।

তদনন্তর তৈল মোক্ষণ অধ্যায়; ইহাতে দণ্ড ছয়েক অতিবাহিত হইত; স্নানে গিয়া সন্তরণ প্রভৃতিতেও কিয়ৎক্ষণ যাপিত হইত।—পরে বাড়ী আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ ও চিরুণী আয়না লইয়া কেশের পারিপাট্য-বিধানে ও তিলকাদি কাটিতে কয়েক দণ্ড ব্যয় করিয়া আহার করিতেন। আহারের পর পুনরপি নিদ্রা যাইতেন,—সে নিদ্রায় সমস্ত অপরাহ্ণ কাটিয়া যাইত।

অতঃপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন, কেশ সংস্কার ও জলযোগ সমাধা করিয়া পাড়ায় বাহির হইতেন।—এই ত গেল রাম-সেবকের দিবাভাগের কার্য্যবিবরণী অথ সান্ধ্য বা নৈশ-লীলা;—

রামসেবক কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোন দিনই পদার্পণ করিতেন না। চাষাপাড়ায় মোড়লদের বাহিরের ঘরে যে সান্ধ্যসমিতি বসিত, রামসেবক তাহারই সর্ব্বজন সম্মত স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। নিত্য নিত্যই তিনি সেই সকল স্থানে গমন করিতেন।

সে সমিতিতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, দর্শনাদি সকল বিষয়েরই আলোচনা হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রের বিষদ ব্যাখ্যাও আলোচনা হইত। যেখানে রামসেবক উপস্থিত হইতেন, সেখানে বক্তা তিনি একা, অন্য কেহ কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিত না। সকলে কৌতূহল হৃদয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করিত।

রামসেবক অবাধে বলিয়া চলিয়াছেন—হাইকোর্টের জজগুলা গণ্ড-মূর্খ, কলিকাতার মেয়ে মানুষ সব গোলাপজলে গা ধোয়। ইংরেজের

ছেলেগুলোকে আঁতুড় ঘরে মদে ভিজিয়ে রাখে, তাই তারা অমন সাদা হয়। হাইকোর্টের জজ আশু মুখুয্যে বেলেষ্টার—লাট সাহেব দশ হাজার টাকা দিয়ে তাঁর মাথাটা কিনে রেখেছেন,—তিনি মরে গেলে মাথাটা ভেঙ্গে দেখা হবে, তার মধ্যে কতখানি বুদ্ধি আছে! রবীঠাকুর একরত্তিও লেখাপড়া জানিতেন না—সেই দুঃখে এক দিন দুপুর রাত্রে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিতে গিয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মা সরস্বতী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বর দিয়া গেলেন; সেই হইতেই তিনি কবি হ'লেন। তাঁর খুব বড় কবির দল আছে—তিনি কবির দলের ছড়াদার। ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি যখন গল্প করিয়া যাইতেন, শ্রোতৃমণ্ডলী তখন অনিমেষ নয়নে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া তাহা শ্রবণ করিত, এবং সেই নব শিক্ষা প্রাপ্ত জ্ঞানালোক তাহারা আবার মাঠে ঘাটে বা বান্ধব সমাজে বিকীর্ণ করিয়া 'বাহবা' লাভ করিত।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রতিপত্তির আরও এক প্রকৃষ্ট ও প্রধান কারণ ছিল। চাষাপাড়ায় তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার গলদেশে ত্রিকণ্ঠী মালা ছিল,—মস্তকে দীর্ঘ বাবড়ী চুল ছিল, সেই চুলের নিত্য সংস্কার হইত, এবং কপালে একটী তিলকাঙ্ক শোভিত হইত। তদ্ব্যতীত তিনি খোল বাজাইতে জানিতেন,—'গৌর আমার হে' বলিয়া চীৎকার করিয়া গাহিয়া গাহিয়া নাচিতে পারিতেন;—আর প্রচুরতর গঞ্জিকা সেবন করিতে পারিতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা বলিতেও তিনি অদ্বিতীয়। তদ্ভিন্ন মারণ, উচাটন, বশীকরণ, জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়-ফুঁক, মাদুলী, কবচ, অবধৌতিক ঔষধ দান প্রভৃতি এখনকার দিনে ধার্ম্মিক হইতে যাহা যাহা লাগে, সে সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত ও অভ্যস্ত ছিল।

তিনি যে দিন ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন, সে দিন শ্রোতৃমণ্ডলী

ভক্তি-বিকম্পিত হৃদয়ে তাঁহার সে কথা শুনিত। কোন দিন যোগ-শাস্ত্রের কথা বলিতেন, কোন দিন মহাভারতের কাহিনী শুনাইতেন, আর অধিকাংশ দিন ব্রজলীলার বর্ণনা-ব্যাখ্যা করিতেন। বৃদ্ধ চাষাগণ এজন্য তাঁহাকে বড় খাতির করিত এবং যে দিন তাহারা যুটিত, সে দিন তিনি অবাধে সেই কাহিনী বলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন প্রতিযোগী যুটিলে তর্ক বিতর্ক হইত। এক দিন নকড়ি বিশ্বাসের ভাগিনেয় ঘনু, মামার বাড়ী আসিয়া সান্ধ্য বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছিল। ঘনুও কৃষ্ণভক্ত,—ঘনু চৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন বিহার প্রভৃতি দুই চারি খানা ভাষা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত। রামসেবকের নাম শুনিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বৈঠকে বসিয়াছিল।

হাজারি মোড়ল তাহার পরিচয় দিয়া রামসেবককে কৃষ্ণ কথা বলিতে অনুরোধ করিল। রামসেবক তখন গঞ্জিকা সেবনে "ঢুলুঢুলু নয়ন।" তিনি মৃদু হাসিয়া গর্ব্বিত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—একদিন শ্রীমতি রাধে মথুরার বাজার করিয়া ফিরিতে ছিলেন—আহা হা, সেই সময় ঠাকুর গরুর পাল নিয়ে যমুনার তটে বেড়াচ্ছিলেন, উভয়ে দর্শন হইল। আর অমনি ঠাকুরের ভাবাবেশ! অমনি ভাব-গদগদ কণ্ঠে গাহিলেন,—

"রাধে তোমার কেন বা এমন বেশ,
আমি দেখ্‌তে যে নারি গো—
তোমায় কি-ই বা হোল গো!"

রামসেবক কেবল কথায় বলিয়া নিরস্ত হইলেন না—চীৎকার করিয়া গাহিয়া উঠিলেন।

ইহাতে রামসেবকের সেবকমণ্ডলী 'বাহবা' 'আহা' 'ওহো' প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিল। ঘনু কিন্তু প্রীত হইল না।

সে ভাবিল, একবার দেখিতে হইল। বলিল,—"প্রভুর তুল্য মানুষ দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমরা মূঢ়—শ্রীগুরুর প্রণাম করি, তার অর্থ পর্য্যন্ত জানি না। দয়া করিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

রামসেবক বলিলেন—"বল বল—কোন্ মন্তরটা?"

ঘনু বলিল,—"আজ্ঞা এই—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

রামসেবক ঠকিবার লোক নহেন। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াই অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"বাপু হে, ও সকল গূঢ়তম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কি যে সে লোকে করিতে পারে। আমি শ্রীল গোস্বামী প্রভুর কৃপায় উহার কিঞ্চিৎ অবগত আছি। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শক্তিকয়া—কি না, অজ্ঞানীর নিকট যাহা তিন মণ দশ সের, জ্ঞানীর নিকট তাহা শোলা। আর বাকিটুকুর অর্থও বুঝ্‌তেই পাচ্চ।

ঘনু অর্থ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। অপর সকলে রামসেবকের জয়জয়কার করিল। ফল কথা, এইরূপে তাঁহার সান্ধ্য লীলা সম্পন্ন হইত।

এই সকল নানাগুণে বাধ্য হইয়া রামসেবকের অনেকগুলি শিষ্য যুটিল,—তাহারা প্রথম প্রথম রামসেবকের কলিকা প্রসাদ পাইয়াই তৃপ্ত হইত। কিন্তু সত্বরেই তাহারা তাহাতে আর তুষ্ট থাকিল না, সকলেই তখন স্বতন্ত্র ভোগের ব্যবস্থা করিল। গৃহে অন্ন নাই, জমিদার মহাজনের তাড়নায় অস্থির—তথাপি তাহাদের রক্তার্জ্জিত অনেক অর্থ গঞ্জিকাকারে কলিকার উপরে ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

পরের পাইয়া রামসেবকের সেবন মাত্রা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল, ধূমপানে ব্যোমপথে অধিক অগ্রসর হইয়া রামসেবক প্রায়শঃই রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নৈশলীলা সম্পন্ন করিয়া বাড়ী আসিতে রামসেবকের অনেক রাত্রি হইত। কোন দিনই রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতেন না। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন তাহারও অধিক হইয়া যাইত। কিন্তু রাত্রি যতই হউক, তাঁহার আবদার যে ভোজ্য অন্নগুলি উষ্ণ থাকা চাই।

ন'বৌকে এজন্য বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। বাড়ীতে আর পুরুষ মানুষ কেহ ছিল না,—বড়বৌ চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকেই রন্ধনাদি করিতে হইত। তাহার শ্বাশুড়ীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার একটু জ্বর হইত, তিনি রাত্রে রান্নাঘরের দিকে উঁকি মারিতেও পারিতেন না। মেজবৌ সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়িতেন,—ন'বৌ সেই পুরীর মধ্যে তত রাত্রে ভাত রাঁধিয়া রামসেবকের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। অনুরোধ উপরোধে নিস্তারিণীর যে দিন দয়া হইত, সেই দিন সে রান্নাঘরের দাবায় পড়িয়া ঘুমাইত, আর যে দিন দয়া না হইত, সে দিন সে সন্ধ্যার পরেই বাড়ী চলিয়া যাইত। ন'বৌ তত রাত্রি পর্য্যন্ত একাকিনী ভাত লইয়া বসিয়া থাকিত।

প্রথম প্রথম ইহাতে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে নাই,—তারপরে যখন রামসেবকের রসিকতার বরফখণ্ড বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন ন'বৌ বিপদ গণিল। আবার যে দিন টানের মাত্রা অধিক হইত, সে দিন রসিকতার মাত্রাও বৃদ্ধি পাইত। সেরূপ চোখ মুখ দেখিলে ন'বৌ তাঁহার কোলে ভাত দিতে যাইতে পারিত না—রামসেবকের মাতাকে গিয়া ডাকিয়া আনিত।

রামসেবকের মাতা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। অনেক

অনুযোগ করিয়া, "ও আমার দুধের ছেলে, ওকে আবার লজ্জা কি, ভয়ই বা কি,—যার মন অশুদ্ধ, সে সবতাতেই দোষ দেখে!" ইত্যাদি বাক্য-বাণ ন'বৌর উপরে বর্ষণ করিয়া অন্নপাত্র রামসেবকের সম্মুখে প্রদান করিতেন। রামসেবক গঞ্জিকা-রক্ত নয়নের তীব্র কটাক্ষে নবৌর হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপাইয়া দিয়া বলিতেন—"দেখ ত মা, আমি কি বাঘ যে, ঘাড়ের রক্ত চুষে খাব।"

ন'বৌ রামসেবকের সঙ্গে কথা কহিত না, এক গলা ঘোমটা দিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইত! রামসেবক ইহাতেও তাহাকে নানা-প্রকার ঠাট্টা-তামাসা করিত। ন'বৌ যখন মুখের ঘোমটা মাথায় তুলিয়া কাজ-কর্ম্ম করিত, রামসেবক তখন চুপিসাড়ে আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া 'চুরি করিয়া' ন'বৌর মুখপানে চাহিয়া থাকিত। মনে আশা, একবার চাহিলে হয়। তাহার সে আশা বড় অধিকক্ষণ অপূর্ণও থাকিত না; ন'বৌ মুখ তুলিয়া সেদিকে চাহিলেই চখোচখি হইত—পাপিষ্ঠ অমনি চক্ষু মট্‌কাইয়া, হাসিয়া গলিয়া যাইত! ন'বৌর প্রাণ ভয়ে জড়সড় ও কাঠ হইয়া যাইত। সে, তাড়াতাড়ি এক গলা ঘোমটা টানিয়া দিয়া ভয়ে ঘরে পলাইত। শাশুড়ীকে এসব কথা বলিলে, তিনি মেজোবৌকে বলিতে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। মেজবৌকে বলিলে, তিনি বলিতেন,—"ন'বৌ, তোর মনটা বড় অশুদ্ধ! রামা হ'ল পেটের ছেলের মত—হেসেছে তাই হ'য়েছে কি? ওতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় না,—তুই যা।"

ন'বৌ আর কথা কহিতে পারিত না। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত। মনে মনে প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশে বলিত,—"প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা, আমাকে এমন করিয়া আর কত দিন রাখিবে? আমি যে কত আশা করিতাম, তোমার পড়া সারা হইলে,—তোমার চাকুরী

হইলে, প্রবাসে আমি তোমার চির-সঙ্গিনী হইয়া থাকিব—নিয়ত নিকটে থাকিয়া চরণ সেবা করিব। এমন করিয়া পায়ে ঠেলিলে কেন? আমি তেমন লেখাপড়া জানি না—আমি গাইতে বাজাইতে জানি না—সত্য, কিন্তু আমা কর্ত্তৃক তোমার চরণ-সেবার কদাচ কোনরূপ ত্রুটী হইত না স্থির নিশ্চয়। সেবাশুশ্রূষা কি তোমার চিত্তবিনোদন হইতে পারিত না? যদি একান্তই তাহাই ভাবিয়াছিলে, তবে লেখাপড়া গান বাজানা শিখাইয়া লইলে না কেন? তোমার তৃপ্ত্যর্থে আমি কিনা করিতে পারি? হায়, কেন তবে আমাকে পায়ে ঠেলিলে? তুমিই যদি পায়ে ঠেলিলে, তবে তোমার পদে উৎসর্গীকৃত এ প্রাণ তোমার অবজ্ঞা-অবহেলা সহিয়াও এ মরদেহে রহিয়াছে কেন? হে ধর্ম্মরাজ! তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা—একমাত্র আশ্রয়-স্থল। স্বামী আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, তুমি আমাকে ভুলিও না—যত শীঘ্র পার, তোমার আশ্রয়ে আমাকে স্থান দাও।"

কিন্তু সে দুঃখ কাহিনী তাহার কান্ত বা কৃতান্ত কেহই কাণে তুলিল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় ন'বৌকে একা পাইয়া রামসেবক বুঝাইয়া বলিল,—"আমি অধার্ম্মিক নহি। আমি একজন পরম যোগী এবং ভক্ত। তুমি আমার সহায় হও—আমার সঙ্গে রামলীলা কর,—আমরা উভয়ে জীবন্তে ঠাকুর দেখিতে পাইব, এবং অন্তে পুষ্পরথে চড়িয়া গোলকধামে গমন করিব।

ন'বৌ সকল কথা শুনিল না। শুনিতে পারিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে দিনকার কথাও সে যথাকালে শাশুড়ী ও মেজ-জাকে জানাইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ক্রমে রামসেবকের সাহস বাড়িতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাগুপ্ত ঘটনার পরে রামসেবক একদিন বড়ই বাড়াবাড়ি করিল। ন'বৌ যখন রাত্রে তাহাকে ভাত দিয়া ফিরিতেছিল, তখন তাহার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল, এবং মুখে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া ন'বৌ অন্তরে মরিয়া গেল। সে নিজ গৃহমধ্যে গিয়া হাপুষ নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

রামসেবকের মাতা এই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ন'বৌ আগেই ডাকিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উঠিতে বসিতে আসিতে এতক্ষণ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ন'বৌকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন গো, কান্না কেন? আ'জ আবার কি হ'য়েছে?"

ন'বৌ কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রামসেবক বলিল,—"আমার আর এ বাড়ীতে থাকা হ'ল না। আমি কি ওঁর মামা শ্বশুর, না ভাশুর? ভাতের থালাখানা দেবার ছিরি দেখ ত? যেন তোমার দেওয়া,—ওখানে দাঁড়িয়ে ধপ্ ক'রে ফেলে দেওয়া হ'ল। অমন ক'রে না দিলেই হয়। তাই ব'লেছি ব'লে বুঝি আবার কান্না হ'চ্চে!"

রামসেবকের মাতা জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"হ্যাঁগা ন'বৌ, ওকি দুটি ভাতের জন্য তোমাদের বাড়ী প'ড়ে আছে? ওর পিসী—আপন পিসী—তার ছেলে মারা গিয়ে পথে ছুটে বেরোয়—তাই তাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে আছে। তুমি ওকে অমন বিষ-নয়নে দেখো কেন? তোমার খায়, না তোমার পরে? আর বাছা, অত সতী-গিরি ফলান ভাল নয়।"

ন'বউ আর কথা কহিল না। তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। সে চক্ষুর জলে গণ্ডস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে বড়বউর গৃহে গমন করিল। সে জানিত শ্বাশুড়ীকে জানাইয়া কোন ফল হইবে না।

মেজবউ তখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। অতি করুণ কাতর-স্বরে ন'বউ ডাকিল,—"মেজদিদি, একটু ওঠত—একটা কথা শোন।"

মেজ বউর ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন ন'বউ তাঁহার পদতলে হাত বুলাইয়া ডাকিল,—"দিদি, দিদি, একটা কথা শোন।"

মেজবউ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি লা, ডাক্‌ছিস্ কেন?"

ন'বউ কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা বলিল। রামসেবক বলিয়াছিল,—"সহজে স্বীকৃত না হইলে, বল-প্রকাশ করিব—কাহারও সাধ্য নাই, আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। দু'শো চাষা আমার হুকুমদার—কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বো—কেউ জান্‌তেও পার্ব্বে না। তার চেয়ে ঘরে থেকে, দু'জনে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি—তুমি সম্মত হও।" ন'বউ সব কথা বলিয়া মেজ বউর পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দিদি আমায় রক্ষা কর। আমি তোমাদেরই বউ—তোমাদেরই আশ্রিতা—তোমাদেরই ভগ্নী—আমাকে তোমরা না রক্ষা করিলে কে রাখিবে বল?"

কীচক-ভয়ে-ভীতা সৈরিন্ধ্রীও বুঝি এমনই করিয়া বিরাট-মহিষীর চরণ ধরিয়া অভয় মাগিয়াছিল। মেজবউ আর যাহাই হউক, সতীত্ব-গর্ব্বিতা রমণী, সতীর অপমান শুনিয়া সত্যই তাঁহার মনটা কেমন হইয়া গেল; তিনি নীরবে কি চিন্তা করিতেছিলেন—সহসা গৃহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—'তবে রে দজ্জাল' বলিতে বলিতে রামসেবকের মা সপ্তমে

গলা ছাড়িয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন এবং ন'বউর প্রতি ভীষণ বক্রদৃষ্টি করিয়া "তবে রে দজ্জাল" হইতেই পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলিতে লাগিলেন. "জ্বলটাকে না তাড়িয়ে ছাড়্‌বিনে। আহা, সে কচি ছেলে—তুই তার উপর লাগ্‌লি কেন? সে এসেছে তার পিসির বাড়ী—পেটের দায়ে আসি নি, পরণের দায়ে আসি নি—আহা হা, এত অপমান! ঠাকুরঝি—দাও ভাই, আমাদের বিদেয় দাও—আমরা বাড়ীর মানুষ বাড়ী যাই।" বলিয়াই বক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া, উপসংহারে রামসেবক যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সালঙ্কারে ঠাকুরঝির নিকট পেশ করিলেন। মেজবউ তাহা শুনিয়া ন'বউর দোষই স্থির করিলেন, স্বয়ং তাঁহাকে কিছু ধমক দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

ন'বউ তখন যায় কোথায়? শ্বাশুড়ীর গৃহে গমন করিল। তাঁহার সে দিন বড় জ্বর,—সে দুই একবার ডাকিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল, জ্বরের উত্তাপে ত্বক যেন ফাটিয়া যাইতেছে! সে ফিরিয়া নিজ গৃহে যাইতেছিল, তখন নরাধম রামসেবক উঠানে দাঁড়াইয়াছিল,—সে বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"যেখানেই যাও যাদু, আমার হাতে নিস্তার নাই। আমাকে বাবা বল্‌তে হবে, আর আমার বাসনা পূর্ণ কর্‌তে হবে। নতুবা তোমার বাবার বাবা এলেও রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।"

বাগুরাহস্ত ব্যাধের পাশ কাটাইয়া ভীতা, চঞ্চলিতা, কাতরা হরিণী যেমন ছুটিয়া পলায়ন করে, ন'বৌ তেমনই ভাবে রামসেবকের পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। হাপাইতে হাপাইতে নিজ গৃহমধ্যে গিয়া দরজায় খিল দিল, এবং শয্যার উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল,—প্রভু হৃদয়দেবতা, রমণীর রক্ষাকর্ত্তা—তুমি আমার কোথায়? তোমারই বাটীতে তোমার হতভাগিনী দাসী এক

দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা—অপমানিতা হইতেছে! নারকী তস্কর নারী-জন্মের যাহা সার—যাহা সম্বল, যাহা ধর্ম্ম, যাহা পবিত্র—যাহা মহৎ, তাহা হরণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। তুমি কি আসিবে না? তুমি কি রক্ষা করিবে না? আমি কোন ঠাকুর দেবতা চিনি না—তোমা ভিন্ন আমার কোন দেবতাকে ডাকিতেও লজ্জা করে—তুমিই আমার ভগবান। ভক্তের ডাকে ত তুমি স্থির থাকিতে পার না,—তবে কেন আসিবে না? আমি কি তোমার পূজাপদ্ধতি—তোমাকে ডাকিবার ভাষা জানি না—তাই আসিলে না!"

ন'বৌ তারপর অনেকক্ষণ শয্যার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার ভাবনা-জর্জ্জরিত চিত্তে কেবলই উদয় হইতে লাগিল, যে পাপিষ্ঠ যাহা বলিয়াছে, যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগ করিলে, আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। যদি হঠাৎ একদিন রাত্রে কতকগুলা চাষা লইয়া আসিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যায়, তবে কে আমাকে রক্ষা করিবে? তখন আমার গতি কি হইবে? তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, গা-দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল; সে শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। বসিয়াও শান্তি পাইল না, আবার শুইল, আবার উঠিয়া বসিল। তারপর স্থির করিল পলায়ন করি।

সংসারজ্ঞান-বিরহিতা রমণী বুঝিতে পারিল না, এ কঙ্কর কণ্টকিত সংসারপথে সুখে গমন করা যায় না। সে মনে করিল, দানবপ্রাপ্ত পুরী পরিত্যাগ করিতে পারিলে—মুক্তজগতের বক্ষে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই তাহার অমূল্যনিধি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। কেহ তাহাকে বুঝাইবার লোক ছিল না, কেহ ভরসা দিবার মানুষ ছিল না—প্রাণের জ্বালায় দৈত্য-ভয়ে সে সেই সঙ্কল্পই স্থির করিল।

একবার মনে হইল, তাহার শাশুড়ীর যে বড় জ্বর হইয়াছে—সে চলিয়া গেলে, কে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে? তাহার চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তারপর আবার ভাবিল—না পলাইলে যখন তাহার রক্ষা নাই, তখন শাশুড়ীর জ্বর বলিয়া আর কি হইবে? কিন্তু হায় সে একবার ভাবিল না, যে পলাইয়া যাইবে কোথায়, তাহার আশ্রয় কোথায়? রোদন-লোহিত আখিদ্বয় আঁচলে মুছিয়া, একবার তাহার অতি সাধের গৃহখানির দিকে চাহিল,—তাহার সাজান জিনিষগুলার দিকে চাহিল,—তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"থাক তোমরা, তোমাদের রক্ষয়িত্রী অভাগিনী চিরবিদায় লইতেছে। যদি তিনি আসেন, বলিও—"সে আমাদিগকে তোমারি জন্য রাখিয়া গিয়াছে।" তাহার চক্ষুদিয়া আবার জল গড়াইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই নিরব নিশিথে অন্ধকার পথে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল

• পথে গিয়া তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল;—হুতাশে, আতঙ্কে, সর্ব্বত্র বিভীষিকাময় মনে হইল, পত্রের মর্ম্মর শব্দে কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে কে জানে, কিসের বলে তাহার বৃত্তি-ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল,—সে চেতনা হারাইল—আত্মজ্ঞান বিরহিত হইল; দীর্ণ বিদীর্ণ বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে বিজন নিশীথে উদ্দেশ্যহীন অপরিচিত পথে কোথায় চলিয়া গেল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ন'বৌ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা—উন্মাদিনীর ন্যায় অন্ধকার পথে সারা-রাত্রি চলিয়া গেল। কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইবে, তাহা তাহার স্থির নাই—তখন তাহার কোন জ্ঞানই নাই—চলিয়া যাইতে হয়,—চলিয়াছে। যাইতে যাইতে এক নদী-তীরে গিয়া উপস্থিত হইল,—নদী খরস্রোতা ও বিপুল জলশালিনী।

পথের শেষ হইল,—নদীর দিকে চাহিয়া তাহার জ্ঞান হইল; তখন সে বুঝিতে পারিল, নদী উত্তীর্ণ না হইলে আর এপথে চলা যাইবে না। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভয় আসিয়া পূর্ণ প্রতাপে তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে বিহ্বল হইয়া পা ছড়াইয়া একটা শিমুল গাছের তলায় বসিয়া পড়িল।

এক্ষণে নিজ অবস্থা-কৃত কর্ম্মের কথা—সহস্র আকুল চিন্তা প্রবল-বেগে উদ্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়কে বিদ্ধস্ত-বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সে যায় কোথায়, করে কি! করিয়াছেই বা কি? তাহার কোমল পা দুখানি তৃণ-কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে! দেহ পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে জ্ঞানশূন্য হইল। সহসা নদীকূলের একটা পাখী চীৎকার করিয়া নিশাবসান বারতা ঘোষণা করিল। সে স্বরে ন'বৌর আবার জ্ঞানোন্মেষ হইল,—চমক-চঞ্চলিতপ্রাণে চারিদিকে চাহিল; দেখিল, পূর্ব্বগগনে উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞাত—বিপদ আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে ভাবিল, যখন দিনের আলো প্রকাশ পাইবে, তখন হতভাগিনীর উপায় কি হইবে!

এই সময় একটা জেলে নদী হইতে মাছ ধরিয়া তীরে উঠিল এবং মাছের ডালি ও জাল মস্তকে লইয়া গাহিতে গাহিতে চলিল,—

প্রসাদীসুর—একতালা।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥
মা'র সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে দয়া যাব মা বিমাতা যথা।
যখন বিমাতা আমায় কোলে নেবে
দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাথা।
ওমা যে জন তোমার নাম করে
তার হাড়মালা আর ঝুলি কাঁথা॥

পুরাতন গানের এই চরণটুক উষার বাতাসে বুকে করিয়া আনিয়া ন'বৌর কাণে ঢালিয়া দিল। তাহার মনে বলের সঞ্চার হইল, সে স্থির করিল, ভয় কি? মরণ ত আমার হাতেই—ঐত শীতল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ বারি রাশি উহাতেও কি সকল বিপদের অবসান হয় না,—উহার তলেও কি শান্তি নাই? প্রাণেশ্বর, এ অকূল পাথারে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

মানবের কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া ন'বৌ কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। মানব-দর্শন-বিষে আবার হয় ত, জর্জ্জরিত হইতে হইবে ভাবিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং যে দিক দিয়া স্বর আসিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকের পথ ধরিয়া নদী-তীর বাহিয়া চলিল।

কিয়ৎক্ষণ গমন করিয়াই এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঊষার উদাস বাতাস—সম্মুখে নদীপ্রবাহ, ঊর্দ্ধ আকাশে জ্যোতিঃ হীন তারকাপুঞ্জ—ন'বৌ তখন শ্মশান ভূমে।

তাহার প্রাণ উদাস—শ্মশানে দাঁড়াইয়া সে শবভূক্ শৃগাল-কুক্কুরের ধ্বনি শুনিল। একটা গলিত মৃত দেহ লইয়া তাহারা কাড়াকাড়ি করিতেছিল। মাংস চর্ম্মহীন নরমুণ্ডসকল ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহারা যেন মানবকে ডাকিয়া বলিতেছিল—শোন, আমাদেরও রূপ ছিল, যৌবন ছিল,—ধন, জন, কাম, ক্রোধ ইন্দ্রিয় মনোবৃত্তি সবই ছিল। এখন তাহার পরিণাম দেখ। অর্দ্ধভগ্ন-কলসী, ছিন্নকন্থা, দগ্ধবংশদণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি, চিতাভস্ম, তাহারই মধ্যে এই ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সম্রাট, ভিখারী প্রভৃতির দগ্ধাবশেষ—মুণ্ডমালা অভেদে গড়াগড়ি যাইতেছে—ন'বৌ সে দৃশ্য দেখিয়া ভীত হইল না। কে জানে কেন, তাহার সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না,—বুঝি তাহার মনে হইতেছিল এখানে অত্যাচার নাই, অবিচার নাই,—বুঝি রামসেবকের ন্যায় ইতর তস্করের পাপদৃষ্টিও নাই।

কার্য্যতঃ কিন্তু ন'বৌ তথায় অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। গলিত শবের পুতিগন্ধে তাহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিল। ক্রমে প্রভাত হইয়া উঠিল,—সূর্য্যোদয়ের আভাষ দেখিয়া ঊষা-সতী সভয়ে চলিয়া গেলেন। দিবা-লোক সমুদিত দেখিয়া ন'বৌর বড়ই ভয় হইল। এখন সে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে—সে ইহা ভাবিয়াই আকুল, অস্থির হইল।

গাছে গাছে কাক, কোকিল, পাপিয়া, দধিয়াল প্রভৃতি পক্ষীকুল এইবার সমবেত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, এবং জবাকুসুম সঙ্কাশ তরুণ

তপনের রক্তচ্ছটা সুউচ্চ গৃহশিখরে বৃক্ষচূড়ায় শোভা পাইল; নদীর নীলজলে তাহার বিচিত্র প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইল।

ভয়ে, ক্ষোভে লজ্জায় এবং অত্যন্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া—"মা গো!" বলিয়া ন'বৌ নদীতীরের বালুকারাশির উপরে বসিয়া পড়িল।

তখনই পশ্চাৎ হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে গা? রূপে যে ঘাট আলো করিয়াছ?"

আবার পোড়া রূপ! ন'বৌ চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল,—মাটীর কলসী কক্ষে দুইটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেখিবামাত্র ন'বৌ উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু পারিল না—তাহার অবসাদগ্রস্ত পা আর উঠিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

একজন বলিল,—"ভয় কি মা, আমরা ত মেয়ে মানুষ, বল না তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

রুদ্ধ কণ্ঠের জড়িত স্বরে ন'বৌ বলিল,—"মা, আমি বড় অনাথা, কোথায় যাব তার ঠিক নাই—যমের বাড়ীর পথ খুঁজিতেছি, পাইতেছি না!"

স্ত্রীলোক দুইটি স্থির করিল,—শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় অথবা স্বামীর তাড়নায় গৃহ ছাড়িয়া বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়াছে—হয় ত পথ হারাইয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের করুণহৃদয় তাহাকে আশ্রয় দিতে আগ্রহ করিল। একজন বলিল,—"তুমি আমাদের বাড়ী যাবে? কোন ভয় নাই,—আমরা টাকায় গরীব হইলেও বংশমর্য্যাদায় ভদ্র।"

ন'বৌ স্বীকৃত হইল। মনে ভাবিল,—দিবালোকে কোথায় যাইব

—পথে বহু বিপদ ঘটিতে পারে। আপাততঃ উহাদের বাড়ী গিয়া আশ্রয় লই,—তারপরে যা' হয় একটা স্থির করিব, বাপের বাড়ীর গ্রাম কোন্ দিকে, তাও জানি না ; সেখানে যাইতে পারিলেও কোন কুটুম্ব-সাক্ষাতের বাড়ী কাজ-কর্ম্ম করিয়া খাইতে পারিব!'—সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমণীদ্বয় জল লইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিল।

তখনও রবি-কর অরুণিম, তখনও প্রভাত-বায়ু সম্পূর্ণ শীতল, তখনও পাখীর কণ্ঠে মধুর প্রভাতী গাথা, তখনও ফুল্লফুলে সৌরভ মাখা।

গ্রামের মহাজন শম্ভূরায় প্রভাত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন,—পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শম্ভুরায়ের বয়স চল্লিশের কিছু উপর। জাতিতে তিনি ভূঁইহার—কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বঙ্গদেশে বাস করিয়া কনোজ ব্রাহ্মণের দাবি করিয়া আছেন। গঙ্গারামপুর গ্রামখানির সমস্ত কৃষকের তিনি মহাজন—ধান ও টাকা তাঁহার অনেক মজুদ।

কৃষক কামিনীদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ ঊষাদেবীকে দেখিয়া শম্ভূচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। এত রূপ—এমন সৌন্দর্য্য—এমন কুসুম সুকুমার লাবণ্য কোথা হইতে আসিল? উন্মুক্ত অলকদাম শিশিরশিকরসিক্ত—রোদন লোহিত দীর্ঘ আঁখিদ্বয় স্ফীত, মৃদু সমীরান্দোলিতা লতিকার ন্যায় কম্পিতা এবং ত্রাসকম্পিতা হরিণীর ন্যায় ভীত-চকিত দর্শনা।

শম্ভূচন্দ্র সে রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—দে'বৌ এটি কে?"

দে'বৌ একটু সম্ভ্রমের সুরে বলিলেন,—"জানি না। ঘাটের ধারে একলা বসিয়া কান্‌ছিলো—ডাকিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

শম্ভুচন্দ্র পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ নয়নে ন'বৌর দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। তাহারাও বাড়ী গেল।

শম্ভুচন্দ্র কিছু ভুলিতে পারিলেন না। বাড়ী গিয়াও সে রূপ তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। তাঁহার চরিত্র সবিশেষ দুষ্ট না হইলেও পবিত্র ছিল না,—অধিকন্তু রূপমাদকের এমন নিশাও বুঝি কোন দিন লাগে নাই। বুঝি এতাধিক মত্ততা এতাবৎ কোন দিন জন্মে নাই। তিনি সুবলের মাতাকে গোপনে ডাকিয়া এই সকল কথা বলিয়া দে'দের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

সুবলের মা মাহিষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনটি কন্যা ও দুইটি পুত্র রাখিয়া পাড়ার নবীন বাগ্দীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত ভেক লইয়া গৌরাঙ্গ রসে মত্ত হন। সেই সাধন ফলে সুবল নামধেয় একটি পুত্র-রত্ন প্রাপ্ত হন। সুবল অল্প বয়সেই গৌরাঙ্গপুরে গমন করে। তখন বৈষ্ণব বাবাজীও কোথায় চলিয়া গিয়াছেন—বয়সও ফাঁকি দিয়াছে। অগত্যা এর-ওর বাড়ী কাজ-কর্ম্ম করিয়া, এবং সুবিধামতে চরিত্রহীন নর নারীর অবৈধ-সংযোগ বিধানে দু'পয়সা উপরি রোজগার করিয়া দিন কাটাইতেন।

তিনি দে'দের বাড়ী গিয়া দে-মহিষীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপরে বিচ্ছিন্ন লতার ন্যায় মলিন-শুষ্কদেহা ন'বৌর নিকটে গিয়া তাহার উপর রায় মহাশয়ের আকস্মিক কৃপা, রায় মহাশয়ের সুবিপুল-সম্পত্তি ও ন'বৌর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ন'বৌ তাহা শুনিয়া কাঁদিল, এবং সুবলের মাও রায় মহাশয়ের নামে অভিসম্পাত করিল।

সুবলের মা ফিরিয়া গিয়া সে কথা রায় মহাশয়কে নিবেদন করিল। সে সকল শুনিয়াও রায়মহাশয়ের প্রলুব্ধ-হৃদয় প্রবুদ্ধ-প্রতিহত হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রূপ! তোমাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিব কি অভিসম্পাত করিব,—ভাবিয়া পাই না; কিন্তু তুমি বিশ্বপ্রিয়। তুমি স্বর্গবাসী—নতুবা স্বর্গে তোমার অত আদর কেন? তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী লইয়া অত ব্যাখান কেন? নন্দন মরীচিকার অত প্রলোভন কেন? তুমি স্বর্গবাসী বলিয়াই ত্রিভুবনের যৌবন, তোমার কটাক্ষে মুনিগণ ধ্যান সমাপন করিয়া তোমার পদতলে তপস্যার ফল ঢালিয়া দেন। কবির কল্পনা তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। বিশ্বসংসারের যৌবন প্রসারিত হস্তে তোমার মিলন যাচ্ঞা করে। তোমার এ সকল ভাব যখন চিন্তা করি, তখন তোমাকে প্রিয় সম্ভাষণে ডাকিতে—তোমার প্রকটমূর্ত্তি দেখিতে সাধ হয়। আর যখন তুমি পোড়া মর্ত্ত্যে আসিয়া মরলোকের যৌবন জাগ্রত করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হও না,—আকুল-আবিল-লালসা-উন্মাদনা উৎপন্ন কর, তখন তোমাকে কি অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা হয় না? মেঘের বিদ্যুৎ আকাশ হইতে ঝরিয়াই সর্ব্ব-সংহারক হয়।

রায় মহাশয় রূপের দাহে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। মর্ত্ত্যের রূপ বুঝি এমনি করিয়াই পোড়ায়। রায় মহাশয়ের লুব্ধ-হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল। তিনি স্থির হইতে পারিলেন না—গোপাল দেকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। গোপালদের গৃহিণীই ন'বৌকে আনিয়া বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছে।

মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোপাল দে, মহাজন রায় মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল। রায়মহাশয় মহাসমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে তখন আরও জনকয়েক লোক থাকায়, রায়মহাশয়

দে মহাশয়কে লইয়া নির্জ্জনে গমন করিলেন,—উভয়ে অনেক কথা-বার্ত্তা,—অনেক বাদানুবাদ হইল। তারপরে দে মহাশয় বলিলেন,—"তবে ভাই। আপনি মহাজন—আমি খাতক, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারি, আমার এমন কি সাধ্য আছে!"

দে মহাশয় চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখখানা নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে দে মহাশয় ও তদীয় গৃহিণীতে কথোপকথন হইতেছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। কথাও খুব মৃদুস্বরে হইতেছিল। দে-গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিস্বরে বলিলেন,—"তা' কখনই হবে না।"

দে। দোষ কি, ও আমাদের কে?

দে গৃ। কেউ না,—কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে।

দে। অত ধর্ম্মের থলে গলায় বাঁধিলে সংসারের কাজ চলে না।

দে-গৃ। ছিঃ ছিঃ, তুমি বল কি? তোমার প্রাণে কি একটু দয়া মায়াও নেই। আহা-হা, মেয়েটার মলিন মুখখানা দেখেও কোন্ প্রাণে তুমি তারে বাঘের মুখে তুলে দিতে চাচ্ছ? সতীর সতীত্বহানির সহায়তা—ওমা, আমি যাব কোথায়? তাহ'লে আমার কি বংশ থাক্‌বে গা?

দে মহাশয়ের অপ্রসন্ন মুখ আরও ম্লান হইল। বলিলেন,—"কি করি, গিন্নি; মহাজন,—

অধিকতর বিরক্তি স্বরে দে-গৃহিণী বলিলেন,—"হোক্‌গে মহাজন। ধর্ম্মের চেয়ে কেউ বড় নয়।"

দে। বড় ত নয় গিন্নি;—কিন্তু যখন দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব বেচে নিয়ে পথের ভিখারী ক'রবে?

দে-গৃ। রায় মহাশয়—বুড়ো মিন্সে—এখনও তার এই দুর্ম্মতি। যাচ্চি আমি রায় ঠাকুরুণের কাছে। সতী, সতীর মর্য্যাদা বুঝ্‌বে।

দে মহাশয় চমকিয়া বলিলেন,—"গিন্নি, ঘুমন্ত বাঘ জাগায়ে কি সর্ব্বনাশ কত্তে চাও ? তা হ'লে আমার ভিটে মাটি চাটি হবে।"

দর্পিত বাহু আন্দোলন ক [illegible] বলিলেন,—"ইস্, তা' ব'লে কি ধর্ম্ম বেচে খাব ? নেয় বেচে নেবে—না হয় ভিক্ষে ক'রে খাব। না হয়, এ গাঁ থেকে উঠে যাব !

দে। আর এক ভয় আছে।

দে-গৃ। কি ভয় ?

দে। তিনি বলিয়াছেন,—সন্ধ্যার পরে চারিজন লোক আসিবে—

দে মহাশয়ের কথা সমাপ্ত না হইতেই দে-গৃহিণী গর্ব্বিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে আমার লোক আসা ! এ মগের মুল্লুক কি না। আসুক ত লোক—দেখি কার সাধ্য আমার বাড়ী থেকে সতী রমণীকে নিয়ে যায় !"

দে মহাশয় ক্ষীণ দীপালোকে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ-প্রভা ঝলসিতেছে। তিনি আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না, উঠিয়া বাহিরে গমন করিলেন। কিন্তু মহাজন-ভয়ে তাঁহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল ! দে-গৃহিণী তখন রাগে ফুলিতে ফুলিতে রান্নাঘরে গমন করিলেন।

ন'বৌ সে সময় সেই ঘরেরই অপর পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিল। যখন স্বামী স্ত্রীতে মৃদুমন্দ স্বরে কথা আরম্ভ হইল, তখন সে কাণ পাতিয়া সে কথা শুনিতে লাগিল। একে সে স্রোতে ভাসমান তৃণ, তাহাতে সুবলের মার কথায় তাহার হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল,—সামান্য একটা টিক্‌টিকির শব্দেও তাহার কাণে যেন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতেছিল। স্বামী স্ত্রীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলে সে উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, ন'বৌ অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। তারপর হৃদয় দৃঢ় করিয়া স্থির করিল, এখানে বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না। যখন অবুদ্ধির ক[illegible]ছি,—শাশুড়ীকে না বলিয়া, পিতৃভবনের স্বজনগণের আশ্রয়, পাড়ার পাঁচজনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়া যখন মহাপাতক করিয়াছি, তখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সে প্রায়শ্চিত্ত জীবন আহুতি দিয়াই করিব।'

তাহার মনে হইল, 'আমি এখানে থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ হইতে পারে,—একা রমণীর সাধ্য কি যে পাপিষ্ঠের পাইক-পেয়াদার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে? আর যদিই সাধ্য হয়, তবে তজ্জন্য তাহার ঘোর অনিষ্ট হইবে—আমার কারণ, কেন ইহাদিগকে বিপন্ন করিব? এ জীবনের আহুতি ব্যতীত এ কর্ম্ম—হোমের যখন অবসান হইবে না, তখন ইহাদিগের সর্ব্বনাশ করি কেন? নিকটেই নদী—অতি সহজে আমার কার্য্য সমাধা হইবে।' তখন আর সে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে নির্গত হইল।

সে রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী পথে চলিয়া গিয়া ন'বৌ নদীতীরে দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধ-নত-যুক্ত করে ডাকিল—"প্রভু, স্বামীন্, চলিলাম। একবার দেখিবার বড় সাধ ছিল—অন্তিমে সে সাধ পুরাইলে কৈ?"

আর কিছু বলিল না। সেই উচ্চ তীর হইতে সবেগে জলতলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

অদূরে একখানা ছইঘেরা নৌকাতে আলো জ্বলিতেছিল,—তাহার মধ্যস্থ আরোহী মাঝিদিগকে বলিলেন, "শীঘ্র দেখ ত, জলে যেন একটা মানুষ পড়িল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ন'বৌ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 'কুলের কামিনী কুলত্যাগ করিয়া অকূলে পা দিয়াছে,—সকলেই তাহার নামে ধিক্কার দিতেছে; কিন্তু কেহ বুঝিয়া দেখিল না অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিল না যে, কি ভীষণ অত্যাচারে—কতদূর অবিচারে, আত্মহারা হইয়া সে এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে!

লোকে বুঝিল অন্যরূপ—শুনিল অন্যরূপ! রামসেবক আর রামসেবকের মাতা সমস্ত গ্রামে প্রচার করিয়া দিল, ন'বৌর বাপের বাড়ীর গ্রামের একটা ছোকরা রাত্রে লুকাইয়া লুকাইয়া মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। আগে বড় কেহ তাহার অনুসন্ধান লইত না,—রামসেবক আসা পর্য্যন্ত উহাদের বড় অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছিল; কেন না, রামসেবক অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিত,—তাই ন'বৌ তাহার সহিত পলায়ন করিয়াছে। দিন কতক সেই কথা লইয়া গ্রামের মধ্যে টি টি পড়িয়া গেল। মেয়ে মহলে, স্নানের ঘাটে, গুড়ুক ধূমাবদ্ধ চাষার চণ্ডীমণ্ডপে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, ভদ্রলোকের সমাজে কেবল ঐ কথারই আলোচনা আন্দোলন চলিতে লাগিল, তিন চারি দিন ঐইরূপ অবিচ্ছিন্ন অহর্নিশি আন্দোলনের পর, জটলাস্রোত অনেকটা নিবৃত্তি হইয়া আসিল।

পাড়ার বিষ্ণু সরকার ভাবিয়া-চিন্তিয়াও আসল ব্যাপারটা নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—ন'বৌর মত লক্ষ্মীবৌ গ্রামে আর নাই। বিশেষতঃ ভদ্রকুল-বধূ ইন্দ্রিয় তাড়নে কুলের বাহির

হইবে,—স্বামী-ভক্তি বিসর্জ্জন দিবে, ইহা একটা বিশ্বাসযোগ্য কথাই নহে! তিনি সন্ধ্যার সময় আহ্নিক ক্রিয়া ও জলযোগ সমাপন করিয়া, একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন ও একগাছি মোটা লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে যতীশ-চন্দ্র দের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যতীশচন্দ্রের মাতার জ্বর তখন বিরাম—নিরাময় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি শয্যাত্যাগ করেন নাই। তাঁহার কপালে যে, এতও ছিল —তাহা তিনি জানিতেন না। শয্যায় পড়িয়া দিবারাত্রি কেবলই কাঁদিতেন।

বিষ্ণু সরকার বরাবর তাঁহার নিকটে গমন করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৌ, কেমন আছ?"

ক্ষিতীশের মা তাঁহাকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বিষ্ণু সরকার হাতের লাঠি ও লণ্ঠন সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া এক-খানা আসন টানিয়া লইয়া বসিলেন। তৎপরে বলিলেন,—"বৌ, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

ক্রন্দন-বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া যতীশের মা বলিলেন,—"আমি ত কিছু জানিনে ঠাকুর পো!"

কিঞ্চিৎ বিরক্তি স্বরে বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন,—তুমি কিছু জান না, তা আমি জানি। তুমি কোন বিষয়েই লক্ষ্য রাখ না। -কোন বিষয়ই ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া চল না—আবশ্যক মতে কাহাকেও উপ-যুক্তরূপে শাসন করিবার চেষ্টা কর না—তাই তোমার সংসার এমন করিয়া ছারেখারে যাইতেছে। গোড়া হইতে যে গৃহিণী তাহার গৃহপানে না তাকায় স্বীয় সংসারের শৃঙ্খলা বিধানে কৃতযত্ন না হয়, এমন করিয়াই তাহার গৃহস্থালী বিনষ্ট হয়।

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন—আমার বোধ হয় এই কুকাণ্ডের মধ্যে রামসেবকের হাত আছে।

গৃহিণী বলিলেন,—যারই থাক্, আমি ত জন্মের মত গেলাম।"

বি। রামসেবককে একবার ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারিলে হইত।

গৃ। না ঠাকুর পো, তেমন কাজ করিও না। তাহা হইলে এই জ্বালার উপর আবার জ্বালা বাড়িবে—বাড়ী টিকিতে পারিব না।

বি। এইরূপ ভয় করিয়াই তুমি এতদূর করিয়াছ। যাহাই হোক কিছু না জিজ্ঞাসা করিলে, আসল কথা প্রকাশ পাইবে না। প্রকৃত ঘটনাটা না প্রকাশ পাইলে সে ভদ্রলোকের মেয়ে যে প্রকৃতপক্ষে কতদূর দোষী ঠিক বুঝা যাইতেছে না; অথচ বাস্তবিক যদি সে নির্দ্দোষী হয় এবং লোকের চক্রান্তে পড়িয়া যদি বিড়ম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোকে ধর্ম্মে নিন্দনীয় হইতে হইবে।

অতঃপর বিষ্ণু সরকার—"নিস্তার নিস্তার" বলিয়া ডাক দিলেন, নিস্তার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাম-সেবক, কোথায় রে?"

জলখেয়ে পাড়ায় যাবার উদ্যোগ কচ্চেন।

বি। ডাক ত।

নিস্তার গিয়া রামসেবককে সে কথা নিবেদন করিল। রামসেবক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গর্ব্বিত পদক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিষ্ণুচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বক্রদৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদ-মস্তকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ব'স, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

রামসেবক বলিলেন,—"বসিবার সময় আমার এখন নাই, যে যা থাকে বলিতে পারেন।"

বি। ধরিতে গেলে এখন তুমি এ বাড়ীর কর্ত্তা—সববিষয়ে তোমাকেই সন্ধান রাখিতে হয়।

রা। সে কথা আর বলিয়া জ্বালান কেন? আমি কোন্ বিষয়ে না সন্ধান রাখি? এই যে ন'বৌটা পালিয়ে গেল, আমার চখে কি ধূলা দিতে পেরেছে?

বি। তাকি পারে গো! তবে আর ব্যাটাছেলে বলেছে কেন? ভাল সে কথাটা আমি তোমার মুখে কোন দিন শুনি নাই। ঘটনাটা কি বল ত বাপু?

রা। শুনবেন্ কি—বৌটা আদৎ ভাল নয়।

বি। তা ত নয়ই—কিন্তু ঘটনাটা কি?

রা। ঘটনাটা কি জানেন,—আমি পাড়া থেকে, অনেক রাত্রি হ'লে বাড়ী ফিরি,—প্রায়ই আমার চোখে পড়ে—

ঠিক এই সময়ে রামসেবকের মাতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুসরকার বড় ঢুঁদে লোক,—পাছে তাঁহার সোণার বাছাকে কিছু বলে, এই ভয়ে আসিয়া তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন।

বি। তোমার চোখে কি পড়ে?

রামসেবকের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"ওগো একা ওর কেন, আমিও কতদিন দেখেছি গো—মনে হ'লে এখনও গা শিউরে ওঠে।

বি। কি দেখ্‌তে রামসেবক?

রা। একটা ছোঁড়া—বয়স বড় বেশী নয়, এই আমাদেরই মত।

বি। তার পর?

রা। আমি তাহাকে দুই এক দিন তাড়াও ক'রেছি।

বি। সে যে ন'বৌর জন্যই আসিত, তা বুঝ্‌লে কেমন করে?

রা-মা। ওগো, আমি দু'দিন দুজনকে একত্রে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে শুনেছি।

বি। সে কথা বাড়ীর আর কাকেও ব'লেছিলে?

রামসেবক বলিল,—"নিস্তারকে ব'লেছি।"

বিষ্ণুচন্দ্র নিস্তারকে ডাকিলেন। নিস্তার আসিলে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নিস্তার স্পষ্ট বলিল—"না, আমাকে কেহ এমন কথা কোন দিন বলে নি।"

রামসেবকের মাতা সপ্তমে গলা তুলিয়া বলিলেন,—"তবে রে হারামজাদি, মিথ্যে কথা! ওর পিসীরতা' খাবি, আবার ওর সঙ্গে শক্রতা! কেন, আমার মুকাবেলায় যে তোকে ওকথা বলেছিল।"

নিস্তারও ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে নাকিস্থরে উদ্যগ্রামে তুলিয়া বলিল,—"ভাত খাই ব'লে কি মিথ্যা কথা ব'ল্‌বো—বড় ত সুখে আছি, না হয়, আর না থাকবো।"

রা-মা। ওগো তোমরা থাকবে না কেন,—আমরাই তোমাদের চক্ষুঃশূল হ'য়েছি, তা আর থাকৃচি নে, খাও তোমরাই লুঠে-পুটে।

বি। ঝগড়া করিও না,—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তাই বল। ভাল, রামসেবক;—বাড়ীর চাকরাণীর সাক্ষাতে এই গুরুতর কথাটা বলিবার আগে, এ বাড়ীর আর কারও সাক্ষাতে বলিলে না কেন?

রা। না, তা বলি নি।

রা-মা। ব'ল্‌বে কি,—আমরা পর, যদি বলি, লোকে বলিবে শক্রতা ক'চ্চে।

বি। রামসেবক, তুমি তোমার পিসীমার সাক্ষাতে একথা কোন দিন বলিয়া[illegible]লে? তিনি ত আর তোমাকে পর ভাবেন না?

রা। হ্যাঁ, ব[illegible]ছি বৈ কি।

বি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?

রা। আপনার সঙ্গে তিনি কথা কবেন কেন?

বি। আমার বধূমাতা—আমার সঙ্গে কথা কইবেন বৈ কি!

রা-মা। ও ত বলিয়াছিল,—তবে ঠাকুরঝি সদাই পুত্রশোকে কাতর, সে কথা কাণে করিয়াছে কি না, কে বলিতে পারে!

বি। সব বুঝিলাম,—এখন রামসেবক একটা কথা শোন।

রা। কি বলুন?

বি। তুমিই এই ঘটনার মূল—

রা। আমি?

বি। হাঁ,—তুমিই তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলে,তাই বালিকা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে।

রা। তবে তাই।

বি। তবে তাই! ভাবিও না, এইরূপেই তোমার দিন কাটিবে। ভগবানের চক্ষু জগৎ ব্যাপ্ত। পাপ করিয়া থাক, অচিরে শাস্তি পাইবে।

"তা যখন পাই পাব"—এই কথা বলিয়া রামসেবক চলিয়া যাইতেছিলেন, বিষ্ণুচন্দ্র বলিলেন,—"শোন রামসেবক, এখনও সত্য কথা বল, যদি ভয়ে সে বালিকা পলায়ন করিয়া থাকে, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।"

রামসেবক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এ কেমন দেশের কেমন বিচার জানিনে। বেরিয়ে যাওয়া বৌকে আবার আনিতে চায়!"

তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা সেই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র ম্লানমুখে চলিয়া গেলেন।

যতীশের মাতা তাঁহার বহুকালের মৃত স্বামী ও বড় ছেলের এবং দানীশের নাম করিয়া করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মেঘস্তর ভেদ করিয়া অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ হঠাৎ মাঠের মধ্যে পুষ্পিত পাদপ-আকারে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রোশের পর ক্রোশ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে,—বিস্তীর্ণক্ষেত্র জনহীন শস্যহীন—কৃষকেরা অনেক দিন ধান্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে,—ধানের মূলে মাঠ আচ্ছন্ন! দুই মাস পূর্ব্বের সজল মৃত্তিকা প্রখর রৌদ্রতাপে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে।

প্রান্তরের মধ্যে একটি বিল;—বিলে কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত। জলচর পক্ষিগণ সেই নীলজলে সন্তরণ করিতেছিল।

বিলের পার্শ্ব দিয়া একজন ইংরাজ অতিবেগে দ্বিচক্রযান হাকাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটা উচ্চ আইলে বাধিয়া গাড়ীখানা উল্টাইয়া গেল,—সাহেব সেই কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গেলেন।

একজন পথিক অদূরে এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সে সাহেবকে বিপন্ন দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। পথিক ক্ষিতীশচন্দ্র।

ক্ষিতীশচন্দ্র সাহেবের নিকট আসিয়া দেখিলেন, আঘাত গুরুতর। মাথায় একটা চোট লাগিয়া ফাটিয়া গিয়াছে, এবং সেখান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে, সাহেব একরূপ অজ্ঞান,—গাড়ীখান ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

ক্ষিতীশ—তাড়াতাড়ি নিজের উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন, এবং বিল হইতে পদ্মপত্রে করিয়া জল আনিয়া সাহেবের মুখে চোক্ষে ও ক্ষতস্থানে সিঞ্চন করিলেন। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পরে সাহেবের জ্ঞান হইল।

জ্ঞান হইবামাত্র সাহেব উঠিয়া বসিলেন। চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বোধহয় ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবস্থাটা শরণ করিয়া লইলেন। অবশেষে মস্তকে হাত দিয়া দেখিয়া ক্ষিতীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি কে?"

ক্ষি। আমি একজন দরিদ্র পথিক। ঐ গাছটার গোড়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম, হঠাৎ আপনার বিপদ দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। আপনি কে, এবং কোথায় যাইতেছেন? আপনার গাড়ীখানা ত ভাঙ্গিয়া চূর-মার হইয়া গিয়াছে। এখন কি করিয়া কোথায় যাইবেন?

সা। আমি উড়িষ্যার পল্লী দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম,—এদেশে এখন বড় দুর্ভিক্ষ, উদ্দেশ্য তাহার তথ্য লওয়া; কলিকাতার একখানা খবরের কাগজে আমি কাজ করি। এখন পুরী অভিমুখে যাইতেছিলাম। তুমি কোথায় যাইবে?

ক্ষি। আমার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সাহেব। আমি বড় দরিদ্র—কিছু রোজগারের প্রত্যাশায় বাহির হইয়াছিলাম।

সা। তোমাকে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইতেছে,—রোজগারের জন্যে এদেশে কেন? এ বড় দরিদ্রদেশ। কলিকাতায় গিয়াছিলে কি? তথায় চাকুরী জুটিল না?

ক্ষি। না সাহেব,—কলিকাতায় অনেক দিন ঘুরিয়াছি, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিতে পারি নাই। আত্মীয় মুরুব্বী না থাকিলে তথায় চাকুরী জুটে না!

সা। এতেই আবার তোমাদের বাঙ্গালী বাবুরা জগতের সমক্ষে উন্নত জাতি বলিয়া মাথা তুলিয়া মাতাইতে চাহে! তোমার মত দরিদ্র, মাসিক পঞ্চাশটি টাকার সংস্থান করিতে পারিলেই মহা সন্তুষ্ট হয়,—সুখে পরিবার লইয়া দিন কাটাইতে পারে। এত বাবুপূর্ণ কলিকাতায়

গিয়া নিষ্ফল অন্বেষণের ক্লেশ ভোগ করিয়া তুমি তথা হইতে উদর-জ্বালায় বাহির হইয়া পড়িয়াছ! হায়! যারা স্বজাতীয় দরিদ্রের অনুসন্ধান করিয়া তাহার ভরণপোষণের সংস্থান করিয়া না দেয়, তাহারা কি কখনও জাতীয়ত্বে বড় হইতে পারে?—কখনই নয়! তাহাদের পক্ষে উন্নত জাতিরূপে পরিগণিত হওয়া সুদূর পরাহত—যুগযুগান্তর সাপেক্ষ!

ক্ষি। সাহেব, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আপনার গাড়ীখানি ত ভাঙ্গিয়া চুর-মার হইয়া গিয়াছে। অনুমান করি, পুরী এখান হইতে সাত আট ক্রোশ পথ হইতে পারে;—আপনি এখন কি প্রকারে যাইবেন?

সা। তাই ত বাবু,—তুমি কোথায় যাইবে?

ক্ষি। আমিও এদেশের সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। তবে ঐ যে দূরে ঘন সন্নিবিষ্ট নারিকেল গাছের শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে;—সম্ভবতঃ ঐখানে একখানি গ্রাম আছে। আমি ঐ গ্রামে গিয়া রাত্রি কাটাইব ভাবিতেছি।

সা। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আমার কথা এদেশের লোক প্রায়ই বোঝে না। এদেশে এখনও ইংরাজী পাঠ খুব কম। তোমার সঙ্গে থাকিলে আমার খুব সুবিধা হওয়া সম্ভব। ইহাতে বোধ হয়, তোমার কোন আপত্তি হইবে না।

ক্ষি। আপত্তি কি? আপনি চলুন। অনুমানে বোধ হয়, ঐ গ্রাম-খানি এখান থেকে এখনও এক ক্রোশ পথ দূরে। তবে সাহেব, আপনার গাড়ী লইবেন কি প্রকারে?

সা। উপায় নাই। ঐ গ্রামে গিয়া একটা মজুর ডাকিয়া লইতে হইবে।

ক্ষি। "তবে তাই হইবে; এখন চলুন।" এই কথা বলিয়া ক্ষিতীশ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, সাহেবও উঠিলেন। ক্ষিতীশ

বুঝিতে পারিলেন, অনেকখানি রক্ত-স্রাব হওয়ায় এবং সর্ব্বাঙ্গে আঘাত লাগায় সাহেব কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন ধীরে ধীরে উভয়ে নারিকেল বৃক্ষের মস্তিষ্ক লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁহারা যে গ্রামে পঁহুছিলেন, সে একটা নিতান্ত গণ্ড পল্লী। কতকগুলি কৃষক ও শ্রমজীবিমাত্র সে গ্রামে বাস করে। সাহেব দেখিয়া তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল। ক্ষিতীশ যদিও উড়িয়া ভাষা ভাল জানেন না, তথাপি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই বিপন্ন এবং তাঁহাদের অতিথি—ভয়ের কোন কারণ নাই।

একখানা ভগ্ন গৃহ-আঙ্গিনায় তাঁহাদের বাসা হইল। ক্ষিতীশ সাহেবকে সেখানে রাখিয়া, একটা মজুর লইয়া সাহেবের গাড়ী আনিতে সেই মাঠের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন এবং অনেক রাত্রে গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপরে দুগ্ধ, পক্ক রম্ভা ও কিছু অন্যান্য ফল আনিয়া সাহেবকে ভোজন করাইয়া, নিজে 'মায়িচুড়া' খাইয়া রাত্রি কাটাইলেন। তারপর দিন একখানা শিবিকা আনাইয়া সাহেবের পুরী যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একটা মজুর ভগ্ন দ্বিচক্র-যান-স্কন্ধে সঙ্গে গেল।

যাইবার সময় সাহেব বলিলেন,—"বাবু, তোমার ভদ্র ব্যবহারে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমিও আমার সঙ্গে পুরী চল।"

ক্ষি। সাহেব, আমি এদেশে কেবল চাকুরীর চেষ্টায় আসি নাই। এদেশের জগন্নাথ দেব আমাদের এক প্রধান দেবতা, তাঁহার দর্শন করিব,—দেশটাও দেখিব; আর সেই সঙ্গে যদি কাজ-কর্ম্মের একটা যোগাড় হইয়া যায়, ভালই; নচেৎ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।

সা। কলিকাতায় গিয়া আমার সঙ্গে * * নম্বর এস্‌প্লানেড রো'তে দেখা করিও। তোমার নাম কি এবং বঙ্গদেশের কোন্ গ্রামে বাড়ী, আমাকে বল।

ক্ষিতীশ নাম ও দেশের কথা বলিলেন,—সাহেব তাহা পকেট বহিতে লিখিয়া লইলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুবাজার ষ্ট্রীটের উপর একটি ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখের মহলে একটি ঔষধালয় স্থাপিত। ঔষধালয়টি বেশ জম্‌কালো। পাঁচ ছয় জন লোকে সর্ব্বদা কাজ-কর্ম্ম করে। দরোজার সম্মুখে সাইন বোর্ডে লেখা—'মিসেস্ জে, দাসের এলোপ্যাথিক ষ্টোর।—ডাক্তার ডি, সি, রায় এল্, এম্, এস্, সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধান করেন, এবং সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন।'

বাড়ীর মধ্যে দুইটি মহল,—যে মহলটি বড়, তাহাতে একজন ধনী মাড়োয়ারি সপরিবারে বাস করেন,—আর যেটি ছোট, তাহাতে যুথিকা দাস ডাক্তার ডি, সি, রায় (ওরফে) দানীশচন্দ্রকে লইয়া বাস করেন। পাঁচকড়িও আসিয়া তাঁহাদের সেই মহলে আশ্রয় লইয়াছে।

বুভুক্ষিতা গৃধিনী যেমন মাংসখণ্ডের প্রতি লোলুপ বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, যুথিকাও তেমনি পাঁচকড়ির দিকে চাহিয়া থাকিত। বেগবতী নদীর খরস্রোতঃ যেমন নদীবক্ষে স্থাপিত সেতুর জলগর্ভস্থ স্তম্ভগুলিতে প্রতিহতবেগ হইয়া উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যুথিকার হৃদয়ের অদম্য লালসা তেমনি পাঁচকড়ির আশে-পাশে সর্ব্ব অবয়বে বিক্ষুব্ধ, প্রহত ও বিপুলভাবে অবরুদ্ধ হইয়া অমিত প্রবল বেগ সঞ্চয় করিয়াছিল। সে বিপুল চিত্তবেগ দমন করিতে যুথিকা একান্ত অক্ষম!

সন্ধ্যার পরে ত্রিতলের ছাদের উপর দুইখানি আরাম চৌকিতে যুথিকা ও পাঁচকড়ি উপবিষ্ট।

উপরে অনন্ত আকাশ,—আকাশে জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রও ক্ষীণ-স্নিগ্ধ-প্রভ তারকার প্রেম-পুলক-পূর্ণ মিলন-মাধুরী। সে প্রেমের ধারায় জগতে আলোকাকীর্ণ। নিম্নে ধীর-সমীরের পুলক-গতি। তন্নিম্নে রাস্তার উপরে "চাই বেল ফুলের" ধ্বনি আর মানব-মানবীর পুলক-সঞ্চালন গতি।

যুথিকা সে দিন অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়াছিল। সে দিন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল—'আর সহ্য হয় না,—দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আর পুড়িয়া খাক্ হইতে পারি না। আ'জ শেষ,—হয় তাহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইব, নয় পদতলে ফেলিয়া উৎসবান্তের ফুলমালার ন্যায় দলিত করিব।' তাই সে সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই সকল আয়োজন করিয়াছিল। অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া—অপূর্ব্ব সৌরভ-রাশিতে সুকুমার-দেহ সুগন্ধ-সিক্ত করিয়া, মস্তকের কেশদামে বিচিত্র বেণী বিনাইয়া আরাম চৌকিতে উপবেশন করিয়াছে,—আকাশের কৌমুদী ধরাতলে নামিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে পাঁচকড়ি, পাঁচকড়ি ধীর, স্থির, গম্ভীর। সে গাম্ভীর্য্য বড় পবিত্র, বড় মধুর, বড় কঠিন! যুথিকার বেশে যে পারিপাট্য, গঠনে যে কমনীয়তা, কৃষ্ণ-কেশদামে যে রমণীয়তা, কটাক্ষে যে কুটিল বাণ, কপোলে যে অরুণিমা, অধরোষ্ঠে যে বিদ্যুৎ বর্ণে যে লালিত্য, বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিতে যে মৃদু হিল্লোল,—তাহাতে স্থির থাকে, এমন পুরুষ বিরল! পাঁচকড়ি সেই বিরলের মধ্যে একজন!

পাঁচকড়ি কি যোগী? এমন মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মহাযোগীশ্বরেরও যে মন টলে!—তবে পাঁচকড়ি কি? পাঁচকড়ি মাতৃ-উপাসক—শক্তি-সাধক।

পাঁচকড়ি তাই এই সংজ্ঞাবিহীন অনন্ত সৌন্দর্য্যকে তাহার উপাস্য দেবী মাতৃ-মূর্ত্তির বিকাশ বলিয়া মনে করিয়া গম্ভীর-পুলক-হৃদয়ে চিন্তা করিতেছিল। আর ভক্তি গদগদ কণ্ঠে অন্তরে অন্তরে মা বলিয়া ডাকিতেছিল। মা বড় মধুর শব্দ। মা নামে অদম্য রিপু শিথিল হয়, প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠে, নয়নে আনন্দাশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়। মাকে ডাকিতে শিখিয়াছে—রূপ রস গন্ধ স্পর্শময়ী অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী মাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাই পাঁচকড়ি আত্মজয়ী। চোক যত দিন ইন্দ্রিয়গণ রূপ রস শব্দ স্পর্শের কাঙ্গাল থাকিবে,—যত দিন ভোগ স্পৃহা-বশবর্ত্তী অপরিতৃপ্ত থাকিবে, তত দিন নূতন নূতন বাসনা উত্থিত হইবে। মনে বাসনা উদিত হইলে, তাহা ফলপ্রসব না করিয়া বিনষ্ট হইবে না। প্রকৃতি আমাদিগকে এইরূপেই বাঁধিতেছেন। কিন্তু যদি এই অনন্ত প্রকৃতিকে সর্ব্বজনয়িত্রী রূপে চিনিতে পারা যায়,—প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকা যায়, তবে তাঁহার কার্য্য ফুরায়। তিনি আত্ম-বিস্মৃত জীবাত্মাকে লইয়া, জগতের ভোগদ্বারা ভোগাইতেছিলেন,—যত প্রকার বিকার আছে, দেখাইতেছিলেন;—মা মা বলিয়া ডাক—দেখিবে, করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া যাইবেন, গিয়া,—যে জীবনের পথ চিহ্নবিহীন মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। ইহাকেই শক্তি-সাধনা বলে। এই সাধনার সাধকগণকে শক্তি-সাধক বলে। পাঁচকড়ি সেই সাধনায় সিদ্ধপুরুষ। কে বলিবে, প্রাক্তনের বলে,—পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে পাঁচকড়ি আত্মজয়ী নহে!

যূথিকা বলিল,—"শোন পাঁচকড়ি, আমার হৃদয় পানে চাহিয়া দেখ,—ইহার প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমাময় হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে চাই।"

পাঁচকড়ি গম্ভীর স্বরে বলিল,—"কেন অন্যায় বাসনা? আমি তোমার সন্তান!"

যু। ও পুরাতন কথা পরিত্যাগ কর। অনেক দিন বলিয়াছি,—আমি বন্ধনমুক্ত কামিনী—কাহারও সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি স্বেচ্ছাবিহারিণী—স্বেচ্ছায় তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার হও।

পাঁ। তুমি আমার মা।

যু। আবার সেই কথা! মনে করিও না, তোমার দাদা জানিতে পারিবে,—গোপনে আমরা আমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

পাঁ। আমাকে আর কুবাক্য বলিও না।

যু। শোন পাঁচকড়ি,—তুমি কি যে, তোমার পদতলে পড়িয়া এত করুণভিক্ষা করিতেছি, এ জীবনে এমন নিস্ফল রোদন কখনও করি নাই! ঈষন্মাত্র ইঙ্গিতে কত শত পতঙ্গ আসিয়া এ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। তাও বুঝি,—তথাপি তোমাকে ভুলিতে পারি না। তুমি অন্ততঃ এক দিন—একবার মাত্র আমাকে তোমায় "ভালবাসি" বলিয়া আদর কর, আমি কৃতার্থমণ্য জ্ঞান করিব—চরিতার্থ হইব।

পাঁ। আমি কি যুথিকা?—কেন আমার জন্য তোমার অত লালসা? ছি ছি, ভুলিয়া যাও। আমার দেহ, কাটিয়া দেখ—শৃগাল কুক্কুরের খাবার হবে—কয়েক দণ্ড ফেলিয়া রাখিলে পূতিগন্ধে এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না!

যু। পাষাণ! তবু শঠতা, প্রবঞ্চনা!

পাঁ। আমি তোমাকে মাতৃ-মূর্ত্তি বলিয়া জানি;—আবার বলিতেছি, মা! আমায় ক্ষমা কর—রক্ষা কর!

যুথিকার নয়নে অনল জ্বলিয়া উঠিল।—গম্ভীর তীব্র ও উত্তেজনাস্বরে,

বলিল,—আমার অনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আকুল প্রার্থনা—ঐকান্তিক মিনতি রক্ষা করিবে না?"

স্থিরভাবে দৃঢ়স্বরে পাঁচকড়ি বলিল "না।"

যুথিকা উন্মাদিনীর বেশে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহুযুগল আন্দোলন করিয়া, তীব্র স্বরে বলিল,—"তবে প্রস্তুত হও; মনে করিও না যে আমাকে জ্বালাইয়া তুমি সুখে থাকিবে। এই দেখ,—তোমাকেও জ্বলিতে হইবে।

যুথিকা পার্শ্বের কৌচের নিম্ন হইতে কি একটা পদার্থ বাহির করিয়া পাঁচকড়িকে দেখাইয়া বলিল—"চেন?"

পাঁ। চিনি।

যু। অবস্থা শুনিয়াছ?

পাঁ। শুনিয়াছি।

যু। তোমাকেই দোষী বলিয়া ধরাইয়া দিব।

পাঁ। আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

যু। যুথিকার সারা প্রাণ খানিকে পদতলে ফেলিয়া দলিত-নিষ্পিষ্ট চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছ! দেখিব, কি করিয়া সুখে থাকিবে? দেখিব, কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে? এখনও বল, আমার হবে কি? এখনও বল, আমার হবে কি? এখনও সময় আছে। এর পর আর এ সময়, এ সাবকাশ পাইবে না! তখন একান্ত বিলম্ব—আমারও আয়ত্তাতীত হইয়া পড়িবে! বল, প্রিয়তমে আমার হবে?

অবিকম্পিত কণ্ঠে পাঁচকড়ি বলিল,—"না।"

যুথিকা দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিল,—"এখনও না?"

পাঁ। মায়ের সহিত পুত্রের ব্যবহার সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই সমান।

যুথিকা আর সেখানে মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। দানবী-দীপ্তির উন্মাদ গমনে চলিয়া গেল। পাঁচকড়িকে যাহা দেখাইয়াছিল, যাইবার সময় তাহাও লইয়া গেল।

পাঁচকড়ি বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপরে মধুর কণ্ঠে একটি গানের কিয়দংশ পুনঃ পুনঃ গাহিতে গাহিতে নীচে নামিয়া গেল। সে গাহিতেছিল—

"কালভয়হরা কালি, দিস্ না কালের কোলে ফেলে।
মায়ের কেন হবে গো রাগ, হইলে অকৃতি ছেলে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রমণী অনন্তের মহিমা, বিশ্বের গরিমা, সৃষ্টির নৈপুণ্য। নারী বিলাসীর বিলাস, সাধকের সাধনা, যোগীর ধ্যান, তপস্যার প্রাণ। নারী রূপে শেফালিকা, মাধুর্য্যে অপরাজিতা, সরমে বনযুথিকা, সতীত্ব গরীমায় যোজনগন্ধা পারিজাত। নারী স্নেহের মন্দাকিনী, পবিত্রতায় গোমুখী, দয়াদাক্ষিণ্যে ভাগিরথী, প্রেমের ফল্গু। এই নারীই সহিষ্ণুতায় সীতা, পাতিব্রত্যে সাবিত্রী, তেজস্বীতায় দ্রৌপদী। নারী গৃহকার্য্যে গৃহিণী, সন্তান পালনে জননী, ক্ষুধার্ত্তের অন্নপূর্ণা, আর্ত্তের করুণা রূপিণী। নারীর অপার মহিমা ভাষায় ব্যক্ত হয় না,—ব্যাখ্যায় সম্পুর্ণ হয় না।

দেবী কেন দানবী হয়? মানবী কেন নাগিনী হয়? সতীত্ব নারীর স্বর্গীয় ধর্ম্ম, বা নারীত্বের সাংসারিক গর্ব্ব, যাহার তাহা নাই, সে নারীত্ব হারাইয়াছে। তখন দেবী দানবী হয়, মানবী নাগিনী হয়, গোলাপের গন্ধ গেলে কাট গোলাপ হয়,—স্বর্গের পারিজাত গন্ধ হারাইয়া মর্ত্ত্যে পাল্‌তে মাদার হয়। যুথিকা উন্মত্ত ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম উত্তেজনায় সেই অমূল্যধন লালসার পঙ্কিল হ্রদে বিসর্জ্জন দিয়াছে;—তাই দেবী দানবী হইয়াছে; তাই সে রমণী নাগিনী হইয়াছে। পাঁচকড়ির সংযমের নিকট তাহার লালসা নিষ্ফল প্রার্থনায় জলিয়া উঠিয়াছে—তাই তখন সে দৃপ্তা ফণিনী। লালসার লেলিহান শিখা তাহার নয়নদ্বয়ে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে; তাহার প্রতি নিশ্বাসে দাবাগ্নিতাপ প্রবলবেগে প্রবাহিত, তাহার প্রতি কথায় পলকে পলকে গরল উদ্গীরিত হইতেছে।

সে ত্রিতল হইতে দ্বিতলে নামিয়া গিয়া একখানা সোফায় বসিয়া

পড়িল, এবং একটা বেহারা ডাকিয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আন্।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। গৃহমধ্যে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল। যূথিকা উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেয়াল-লম্বিত একখানা প্রকাণ্ড আয়নার নিকটে গিয়া আপনার ছবি সে দর্পণে নিরীক্ষণ করিল! তারপরে সোফায় আসিয়া বসিল,—অতি মৃদুস্বরে দৃঢ়তরকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"মূঢ় তুমি, এমন অপ্সরারূপপূর্ণ পরিণতদেহ প্রেমভরা-প্রাণ বিনা মূল্যে উপঢৌকন দিবার আকুল আহ্বান পায়ে ঠেলিলে? দর্পান্ধ! দেখিব তোমার কত দর্প? এমন অপ্সরা-রূপ, এমন নবীন যৌবন, এমন উন্নত শিক্ষা এতাধিক বিলোল লালসা—এ সকল লইয়া তোমার চরণ-প্রান্তে এই চারি মাস সাধিয়া যাচিয়া কাঁদিয়া দেখিলাম,—কিন্তু তোমার এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! তুমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলে না! সেই জন্যই ত এই ষড়যন্ত্র করিয়া আজ শেষ জবাব লইলাম। পাষাণ! এখন তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে থাক। পাঁচকড়ি থাকিলে যুথিকার প্রাণ স্থির হইবে না,—যাহাতে তোমার শেষ হয়,—যাহাতে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়,—এখন আমার একমাত্র তাহাই লক্ষ্য, তাহাই উদ্দেশ্য!

এই সময় সেই স্থানে ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দৃপ্তা দানবীর বেশে যুথিকাকে অতি উৎকট সুন্দর দেখাইতেছিল। দানীশ সে গরলে মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এত সজ্জা কেন?"

যু। এক কথা শুনিয়াছ?

দা। অনেক কথা ত বাহির হইতে শুনিয়া আসিলাম,—এখন তোমার কথা তুমি না বলিলে অন্যত্রে শুনিব কি প্রকারে?

যু। তোমার রসিকতা রাখ,—ব্যাপার বড়ই গুরুতর।

দা। কি?

যুথিকা ত্রিতল হইতে আনীত সেই দ্রব্যটা বাহির করিয়া দেখাইল। দানীশ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"উহা এ বাড়ীতে আসিল কি প্রকারে?"

যু। তোমার ভ্রাতার কীর্ত্তি!

দা। সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়া কি করিল?

যু। আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি—তাহারাও জানিয়াছে।

দা। এখন কি করিতেছে?

যু। পুলিসে যাইবে,—ধরাইয়া দিবে!

দা। উপায়?—তুমিই যত আপদ টানিয়া আনিতে পার। আমি উহাকে জানি,—সেই মজঃফরপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—তুমিই আবার টানিয়া আনিলে। এখন মান যায়—জা'ত যায়; যাহা হয় কর।

যু। তা' করিতে হইবে বৈ কি! আমি এখনই মাড়োয়ারীর মায়ের কাছে যাইব,—তুমি মাড়োয়ারীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া দাও—এবং লিখিয়া দাও পাঁচকড়িকে সত্বরেই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব। তাহা হইলে আমি সকল গোল মিটাইয়া আসিতে পারিব।

দানীশ কি চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন,—"আমি আগেই লিখিয়া স্বীকার করিব?"

যু। তাহারা জানিতে পারিয়াছে—এখন যদি পাঁচকড়ি ও হারছড়া এই দুই-ই সরাইয়াও দেওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহারা মোকদ্দামা করিবে। আমাকে সাক্ষী মানিবে। আমি প্রাণ থাকিতেও মিথ্যা

কথা বলিতে পারিব না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজ্য—পাঁচকড়ি কোথায় পলায়ন করিবে?

দা। তবে এমন ভাবে চিঠি লিখিয়া দিই যে, ধরিয়া ছুঁইয়া না পায়।

যুথিকা তাহাতে সম্মতি দিল। দানীশ লিখিল,—

"আমার মুখ চাহিয়া দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। তাহাকে শীঘ্রই এখান হইতে বিদূরিত করিয়া দিব এবং যে কয়দিন এখানে থাকে, দৃষ্টির উপরে রাখিব। আপনার জিনিষ পাঠাইলাম।

শ্রীদানীশ।"

যুথিকা সেই পত্র ও হার লইয়া উঠিয়া গেল। দানীশ পাঁচকড়িকে ডাকাইলেন।

আসল কথা এই যে, সেই বাড়ীর অপর মহলবাসী মাড়োয়ারীর স্ত্রীর একছড়া কণ্ঠমালা ও একটি অঙ্গুরীয়ক হারাইয়াছিল। মাড়োয়ারি-মহিষী ভয়ে সে কথা স্বামীকে বলেন নাই। পরে যখন মাড়োয়ারী স্বয়ং সন্ধান জানিতে পারিলেন, যে তাঁহার স্ত্রীর সেই দুইখানি অলঙ্কার নাই, তখন পীড়াপীড়ি করিলেন। স্ত্রী বলিলেন,—"হারাইয়াছে, আমি জানিতাম না।" মাড়োয়ারী মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রে বড় বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্ত বলিয়াই এ অবিশ্বাস,—নতুবা তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী। স্বামী এ ব্যাপারে অনেকরূপ সন্দেহ করিলেন,—তারপরে পুলীসে অপহৃত দ্রব্যের তালিকা দিয়া আসিলেন। সে আ'জ তিন দিবসের কথা। এক বাড়ীতে বাস, সুতরাং এ সমস্ত কথা এ বাড়ীর সকলেই জানিত।

এই কুকার্য্য যুথিকার। যুথিকা পাঁচকড়ির নিকট নিজ অভিলাষ পূরণে অসমর্থ হইয়া, শেষে চরম চেষ্টা করিয়া দেখিল। মাড়োয়ারীর

মহলে যুথিকা যাইত,—সেই অলঙ্কার চুরি করিয়া আনিয়াছিল। দানবীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রতিকূল-বৃত্তি প্রতিহিংসার অনলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাই সে পূর্ব্বাহ্ণেই পাঁচকড়ির সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিল।

বেহারার সহিত পাঁচকড়ি আসিয়া তাহার দাদার নিকটে দাঁড়াইল। বেহারাকে বিদায় দিয়া দানীশ ক্রোধ-কর্কশ-কণ্ঠে বিরক্তিভাবে বলিলেন,—"আমার মাথা খাইতে এখানে কেন আসিলে?"

পাঁ। কেন? কি করিয়াছি?

দা। এখনও কি করিয়াছ? পাজী,—তোর জন্যে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! হার চুরি ক'রেছিস্ কার?

পাঁ। আমি চুরি করি নাই।

দা। তবে রে মূর্খ!—আমি চুরি করিয়াছি?

পাঁ। আপনার পা ছুঁইয়া বলিতে পারি, আমি চুরি করি নাই। সে হার সর্ব্বপ্রথমে আমি যুথিকার হাতে দেখিয়াছি।

দা। তবে যুথিকা চুরি করিয়াছে?

পাঁ। আমি জানি না।

দা। নেমকহারাম;—যুথিকা তোর জন্যে এত চেষ্টা করে, সে তোকে পুত্রাধিক স্নেহ করে, সে তোর জন্যে পরের পা ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গেল, আর তুই বলছিস্ কিনা, যে তাহার হাতেই তুই প্রথম হার দেখেছিস্। নেমকহারাম,—কুকুর; আমার এখান থেকে দূর হ!

ছল ছল নেত্রে পাঁচকড়ি বলিল,—"যুথিকা আমার মা, কেন আমাকে স্নেহ করিবেন না? আমি কা'ল সকালের গাড়ীতেই চলিয়া যাইব। কিন্তু দাদা—অভয় দিন। একটা কথা বলিব,—আপনি

জ্যেষ্ঠ সহোদর—আপনার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, তাই বলিব। আপনি উহার সঙ্গ ছাড়ুন। ঘরের লক্ষ্মী অন্নাভাবে—যত্নাভাবে দিবানিশি হাহাকার করিতেছেন; আর আপনি বিষধরীর বিষে জর্জ্জরিত হইতেছেন!”

দানীশ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। পাঁচকড়ি বাড়ী যাইবার জন্য তাহার কাপড়-চোপড় গুছাইতে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাড়োয়ারী মহাশয়ের নাম যাহাই হউক, সকলে তাঁহাকে রাজা-সাহেব বলিত। এ খেতাব, তাঁহার কেন হইল, তাহার সবিশেষ কারণ কেহ অবগত না থাকিলেও সকলেই তাঁহাকে রাজাসাহেব বলিত,—আমরাও তাহাই বলিব।

রাজাসাহেবের ধরণ-চলন-বসন সবই আধুনিক ভাবস্পৃষ্ট হইলেও জাতীয়তা-বিবর্জ্জিত নহে। তাঁহার পিতা স্বদেশ হইতে রিক্তহস্তে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে পৃষ্ঠে বস্ত্রের পশরা লইয়া পথে পথে ফেরী করিয়া কালে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, পরলোকে গমন করেন। রাজাসাহেবের কলিকাতাতেই জন্ম,—কলিকাতার ইংরাজী বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটিয়াছে।

তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন না। পিতৃ উপার্জ্জিত অর্থ, ব্যবসায়ীদিগকে কর্জ্জ দিয়া সুদ আদায় করেন। বাড়ীখানি তাঁহার নিজের,—দুইটি মহল ভাড়া দিয়া একটিতে আপনারা বস-বাস করিতেন। যুথিকার উপরে তাঁহার একটু অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, কিন্তু যুথিকা আর সে যুথিকা নাই,—সে স্বাধীন প্রাণে মুক্ত গগনে ফিরে না—তাহার হৃদয়ে বেদনা জাগিয়াছে, একজনকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তবে সূর্য্যকিরণের যেমন পাত্রভেদে রূপভেদ হয়, ভালবাসারও তেমনি হয়। রাজাসাহেবের অনুগ্রহদৃষ্টি যুথিকার উপরে পড়িয়াছিল, যুথিকা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল—কিন্তু সে কোন দিন তাঁহার প্রতি নেকনজরে চাহে নাই।

আ'জ যুথিকা স্বেচ্ছায় রাজাসাহেবের দুয়ারে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজাসাহেবকে ডাকিয়া নিভৃতে লইয়া দুইখানি আসনে মুখোমুখি হইয়া দুইজনে বসিল।

রাজাসাহেব বলিলেন,—"ডাক্তারসাহেবা, কি জন্য আ'জ আমার গৃহ পবিত্র করিলেন? আমার পরম সৌভাগ্য।"

যু। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বুঝি না রাজাসাহেব, আমি আপনাকে ভালবাসি,—আপনার অনিষ্ট, প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না—তাই আসিয়াছি।

রা। ভালবাসেন!—কি মধুর অমৃতধারা আমার চিত্ত-ভূমি পবিত্র করিল! কি অনিষ্ট ডাক্তারসাহেবা?

যু। সে কথা বলিলে আপনার অতি পবিত্র কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিতে পারে।

রা। এমন কি সংবাদ?—আমি প্রস্তুত হইলাম, আপনি বলুন।

যু। আপনাকে বড় ভালবাসি, তাই বলিতে আসিয়াছি—নতুবা আপনাদের অনিষ্ট—আপনাদের কলঙ্ক কে কোথায় ব্যক্ত করিয়া থাকে? কে সাধ করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে?

রা। কি হইয়াছে, আপনি বলুন; আপনার কথায় আমি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।

যু। আপনার স্ত্রী পবিত্র রমণী—কিন্তু তথাপি তাঁহার যৌবনের উদ্দাম লালসা ডাক্তার সাহেবের ভাই পাঁচকড়ির উপরে পতিত হইয়াছে।

রাজাসাহেব লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কপালের শিরা সকল কুঞ্চিত হইয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"সে কি! এ কথা আপনাকে কে বলিল?"

যু। শুনুন রাজাসাহেব; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—এত ভালবাসি বলিয়াই, আপনাকে এই সকল গোপনীয় সংবাদ দিতে আসিয়াছি। অস্থির হইবেন না—পুরুষোচিত ধৈর্য্যসহকারে সকল কথা শুনুন।

রা। শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না—বলুন, খুব অল্পের মধ্যে বলুন। প্রমাণ সহ বলিতে হইবে—বলুন,—বলুন, আর দেরি করিবেন না।

যু। আপনার স্ত্রীর হার ও অঙ্গুরী, আপনার স্ত্রী পাঁচকড়িকে দিয়াছিলেন।

অধিকতর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"মিথ্যা কথা! সেগুলি যে হারাইয়া গিয়াছে! আপনাকে এ মিথ্যাসংবাদ কে দিয়াছে?"

যু। হারাইলে আপনার অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই আপনার স্ত্রী সে কথা আপনাকে জানাইতেন। এই দেখুন সে হার আর অঙ্গুরী।

রাজাসাহেবের চক্ষু দিয়া অনল ছুটিল,—মস্তক ঘুরিয়া গেল,—হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন,—"এমন!"

যু। উতলা হইবেন না, আপনি পুরুষ মানুষ—সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় সামান্য ব্যাপারে অস্থির হইবেন না! শুনুন,—সব কথা শুনুন।

রা। আর শুনিতে চাহি না।—আচ্ছা,—বলুন।

যু। এর জন্য ডাক্তারসাহেব আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছেন,—এই দেখুন। ক্ষমা করিতে হইবে; দয়া করিতে হইবে।

যুথিকা রাজাসাহেবের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। রাজাসাহেব আলোকতলে সে পত্র পাঠ করিয়া শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

কর্কশকণ্ঠে কহিলেন—"ক্ষমা ; পাঁচকড়ির রক্তে ইহার ক্ষমা! আপনি যান্।"

যু। আপনি অত উতলা হইলেন কেন? আবার বলিতেছি—রাজাসাহেব, প্রাণাধিক! আমি আপনাকে ভালবাসি—বড় ভালবাসি বলিয়াই এ সব কথা বলিয়াছি, কিন্তু সাবধান হউন—সহ্য করুন। আপনাকে ব্যথিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

রা। কুকুর—উচ্ছিষ্টভোজী, তাহার বিনাশে কোন পাপ নাই।

যু। কিন্তু আপনার বিপদ আছে।

রা। আমার বিপদ?—যাহার স্ত্রী অপরে আসক্ত, তাহার আবার বিপদ সম্পদ কি ডাক্তারসাহেবা?

যু। কুসংস্কার—আপনাদের কুসংস্কার। ভালবাসা জোর করিয়া হয় না। ডাক্তার সাহেব আমাকে এত যত্ন করেন, কিন্তু আমার প্রাণ কেন আপনার চরণ-তলে লুঠিয়া বেড়ায়?

রা। জানি না ডাক্তারসাহেবা ; কোন কথা ভাবিবার অবকাশ নাই,—সমস্ত হৃদয় ছাইয়া আগুন জ্বলিয়াছে—পাঁচকড়ির রক্ত বিনা বুঝি ইহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

যুথিকা বুঝিল, তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই। বিষ-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি করিতে চাহেন?"

রা। পাঁচকড়ির বুকের রক্ত পান।

যু। সামান্য কারণে নিজের জীবনকে কেন বিপন্ন করিতে চাহেন? ইংরেজের রাজত্ব—ইংরেজপ্রজার খুনের জন্য খুন হইতে হয়।

রা। সেও স্বীকার।

যু। না, আপনার অনিষ্ট হয়—ইহা অসহ্য। আপনি উহাকে জেলে পাঠান।

রা। আমাদের রক্ত এখনও বাঙ্গালীর রক্তের মত শীতল হয় নাই।

যুথিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুতে অনল জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—তবে 'তাই। আজই কর্ম্মসাধন করিতে হইবে। শুনুন, রাজাসাহেব;—পাঁচকড়ি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—বলপ্রকাশে আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। আমার কতকগুলি অর্থ ছিল, চুরি করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে,—তাহার মৃত্যুতে আমার সুখ—তাহার রক্তে আমার শান্তি! তুমি একজন গুপ্তঘাতক দিবে—সে নিশ্চয়ই কল্য সকালে বাড়ী যাইবে। কাজেই আজই ডাক্তারখানার মধ্যে গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া আসা চাই। সে ডাক্তারখানায় শোয়,—আমি ডাক্তারখানার দরোজা খুলিয়া রাখিব।"

রাজাসাহেব কিছু বুঝিলেন না, কোন কথা ভাবিয়া দেখিলেন না, কুচক্রী রাক্ষসীর কুটীল মন্ত্রণায় তিনি অবাধে স্বীকৃত হইলেন। উদ্দেশ্য সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া যুথিকা চলিয়া গেল।

রাজাসাহেব তাঁহার অতি বিশ্বাসী পাচকব্রাহ্মণকে ডাকিয়া পাঁচকড়িকে হত্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে পাঁচকড়িকে চিনিত। রাজাসাহেব এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে দুই সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিতে চাহিলেন, এবং বলিলেন—"কার্য্য সমাধা করিয়া, টাকা লইয়া সে যেন প্রভাতের পূর্ব্বেই দেশে চলিয়া যায়।"

পাচক ব্রাহ্মণ দুই সহস্র মুদ্রার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিল। তারপর স্বীকৃত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারখানার ভৃত্য আসিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে দরোজায় আঘাত করিয়া পাঁচকড়িকে জাগাইত, এবং পাঁচকড়ি উঠিয়া দরোজা খুলিয়া দিলে, সে গৃহপ্রবেশ করিয়া গ্যাস নিবাইত ও গৃহ মার্জ্জনাদি করিত।

সেদিনও সে, সেইরূপ প্রত্যুষে আসিল। দরোজায় আঘাত করিবামাত্র দরোজা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গেল। সে বিস্মিত হইয়া গৃহপ্রবেশ করিল, এবং পাঁচকড়ির শয্যার নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল!

পাঁচকড়ি শয্যায় নাই। রক্তে তাহার সমস্ত বিছানা প্লাবিত—শয্যা হইতে রক্তধারা কক্ষতল পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিয়া ভৃত্য খুন হইয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল।

দানীশের কাণে সে রব প্রবেশ করিল। তিনি ভিতর মহলের দ্বিতলে শয়ন করিতেন। তথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া তিনিও চীৎকার করিতে লাগিলেন। পথের পাহারা-ওয়ালা চীৎকার শুনিয়া সেখানে আসিল। বাড়ীর মধ্য হইতে রাজা সাহেব, যুথিকা দাস প্রভৃতি সকলেই সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঁচকড়ির হৃদয়-রক্ত-দর্শনে রাজাসাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। যুথিকার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল,—প্রাণের মধ্য হইতে করুণ-বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইল। দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল—"পাঁচকড়ি নাই?"

তাহার নয়নে অশ্রু ছিল না, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন প্রবাহিত, মুখ বিশুষ্ক—যেন উন্মাদিনী!

সে আগে বোঝে নাই পাঁচকড়ি মরিলে—পাঁচকড়ি নিহত হইলে তাহার জ্বালা এত বাড়িবে! প্রবৃত্তি অনুশাসিতা কামনার ক্রীতদাসী সে;—সে আদৌ মনে ভাবে নাই যে, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার উপরে অভিমান পর্য্যন্ত খাটে না! সে পূর্ব্বে কখন ভালবাসে নাই—লোকের হৃদয়-মন-প্রাণ লইয়া খেলা করিয়া—ভালবাসা চরণে দলিত করিয়া হাসিয়া কাটাইয়াছে। কিন্তু পাঁচকড়িকে সে যথার্থ ভালবাসিয়াছিল—অজ্ঞাতে তাহার চরণে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিল। এতদিনে সে বুঝিল—পাঁচকড়ি তাহার অজ্ঞাতসারে অলক্ষ্যে তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গিয়াছে! হায়, একি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! প্রাণ লইয়া খেলা করিতে করিতে একি প্রাণঘাতীব্যাপার ঘটিয়াছে! সে নিজের বুক নিজে কাটিয়াছে! রক্ত—রক্ত—কার রক্ত—উঃ! কি ভীষণ! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। বসিতে পারিল না,—জগৎ যেন হঠাৎ ভীষণ নরকাগ্নিময় হইয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দানীশ কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, রাজাসাহেবের কোন লোক সেই তাঁহার স্নেহ মায়ার আধার কনিষ্ঠ সহোদর পাঁচকড়িকে তাহার এই নবীন যৌবনে নিহত করিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্যকে থানায় যাইয়া দারোগা বাবুকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সদলবলে পুলীসের ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া ঘটনাস্থল উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়, একখানি রক্তাক্ত ছোরা বাহির করিলেন। তারপর

ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কখন আসিয়া দরোজা খোলা পাইলে?"

ভৃ। ভোর পাঁচটা হইবে। আমি রোজই ঐ সময় আসিয়া বাবুকে ডাকিতাম, তিনি দরোজা খুলিয়া দিতেন।

ই। দরোজা প্রত্যহই ভিতর দিয়া বন্ধ থাকিত?

ভৃ। হাঁ,—কা'ল আমি রাত্রে যখন যাই, তখন বাবু দরোজা বন্ধ করিলেন, ইহা আমি বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

ইন্‌স্পেক্টর দানীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হয় ঘাতক বাড়ীর মধ্যের কেহ, নয় বাড়ীর মধ্য দিয়া আসিয়া ঐ ছোরা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে এবং অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় শবদেহ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে সংখ্যায় তাহারা একাধিক, একজনে এরূপ করিতে পারে না।

"তবে কি আর তাহাকে পাইব না?"—এই কথা বলিয়া দানীশ সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। এ উক্তি বিষাদোদ্বেলিত হৃদয়ের তীব্র উচ্ছ্বাস!

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তাঁহার অভিপ্রায় মতে অনুসন্ধান কার্য্য সম্পাদন করিয়া বেলা দশটার সময় চলিয়া গেলেন।

দানীশ তখনও সেইস্থানে বসিয়াছিলেন। ভৃত্য পুলিশের অনুমতি পাইয়া গৃহতলের রক্ত ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। রক্তাক্ত বিছানা-বালিস পুলিস থানায় লইয়া গিয়াছিল।

দানীশ তখন সেখানে একা কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য শোকে-মোহে মুহ্যমান—হৃদয়-বেলায় পড়িয়া প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এত দীর্ঘ দিনের পরে জন্মপল্লীর কথা মনে পড়িল—সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িতেই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিলেন—মা, মা,—তোমার কোলের ছেলে পাঁচু আর নাই মা;—এ সংবাদ যখন পাইবে, তখন তোমার কি দশা হইবে মা? মা, মা,—আমারই অসাবধানতায় তোমার নয়নমণি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই সময় ডাক-পিয়াদা আসিয়া দানীশের সম্মুখে দুই খানি পত্র রাখিয়া গেল। একখানি বাড়ী হইতে আসিয়াছে, অপরখানি তাঁহার পরিচিত কামারহাটীর জমিদার রামপ্রাণ বসু লিখিয়াছেন,—সেখান পোষ্টকার্ড কাজেই আগেই সেখানা পড়িলেন। রামপ্রাণ বসু লিখিয়াছেন,"পত্রপাঠ এখানে আসিবেন,—আমার বাড়ীর একটি মেয়ের জীবন সংশয়। টাকাকড়ি আসিবামাত্র দিব। অন্যকাজ থাকিলে সে সব ছাড়িয়া আসিবেন,—যদি ক্ষতি হয়, ক্ষতিপূরণ করিব। আপনি কয়েকবার আমার বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে আসায় আপনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে আমার বাড়ীর সকলেই আপনার উপর শ্রদ্ধাবান্।"

তৎপরে খামে আঁটা বাটীর চিঠিখানা খুলিলেন। ক্রোড়স্থ মুমূর্ষু সন্তানের ম্লান মুখ দেখিয়া জননীর প্রাণ যেমন ব্যথিত-বিদীর্ণ হয়,—কোথায় যাই, কি করি বলিয়া লুঠিতে থাকে, পত্রপাঠ করিয়া দানীশের অবস্থাও সেইরূপ হইল।

পত্র বিষ্ণু সরকার লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"দানীশ, তোমাদের বংশে তুমিই লেখাপড়া ভালরূপ শিখিয়াছিলে,—আত্মীয়-স্বজনে তোমার নিকট অনেক আশা করিয়াছিল; কিন্তু তুমি একেবারে অধঃপাতে গেলে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সকলই ফুরাইল। সে সব কথা যাক্,—সর্ব্বোপরি বিপদ; ন'বধূমাতা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে বাজেলোকে অনেক কথা বলিতেছে, কিন্তু আমরা জানিতেছি, সে নিষ্পাপ-প্রাণ অত্যা-

চারের বিষম দহনে অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল,—তাই না বুঝিয়া অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া শ্রান্তি-সোয়াস্তি লাভাশায় কোথায় উধাও হইয়া ছুটিয়াছে! তোমার মায়ের অবস্থা অতি শোচনীয়। পত্রপাঠ বাড়ী আসিবে,—আসিবার সময় পাঁচকড়িকেও সঙ্গে আনিবে।"

"ন'বৌ,—ন'বৌ, তুমি কি অসতী? হা, হতভাগ্য দানীশ! এতদিন পরে কোন্ মুখে ন'বৌর নাম উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেছ?"

দানীশ নিজে নিজে এই কথা বলিলেন, তারপর মনে হইল পাঁচকড়িকে সঙ্গে লইয়া যাইব?—হায় পাঁচকড়ি, তুমি কোথায়!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় দানীশ নিথর নিশ্চল ভাবে অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া আত্মীয়-স্বজন, দেশবিদেশ, আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-নরক,—কত কি চিন্তা করিলেন। তারপরে আপন মনে বলিলেন,—"অসহ্য তাপ! কি করি—কোথায় যাই?—কোথায় যাইলে প্রাণের এ ভীষণ জ্বালা শীতল হয়? রামপ্রাণ বাবুর বাড়ী যাই। রেলে ভ্রমণ—বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাতে যদি ক্ষণেক কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারি; —এ আগুণের জ্বালা যদি একটু শীতল হয়।"

দানীশ উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন। পাচকের রন্ধনকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছিল। তিনি রামপ্রাণ বাবুর বাড়ী যাইবেন বলিয়া, স্নান করিলেন,—নামমাত্র একবার আহারে বসিলেন,—সে অন্যমনস্ক ভাবে—একবার না বসিলে নয়, তাই বসিলেন। তারপরে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যুথিকা স্নান আহার করিয়াছে?"

ভৃত্য বলিল,—"না। তাঁহার গতিক বড় মন্দ। তিনি পাঁচুবাবুর জন্য কেবল হাহাকার করিতেছেন,—যেন পাগলের মত হইয়াছেন।"

দা। কোথায় আছে?

ভৃ। শোবার ঘরে।

দানীশ মফঃস্বলে যাইবার পোষাক পরিধান করিয়া যুথিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেলেন।

যুথিকার মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্করী হইয়াছে। মস্তকের চুল আলুলায়িত—বসন স্খলিত—চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। প্রকৃতই সে উন্মাদিনী হইয়াছে! সে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না,—দাঁড়াই-

তেও পারিতেছে না। কখন বসিতেছে, কখন উঠিতেছে,—কখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দানীশ যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। উন্মাদের বিকট শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল,—"কি ডাক্তারবাবু যে? কনিষ্ঠ ভ্রাতার রক্তপান করিয়া পেট ভরে নি,—আবার পেটের জন্যে টাকা আন্‌তে যাচ্চ? হাঃ—হাঃ—পাঁচকড়ি—হিঃ, হিঃ, আমি তাহার নাম করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

দানীশ তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যথার উপর ব্যথা পাইলেন। বলিলেন,—"যূথিকা, তুমি কি পাঁচকড়িকে ভালবাসিতে?"

যূথিকা উন্মাদ-তীব্র, কঠোর-গম্ভীর স্বরে বলিল,—"ভালবাসা? কার ভালবাসা? ও, পাঁচকড়িকে ভালবাসিতাম? দূর—তুমি পাগল! আমি হীন—সে মহৎ। আমি পাপী—সে পুণ্যাত্মা। আমি সাপিনী—সে দেবতা! তাহাকে কি আমি ভালবাসিতে পারি? তাহাকে ভালবাসিতে হইলে স্বর্গের পবিত্র প্রাণ চাই। এত যে অত্যাচার করিলাম—আমার হইবার জন্য তাহার পায়ে যে এত চক্ষুর জল ফেলিলাম, তবু ত সে আমার হইল না? হবে কেন? সে মহৎ—সে পবিত্র! আমি তাহাকে স্বহস্তে বলি দিলাম,—কিন্তু আমার কলঙ্ক কাহিনী সে ত কোন দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই—ঘুণাক্ষরে বলে নাই!"

দানীশ পড়িয়া যাইতেছিলেন। সামলাইয়া বলিলেন,—"যূথিকা, তুমি?" সেইরূপ দানবী দীপ্তিময়ী বিকট তীব্র চাহনিতে দানীশের মুখের দিকে চাহিয়া সেইরূপ উন্মত্ত প্রলাপস্বরে যূথিকা বলিয়া গেল,—"না না, আমি নই। সব ভুল বলিয়াছি। কিন্তু জানি সব,—অপেক্ষা কর। ভাবিতে দাও—পাঁচকড়িকে ভাবিতে দাও, তারপর সব বলিব।"

ঠিক এই সময় রাজাসাহেবের মহলে মহাগোলযোগ উত্থিত হইল। একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আপনি শীঘ্র আসুন। আমাদের মনিব-পত্নী গলায় দড়ি দিয়াছেন। অনেকক্ষণ—গো অনেকক্ষণ, বোধ হয় প্রাণ নাই।

দানীশচন্দ্র রাজাসাহেবের মহলে ছুটিয়া গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, অনেক লোক যুটিয়াছে,—শবদেহ মাটিতে নামান হইয়াছে। দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে।

পুলীশ আসিয়া দানীশকে জিজ্ঞাসা করিল,—ডাক্তারবাবু লক্ষণ দেখিয়া কি উদ্বন্ধনে মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান হইতেছে? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়. একই দিনে একই বাড়ীতে একটি যুবক ও একটি যুবতী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অনুমান হয়, এই দুইটী হত্যার মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে।"

দানীশ দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,—বাহিক লক্ষণ দেখিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা বলিয়াই ধারণা হয়। করোণারের বিশেষ পরীক্ষায় সব যথাযথ প্রকাশ পাইবে।"

পুলীশ মৃত দেহ "মোর্গে" পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচকড়ির হত্যার সহিত এই উদ্বন্ধনের যে সম্বন্ধ আছে, এ ধারণা পুলীশ-কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে দৃঢ় ভাবেই জন্মিয়াছিল। এই সূত্র লইয়াই যে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, তাহাও পুলীশ কর্ম্মচারিগণ বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলেন।

রাজাসাহেব হঠাৎ বড় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তিনি দানীশকে মফঃস্বলে যাইতে দিলেন না। বলিলেন,—"ডাক্তারবাবু, অপেক্ষা করুন। হাঙ্গামাটা মিটিয়া যাক্—করোণারের রিপোর্ট দেখিয়া তবে আপনি বাড়ী হইতে যাইবেন। উপর্য্যুপরি দুইটা খুন,—আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

পুলীশ ইন্‌স্পেক্টর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজাসাহেব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন,—এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আতঙ্কের একটা ঘন আভা বিকাশ পাইতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল। মনে করিলেন, হয় ত পাঁচকড়ির সহিত রাজাসাহেবের যুবতী স্ত্রীর অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে, পাঁচকড়ি রাজাসাহেব বা তাঁহার কোন অনুগত লোকের দ্বারা নিহত হইয়াছে, এবং স্ত্রীকেও নিহত করিয়া কণ্ঠে রজ্জু আবদ্ধ করিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়াছে। করোণারের পরীক্ষার পর তদন্ত আরম্ভ করিবেন মনে করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু দুই তিন জন গোয়েন্দাকে বাড়ীর চারিধারে রাখিয়া গেলেন।

দানীশের প্রাণে ঘোর অশান্তি,—কিন্তু তথাপি তিনি যন্ত্র-চালিত পুতুলের ন্যায় করোণারের পরীক্ষা ফল জানিতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন—উদ্বন্ধনে মৃত্যুই ঠিক। রাজাসাহেবকে বিদায় দিয়া তিনি কামারহাটীর রামপ্রাণ বাবুর বাড়ী যাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিলেন।

তখন অপরাহ্ণ চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে—দানীশ ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীর মধ্যে দানীশ একা! সহস্র সহস্র চিন্তা তাহাদের লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া দানীশকে ক্লান্ত-ব্যথিত ও মর্ম্মাহত করিয়া তুলিতেছিল।

যূথিকা কি উন্মাদ হইয়া গেল? যূথিকা কি বলিতেছিল—পাঁচকড়িকে পাপ প্রস্তাবে সম্মত করাইতে না পারিয়া হত্যা করিয়াছে; উঃ কি সর্ব্বনাশ! তবে কি পুণ্যহৃদয় ভাই আমার ঘৃণিত বেশ্যার হস্তে নিহত হইয়াছে! আমি নরাধম, সব ভুলিয়া ঐ গণিকার মোহে

মজিয়া আছি! উঃ! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি,—আমারই দোষে আমার স্ত্রী নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। হৃদয়! এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না! শাস্তি;—আমি অধম, অপবিত্র, ইন্দ্রিয়-দাস—তুমি হিন্দুকুলবধূ, তুমি কেন অমন কার্য্য করিলে? তুমি কেন আমায় ছাড়িয়া গেলে? কেন আমার প্রতি বিরূপ হইলে? কেন আমার হৃদয়ে তুষের আগুণ জ্বালিলে?

এই সময় গাড়ী কামারহাটী ষ্টেসনে দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুলীর চীৎকারে দানীশের চৈতন্য হইল। চঞ্চল-কাতর ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া দানীশ নামিয়া পড়িলেন। ষ্টেসনে তাঁহার জন্য শিবিকা ছিল,—তাহাতে আরোহণ করিয়া কামারহাটী চলিলেন;—ষ্টেসন হইতে কামারহাটী গ্রাম এক মাইলেরও কম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামপ্রাণ বাবুর আর্থিক অবস্থা ভাল। অনেক টাকা আয়ের জমিদারী আছে, নগদ টাকার কারবারও আছে। জমিদারীর আয় বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কম নহে। তদ্ভিন্ন মহাজনীর আয়ও আছে। পল্লীগ্রামে রাজামহারাজার হালে চলিবার উপযুক্ত এ আয়।

পল্লীগ্রামের বাড়ী—বহুদূরব্যাপী। তিন চারিটা পুষ্করিণী,—পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান। গোয়ালবাড়ী, গোলাবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, স্কুলবাড়ী, প্রভৃতিতে অর্দ্ধেক গ্রাম তাঁহারই বাড়ী।

রামপ্রাণ বাবু কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক। বয়স পঁচাত্তর বৎসরের কম নহে। তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। পুত্রটি হাইকোর্টের উকীল, কন্যা দুইটি পরিণীতা ও সন্তানবতী।

দানীশের পাল্কী রামপ্রাণ বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দানীশ পাল্কী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। রামপ্রাণ বাবু ডাক্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই বসিয়াছিলেন,—তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"আশা ছিল, আপনি দুপুরের গাড়ীতেই আসিবেন; বোধ হয় বিশেষ কাজের জন্য আসিতে পারেন নি। যাই হক্। আগে রোগী দেখিয়া আসিয়া তবে বসিবেন।"

রামপ্রাণ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একজন ভৃত্যকে আলো লইয়া আগে আগে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া অন্দরাভিমুখে চলিলেন।

দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রোগীর কি রোগ? ইতিপূর্ব্বে কি কোনও চিকিৎসক দেখিয়াছেন?

রা। রোগী নহে—রোগিণী। দেখিয়াছেন?”

দা। রোগ কি?

রা। ভারি জ্বর—বুকে বেদনা।

দা। কে দেখিতেছেন?

রা। বর্দ্ধা ডাক্তার।

দা। তিনি রোগের নাম কিছু বলিয়াছেন?

রা। হাঁ, আগে তিনি বলিয়াছিলেন নিউমোনিয়া, কিন্তু—কাল সন্ধ্যার সময় বলিলেন, আমি রোগ ঠিক ঠাওরাইতে পারিতেছি না,—তাহাতে আপনাকে চিঠি লিখিয়াছি।

দা। জ্বরভোগ সাধারণতঃ কি ভাবে হইতেছে?

রা। সমস্ত দিন জ্বরের তাপ প্রায় একশত ছয় ডিক্রী পর্য্যন্ত থাকে—সন্ধ্যার সময় হইতে কম হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কমিয়া একশত ডিক্রীতে আসে, আবার শেষ রাত্রি হইতে বাড়িতে থাকে। বুকের বেদনা বেশী, জ্বরের সময় তত থাকে না; কম জ্বরের সময়ই সমধিক হয়।

দা। রোগিণীর জ্ঞান আছে?

রা। জ্বরের সময় থাকে না—কমের সময় ডাকিলে সাড়া দিয়ে।

রোগিণী সম্বন্ধে এইরূপ সকল লক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন, এবং যে সুপরিষ্কৃত কক্ষমধ্যে রোগিণী শায়িতা ছিল, তথায় গমন করিলেন।

রোগিণীর নিকট রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তদ্ভিন্ন অপরাপর তিন চারিজন স্ত্রীলোকও ছিল। ঘরে উঠিয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—“তোমরা একটু সরিয়া যাও. ডাক্তার বাবু রোগিণীকে দেখিবেন।”

রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী ও আর সকলে উঠিয়া অপর একটি কক্ষের দরজার পার্শ্বে গিয়া ডাক্তারের পরীক্ষার ফল অবগত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

রোগিণীর সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত ছিল,—গৃহমধ্যে কাচাধারে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। রামপ্রাণ বাবু ডাকিলেন,—"মা, এখন কি জ্ঞান হইয়াছে?

কেহ কথা কহিল না। যে কক্ষে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"আজ এখনও জ্ঞান হয় নাই নাকি?"

রামপ্রাণ বাবুর স্ত্রী অপর জনৈক স্ত্রীলোককে অবলম্বন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—'বল্, সন্ধ্যার পরে জ্ঞান হইয়াছিল, তারপরে ঔষধ পথ্য খাইয়া আবার নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে;—বোধ হয়, ঘুমাইয়াছে।

দানীশ বলিলেন,—"তবে আপনারা একজন আসিয়া রোগীর নিকটে বসুন। আমি হাত দেখিব—বুকটা পরীক্ষা করিব।

একটি বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া রোগিণীর নিকট বসিলেন। দানীশও গিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রমণী রোগিণীর মুখের বসন উন্মুক্ত করিল।

সেই প্রোজ্জ্বল আলোকে সান্ধ্য কমলের মত সেই ব্যাধি বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ডাক্তার বাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইতেছিল, বিশেষ সতর্কতার সহিত সামলাইয়া গেলেন।

প্রৌঢ়া রোগিণীকে ডাকিলেন। বলিলেন,—'হ্যাঁগা মেয়ে, তোমার কি ঘুম আসিয়াছে?"

রোগিণী ঘুমাইয়াছিল। প্রৌঢ়ার আহ্বানে সে চক্ষু মেলিল।

চাহিয়া কি দেখিল?—সম্মুখে তাহার জন্মজন্মান্তরের আরাধ্য প্রতিমা দীর্ঘ দিবসের ধ্যানের দেবতা দানীশচন্দ্র। একি অলীক স্বপ্নের স্বরূপ ছায়া, না প্রকৃত সশরীরী জীবন্ত মূর্ত্তি!

রোগিণী ন'বৌ।

দানীশচন্দ্র রামপ্রাণবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "মহাশয়, একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, একটু পরে না হইলে আমি রোগ পরীক্ষা করিতে পারিব না। আমার ভয়ানক মাথা ঘুরিতেছে।

ন'বৌ জোর করিয়া উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল,—পারিল না, গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। ন'বৌ উন্মাদিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"আমার শেষ আশা পূর্ণ হইয়াছে; এখন সুখে মরিতে পারিব। আর একবার দেখিতে দাও--আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না।"

অনেকে ভাবিল, মেয়েটার রোগ বুঝি আ'জ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই ভুল বকুনিটা বাড়িয়াছে। উঠিতে যাইতেছিল, তাহাও বুঝি বিকারের ধমকে। কিন্তু সংসার-রস-অভিজ্ঞ রামপ্রাণ বাবু বুঝিলেন, ভগবানের এই খেলার ঘরে কোথা দিয়া কি খেলার সংঘটন হয়, কেহ বুঝিতে পারে না। এই যুবক যুবতীর মধ্যে একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল। ডাক্তারবাবু ততক্ষণ গৃহের বারেণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রাণবাবু ডাকিয়া বলিলেন,—"ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসুন। রোগীর অবস্থা ভাল নয়। ঔষধ দিতে বিলম্ব করা উচিত নয়।

ডাক্তারবাবু কিন্তু ফিরিলেন না; তিনি উদ্বেলিত, বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল ও পীড়িত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু পুনরপি বাড়ীর মধ্যে গিয়া রোগিণীকে দেখিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় উপবেশন করিলেন। রামপ্রাণ বাবুও তথায় আসিলেন। উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

রামপ্রাণবাবু বলিলেন,—"রোগিণীকে আরোগ্যের পথে না আনিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না।"

দা। আমার অধিকক্ষণ থাকিবার উপায় নাই,—কলিকাতায় গুটি কয়েক কঠিন রোগী আমার হাতে আছে;—অদ্যই যাইতে হইবে। কোন ভয় নাই, আপনাদের রোগিণী অচিরে আরোগ্য হইবে। জলে ডুবিয়া অনেকখানি জল খাইয়াছিল,—সে জল কতক বাহির হইয়াছিল, কতক ফুস্‌ফুসে সঞ্চয় হইয়াছিল,—আনুসঙ্গিক জ্বরও কিছু অধিক হইয়াছিল, কাজেই অবস্থা মন্দ ঘটিয়া গিয়াছিল। যে ব্যবস্থা করিলাম তাহাতেই বিশেষ উপকার দর্শিবে—রোগ প্রশমিত হইবে।

রা। ডাক্তারবাবু; সত্য কথা বলিবেন কি? এ রোগিণী আপনার কে?

দা। আমার?—আমার কেহ—ন—আ।

রা। নিশ্চয়ই কেহ। বোধ হয় আপনার স্ত্রী।

দা। আমার স্ত্রী?—আপনি কোথায় পাইলেন?

রা। বলিয়াছি ত, মফঃস্বল হইতে নৌকায় বাড়ী ফিরিতেছিলাম, হঠাৎ রাত্রে নদীতে মানুষের পতনশব্দ হইল,—নৌকা ফিরাইয়া যে স্থানটায় শব্দ হইয়াছিল মাঝীদিগকে সেইখানটা খুঁজিতে বলিলাম—ক্ষণপরেই তাহারা মৃতপ্রায় এই রমণী-দেহ পাইয়া নৌকায় উঠাইল।

একান্ত শুশ্রূষা যত্নে মুমূর্ষু দেহে প্রাণ আসিল। তৎপরে, মায়ের মত—কন্যার মত যত্ন করিয়া বাড়ী আনিয়াছি। মা আমার সেই পর্য্যন্তই অজ্ঞান, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। তবে জ্বরের জ্বালায়—ব্যাধির তাড়নায় যে সকল নিঃভুল বকিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছি, রমণী অপাপবিদ্ধা, সংসার-জ্বালায় বিদগ্ধা!

দানীশের নয়ন হইতে অগ্নি ছুটিল। বুকের মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালা অনুভূত হইল। তিনি বলিলেন,—"মা, রমণী আমার কেহ নহে।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল,—"বাবু, আপনি একবার বাড়ীর মধ্যে আসুন।"

রামপ্রাণ বাবু দানীশকে বলিলেন,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ফিরিয়া আসিয়া আপনার ষ্টেসনে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

এই বলিয়া রামপ্রাণবাবু বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

রোগিণীর শিয়রদেশে বসিয়া রামপ্রাণবাবুর স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, আর পল্লবৎ হস্তখানি রোগিণীর ললাটে বুলাইতেছিলেন। রামপ্রাণবাবু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"কেন ডাকিয়াছ? তোমাকে কিঞ্চিৎ আনন্দিতা বলিয়া বোধ হইতেছে। রোগিণীর অবস্থা বোধ হয় ভাল,—কেমন?

গৃহিণী বলিলেন,—"খুব ভাল। ডাক্তারবাবুর ঔষধে যত না হইয়াছে, তাঁহার মূর্ত্তি সন্দর্শনে তাহার অধিক উপকার। এ মেয়েটি কে জান?"

রা। কি করিয়া জানিব?

গৃ। আমার দিদির মেয়ে,—শান্তি।

রা। তোমার কোন্ দিদির মেয়ে?

গৃ। আমার আবার কয় দিদি? আমরা দুই বোন্—

রা। সাগরমণি আর নয়নমণি।

গৃ। আমার মার ছেলে হয় নি,—সবে মাত্র এই দুই মণি। দিদির বিবাহ হইয়াছিল শম্ভুনগরে। তাঁর স্বামী অল্পবয়সে মারা যান, তখন দিদির মাত্র একটী মেয়ে। দিদিও কিছুকাল পরে মারা পড়েন। সেই মেয়ে এই শান্তি। আমি এর নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র—কখনও চোখে দেখি নাই; তোমার প্রসাদে ঝি-জামাই এতদিনে চিনিলাম—একত্রেই পাইলাম—এখন বুঝিলে, শান্তি আমার বোন্-ঝি, ডাক্তারবাবু আমার জামাই।

রা। শান্তির কি এখন বেশ জ্ঞান হইয়াছে?

গৃ। হ্যাঁ,—আমি ওকে ওর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করায়, ও বলিল, শম্ভুনগরে আমার বাপের বাড়ী ছিল, আর শ্বশুরবাড়ী শোনপুর গ্রামে। আমি যদিও কখন শান্তিকে দেখি নাই,—জামাইকে দেখি নাই কিন্তু ওর নাম, ওর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম শুনিয়াছিলাম। হতভাগিনী আমি—আমার বাপেরকুলেও কেহ নাই,—দিদিও নাই। কি করিয়া আর ওদের দেখিব!

রা। মেয়েকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কেন উনি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। যে গ্রামের নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সে গ্রামের নাম শুনিয়াছিলাম গঙ্গারামপুর, সেখানে উনি কি করিতে আসিয়াছিলেন?

শান্তি এই সময় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিতে যাইতেছিল,—বোধ হয়, রামপ্রাণবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবে বলিয়াই উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু গৃহিণী উঠিতে দিলেন না, বলিলেন, এখন তত কথা বলিতে গেলে, অসুখ বাড়িবে—ও সকল কাল শুনিলেই হইবে।

শান্তি আর উঠিল না বা কোন কথা কহিল না।

রামপ্রাণবাবু বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,—"বড় সুখী হইলাম। কিন্তু"—

উৎকণ্ঠিত ভাবে গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু আবার কি?"

রা। ডাক্তার বাবুর মনে যেন একটা কিসের উষ্ণদাগ লাগিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমাদের মেয়ে শান্তি পবিত্র। দয়াময় যখন এরূপ সংঘটন ঘটাইয়াছেন, তখন অবশ্য শুভ ফলই ফলিবে! যাহা হউক, কোন ভয় নাই। এখন চলিলাম।

গৃহিনী কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু বলা হইল না, রামপ্রাণ বাবু তখন চলিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রাণবাবু যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি তাঁহার শরীরে সামর্থ্য যথেষ্ট। তিনি দ্রুতপদে বৈঠকখানার অভিমুখে গমন করিলেন।

দানীশ তখন সেখানে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তা সীমাহারা। ভ্রাতৃশোক—নিজের নিষ্ফল অপবিত্র প্রণয়-কুহকের তীব্র বেদনা,—আর ন'বৌর কথা,—মনে হইতেছিল! তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—"শান্তি, তুমি মরিলে না কেন? আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম কেন? পেঁচো মরিয়াছে—তুমি মরিলে না কেন? আমিও সুখে মরিতে পারিতাম! শান্তি,—তুমি কি যথার্থই কলঙ্কিনী? না না, আমার শান্তি অপবিত্র হইবে কেন? আমি অপবিত্র—শান্তি পবিত্র সতীসাধ্বী! কিন্তু—কিন্তু সে ঘরের বাহির হইল কেন? ঘরে তাহার কি জ্বালা হইয়াছিল!

ঠিক এই সময়েই হাসিতে হাসিতে রামপ্রাণবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন।

দানীশ তাঁহাকে দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইলেন। তার পরে ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আমাকে এইবেলা ষ্টেসনে যাইতে হইবে; এর পরে গেলে ট্রেণ পাওয়া যাইবে না।"

রামপ্রাণবাবু অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—"রাত্রে তোমার যাওয়া হইবে না।"

'তোমার!' যদিও রামপ্রাণবাবু বয়সে বড়, যদিও রামপ্রাণবাবু সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি,—তথাপি তিনি কখনও কোন দিন দানীশের প্রতি 'তোমায়' 'তুমি' প্রশ্নে বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। হঠাৎ এরূপ বলিলেন কেন?—দানীশ যেন একটু বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"না, মহাশয়, আমাকে যাইতেই হইবে।"

রামপ্রাণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়িতে চাহেন না তা আমি কি করিব বাপু; যাও তুমি তাঁর কাছে—পার তাঁর হাত এড়াইতে, যাইও। আর আমাকে কেন?"

দানীশচন্দ্র কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। রামপ্রাণবাবু বলিলেন,—"তুমি আশ্চর্য্য হইতেছ?—হইবারই কথা!—তুমি যে এখনও সকল কথা জান না! যাহাই হউক, মাত্র এইটুকু জানিয়া রাখ—তুমি আমাদের জামাই! এখনি গৃহিণীর কাছে মেয়ের ও তোমার সবিশেষ পরিচয় শুনিয়া আসিলাম।

অনন্তর গৃহিণীর মুখশ্রুত সমস্ত কথা বিস্তারিত ব্যক্ত করিলেন।

দানীশ বলিলেন,—"আজ্ঞে আমিও শুনিয়াছিলাম, শ্বশুরকুলে আমার এক মা'স্-শ্বাশুড়ী আছেন,—কিন্তু তাঁহার অন্য কোন সংবাদই অবগত ছিলাম না।"

রামপ্রাণবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"আমরাও তোমার পরিচয় জানিতাম না। জামাই কলিকাতার ডাক্তার,—না কলিকাতার

ডাক্তার! কোন্ দেশে বাড়ী, কাহার কে—সে সকল পরিচয় ত লওয়া হয় নাই। এখন বাড়ীর মধ্যে চল।"

দা। আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি এই ট্রেণেই কলিকাতায় যাইব। এখন আমি আপনার সন্তান,—আপনি আজ্ঞা করিলে, আমাকে থাকিতেই হয়, কিন্তু—

বাধা দিয়া রামপ্রাণবাবু বলিলেন,—"মনে কোন সন্দেহ করিও না। আমাদের মেয়ের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক,—তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কলঙ্কিনী জীবনত্যাগ করিতে সাহস করে না! তার পরে—নৌকার মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় কেবল স্বামী-দেবতাকে ডাকিয়াছে,—এমন সতীমেয়েকে বৃথা সন্দেহ যোগ্য!"

দানীশচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সে যাহা হয় পরে বিবেচনা করা যাইবে। আমার আর এক সাংঘাতিক বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে।"

রা। কি বিপদ?

দা। আমার সব ছোট ভাইটী আমার কাছে থাকিত। সে ডাক্তারখানাতেই শয়ন করিত। আজ সকালে ডাক্তারখানার ভৃত্য ভোরে দরোজা খুলিয়া দেখে—ভাইটি খুন হইয়াছে।

রামপ্রাণবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"খুন?"

দা। আজ্ঞে হাঁ।

রা। বড়ই দুঃখিত হইলাম!

দা। এখনও পুলিসের হাঙ্গামা মিটে নাই,—কাজেই আমাকে যাইতেই হইবে।

রা। তবে আর আমি বাধা দিতে পারি না! তোমার শাশুড়ীকে একথা বলিব এখন।

দা। গোপনে বলিবেন,—রোগিণী শুনিলে শোকার্ত্ত হইবে, তাহা হইলে রোগ সারিতে বিলম্ব হইবে।

রা। হাঁ, তাহাও ঠিক।

তারপর তিনি সরকারকে ডাকিয়া দানীশের ভিজিট একশত টাকা আনিয়া দিতে বলিলেন, পাল্কীও প্রস্তুত হইয়া আসিল। দানীশ বলিলেন,—"টাকা এখন থাক্—একদিনেই লইব।"

রামপ্রাণবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"মেয়ে তার বাপের বাড়ী থাকিয়া অসুস্থ হইলে ডাক্তার জামাই ভিজিট লয়েন, এ প্রথা ত কলিকাতার ডাক্তারদিগের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই আছে।"

দানীশ তদুত্তরে কিছু না বলিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রণামকরতঃ পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। বাহকগণ পাল্কী তুলিয়া ষ্টেসনাভিমুখে ছুটিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রামসেবকের মাতা যখন গৃহ-কর্ত্রী,—রামসেবক বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা! মেজবৌ আগেও যাহা ছিল, এখনও তাই আছে। মেজবৌর শ্বাশুড়ী উন্মাদিনীর মত হইয়া গিয়াছেন,—ভাল থাকিতেই ত তিনি সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন না; এখন একেবারেই নির্লিপ্ত—উদাসনেত্রে, নীরবে সর্ব্বদা বসিয়া চিন্তা করেন। কখনও নয়নদ্বয় শুষ্ক—অনলমাখা কখনও সিক্ত অশ্রুজলে ভাসমান। নিস্তারিণী যখন স্নান করাইয়া দেয়, তখন স্নান করেন—না দিলে স্নান হয় না। রন্ধনাদি এখন রামসেবকের মাতাই সম্পন্ন করেন—তাঁহার অনুগ্রহ ও অভিরুচি মতে গৃহকর্ত্রী যাহা যেদিন যে সময়ে প্রাপ্ত হন, নিস্তারের অনুরোধে তাহাই ভোজন করেন। পান ভোজনেও তাঁহার স্পৃহা নাই।

সে দিন বেলা প্রায় দশটার সময় রামসেবকের মাতা রন্ধন করিয়াছিলেন, রামসেবক সেই গৃহের দাবায় দেওয়াল ঠেসান দিয়া বসিয়া মাতার সহিত গল্প করিতেছিলেন। মাতা রন্ধন করিতে করিতে পুত্রমুখ প্রমুখাৎ তাহার বর্ত্তমান উন্নতি ও প্রশংসার কথা শুনিয়া পরম পুলকিত হইতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে আনন্দ-সূচক উত্তর করিতেছিলেন। কথায় কথায় রামসেবক বলিলেন,—"বুঝ্‌লে মা, যার যখন উন্নতির সময় আসে, তার তখন এমনই হয়।"

মাতা গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন,—"তুমি আমার কত ঠাকুরের দোরধরা ধন, এখন বেঁচে থেকে, বংশের মুখ উজ্জ্বল কর—আমি তোমাকে রেখে যাই, এই প্রার্থনা।"

রা। আমি মিথ্যে বল্‌চি না মা,—এখন আমার উন্নতির মুখ;—এই

দেখ, এই অল্পদিনে চিকিৎসা কাঁজে কেমন যশ হ'য়ে পড়্‌লো—এক-মাসে প্রায় তিন চারি টাকা রোজগার করিয়া ফেলেছি। আর চাষারা সব আমার শিষ্যি—যারে যা বলি, ঘাড় হেঁট কোরে শোনে। আর একটা খবর ব'ল্‌বো ?

মা। কি বাবা ?

রা। বদ্দিনাথ পুরের মিত্তীরদের একটা মেয়ে আছে; পরীর বাচ্ছার মত সুন্দরী। মেয়েটার বাবা কোথাকার হাকিম,—আমার সঙ্গে সেই মেয়েটার বিয়ে দেবার জন্যে নাছাড়বান্দা হয়ে লেগেছে।

মা। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে বাবা! কিন্তু গহণা-গাঁটী খরচপত্র কোথায় পাব ?

রা। আচ্ছা মা,—সে কি আর আমাদের দিতে হবে! মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে সোনা আর হাজার টাকা নগদ নিয়ে তবে সে কাজ ক'রবো।

মা। ভগবান তাদের সুমতি দিন্—তবে গোমর ক'রে বল্‌তে পারি, এমন বংশ আর এমন জামাই, গঙ্গার এপারে কেউ পাবেন না।

ঠিক এই সময় গ্রামের চৌকিদার হরাবুনো তাহার পোষাক পরিয়া পাকড়ি আঁটিয়া, প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া বাড়ীরমধ্যে আসিয়া বলিল,—"করমওশায়, বাবুবাড়ী আসুন,—দারোগাবাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

দারোগার নাম শুনিয়া রামসেবকের হৃদপিণ্ডটা বেগে কাঁপিয়া উঠিল। রামসেবক দাবা হইতে নামিয়া যখন চৌকিদারের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তখন মাতা গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বলিলেন,—"রাম, জামাটা গায় দিয়ে যা!"

রামসেবক বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"জামা আর গায় দিতে হবে না।"

মা। তবে দাঁড়া—আমি আয়না চিরুণী বার ক'রে দিই, চুলকটা একটু আঁচ্‌ড়ে যা'—তোর চুলের মত চুল আর দেখিনি।

হরাবুনো হাসিয়া বলিল,—"কেন মা-ঠাকুরুণ, চুল আঁচ্‌ড়ে কি হবে?"

রামসেবকের মাতা বলিলেন,—"আমার আয়বুড়ো ছেলে,নামডাকও হ'য়েছে—তার উপর যখন হাকিম-হুকুমের নজর প'ড়েছে!"

"দারোগাবাবু বিয়ে দিতেই এসেছি" চৌকিদার এই কথা বলিয়া হাসিল। রামসেবকের মা বলিলেন,—"তবে ফিরে আয়, যদিও তোর রূপের তুলনা নেই, তবু একটু যুত-যাত ক'রে যা।"

হরা বলিল,—"যুত যাত সেখেনে গিয়েই হবে। আর দেরী করিও না। হাকিম বাহিরে দাঁড়িয়ে।"

রামসেবকের গতি ক্রমেই মন্থর হইয়া আসিতেছিল,—হরা তখন দুই একটা ধাক্কা দিয়া গতির বেগ একটু বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বহির্ব্বাটীতে পুলিসের দারোগার সম্মুখে হাজির করিল।

হাকিমের ভাবী জামাতার উপরে হঠাৎ হরাবুনোর এরূপ অসদ্ব্যবহার রামসেবকের মাতার চক্ষে অতি বিসদৃশ জ্ঞান ঠেকিল। তিনি দরোজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

দারোগার নিকটে রামসেবক পৌঁছিবা মাত্র, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বক্র-কঠোর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দারোগা বলিলেন—"তোমার নাম কি?"

রামসেবক কাঁপিতেছিল। বলিল,—"রামসেবক কর।"

দারোগা একজন কনেষ্টবলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হাতকড়ি লাগাও।"

পশ্চিম দেশীয় পাঁড়ে ঠাকুর তাঁহার পৃষ্ঠ বিলম্বিত ঝোলার মধ্য হইতে

দুইটা হাতকড়ি বাহির করিয়া, একজন চৌকিদারকে বলিলেন—"পাকড়ো।"

দুইজন চৌকিদার রামসেবকের হাত চাপিয়া ধরিল,—পাঁড়ে ঠাকুর রামসেবকের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিলেন।—ইহাই নাকি গ্রেপ্তারের প্রথা!

ব্যাপার দৃষ্টে রামসেবক ও দরোজার নিকট রামসেবকের মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দূরে—রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া বিষ্ণু সরকার মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। আর একজন চৌকিদার গ্রামের ভদ্রলোক ডাকিতে গিয়াছিল, সে এই সময় কয়েকজন ভদ্রলোক ও চারি পাঁচজন 'মোড়োল' ডাকিয়া লইয়া আসিল।

জগৎ মুখুয্যে বিষ্ণু সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

বিষ্ণু সরকার হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"ব্যাপার অপর কিছুই নহে। এদের ন'বউ বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে শুনিয়াছ। আমার বিশ্বাস, ঐ হতভাগা কর্ত্তৃকই কোন একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, উহার নিকট হইতে আসল কথা বাহির করিতে পারি নাই। তাই দারোগা বাবুকে ধরিয়াছি। তোমরা সকলে উপস্থিত থাক,—আজ যদি আসল কথা বলে, সকলে শুনিতে পাইব।"

"এত ফন্দীও তোমার আসে।"—এই কথা বলিয়া জগৎ মুখুয্যেও হাসিলেন। তখন বিষ্ণু সরকার তাঁহাদিগকে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে আসিলেন, এবং দারোগাবাবুকে বলিলেন,—"মহাশয়, এ বেচারাকে ধরিয়াছেন কেন? এ নেহাত ভাল মানুষ।"

দারোগা বাবু কথা না কহিতে কাহতে রামসেবক কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আপনারা ত জানেন আমি নেহাত গো-বেচারী—আমাকে ধরেন কেন?

দরজা হইতে আরও খানিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া রামসেবকের মাতা বলিলেন,—"দোহাই দারোগা সাহেব, ওকে ছাড়িয়া দাও—ও আমার নেহাত ভালমানুষ।"

দারোগা বাবু বলিলেন,—"ভালমানুষ—গো-বেচারী বলিয়া ত আর মানুষ খুন করা চলে না?

রামসেবক ভীত কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"আমি খুন করিয়াছি?"

রামসেবকের মাতা বলিলেন,—"ও খুন করিয়াছে?"

বিষ্ণু সরকার মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"খুন! রামসেবক কাহাকে খুন করিয়াছে দারোগাবাবু?"

দা। কেন, এই বাড়ীর ন'খুড়কে।

রা। অঁ্যা!—সে কি গো? সে গেল বেরিয়ে, আমি তাকে কেমন ক'রে খুন করলাম?

দা। চুপ কর্ পাজি—যখন ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌বি, তখন সব জান্‌তে পার্‌বি।

"ওগো আমার কি হবে গো—কেন মর্‌তে এ বাড়ীতে এসেছিলাম গো,—আমার যে ঐ সবে ধন নীলমণী গো—আমার যে আর কেউ নাই গো!"

এই কথা বলিয়া রামসেবকের মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে রামসেবক আরও অস্থির হইয়া পড়িল। সেও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কেন মর্‌তে এ বাড়ীতে এসেছিলাম গো,—আমার যে কেউ নেই গো!"

বিষ্ণু সরকার দারোগা বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'সত্যই রামসেবকের কেউ নাই। ভাল, ও যদি সত্য কথা বলে, তবে কি ওর ফাঁসিটা মাফ্ করিয়া দিতে পারেন।"

দারোগাও হাসিলেন। বলিলেন,—"হাঁ, সত্য কথা বলিলে তা' পারি। কিন্তু ও ভারি পাজী—ভারি বদমাস্—কখনই সত্য কথা বলিবে না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রামসেবকের মাতা বলিলেন,—ওর বংশে কখনও পাজী বদ্‌মাস জন্মে নাই গো। সেই বউটাই পাজি বদ্‌মাস্ ছিল গো! তারই জন্যে এত কাণ্ড ঘটেছে গো!"

বিষ্ণু সরকার রামসেবকের মাতাকে ধমকাইলেন। বলিলেন,—"তুমিই তোমার গোপালকে এতদূর পাজী বদ্‌মাইস করিয়া তুলিয়াছ। তোমারই আদরে রামসেবক অধঃপাতে গিয়াছে। এখনও যদি সত্য কথা বলিতে না দাও, তাহা হইলে আর কিছুতেই রক্ষা হইবে না! এখনও সত্য বলুক,—তাহা হইলে দারোগা বাবু বেকসুর খালাস দিবেন। উনি সব জানিতে পারিয়াছেন।"

রামসেবক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি ব'ল্‌চি গো, সব সত্য বল্‌ছি—মা ত আর ফাঁসি যাবে না, ফাঁসি যেতে আমিই যাব; মার কথায় আমি কি আর মিথ্যে বলিব?—বিশেষ আমার গলায় ত্রিকণ্ঠি মালা।"

দা। বল্—সত্য বল্, ন'বউ কোথায় গেলেন?

রা। সত্যি বল্‌চি হুজুর,—সে যে কোথায় গেল, তার খোঁজ আমি পাই নাই। লোকদ্বারায় খুঁজিয়াছিলাম—সন্ধান পাই নাই।

দা। এক বর্ণও মিথ্যা বলিও না—তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে ছাড়িয়া দিব। আচ্ছা বল ত, গেল কেন?

রা। আমি তামাসা ক'রে একটা কথা ব'লেছিলাম ব'লে।

রামসেবকের মা বলিলেন,—আমার ছেলে ঠাট্টা কোর্ত্তে ভালবাসে। তা আমি এত বারণ করি যে, সকলের সঙ্গে তামাসা করা ভাল নয়—সকলে ত আর ঠাট্টা তামাসা বোঝে না। কিন্তু ছেলে আমার নিতান্ত অবুঝ! আহা, নেহাৎ ভালমানুষ কি না?

বিষ্ণু সরকার ধমক দিয়া বলিলেন,—"তুমি কি চুপ কোরে থাক্‌তে পারো না? ছেলেটিকে কি ফাঁসি না দিয়ে ছাড়্‌বে না?

রামসেবকের মাতা ধমক খাইয়া নিস্তব্ধ হইল। দারোগা পুনরায় রামসেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তামাসা করিয়া তাকে কি বলিয়াছিলে?"

রা। তিনি আমার সঙ্গে কথা টতা কইতেন না কি না, তাই কথা কহাবার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে জিদ্ করিতাম।

দা। তাতে তিনি কি করিতেন?

রা। আমার পিসীর সাক্ষাতে সব ব'লে দিতেন। কোন দিন পিসী আমাকে সামান্য কিছু ব'ল্‌তেন,—কোন দিন কিছু বল্‌তেন না। তাতে ন'বউ প্রায়ই কাঁদ্‌তেন।

দা। তার পর?

রা। সে দিন কিছু বেশী কান্না-কাটি করায় আমি ব'লেছিলাম, তোমার সতীগিরি আমি বার কোরে দেব—এক দিন রাত্তিরে জন-কয়েক চাষা ডেকে এনে তোমাকে এক দিকে নিয়ে যাব,—কেউ রাখ্‌তে পারবে না। সে বেটী এমনি বোকা—আমার ঐ ফাঁকা কথা-তেই ভয় পেয়ে সেদিন রাত্তিরেই পালিয়ে গিয়েছে।

দারোগা বাবু বিষ্ণু সরকারের মুখের দিকে চাহিলেন। বিষ্ণু সরকার ক্রোধ-কর্কশ-স্বরে বলিলেন,—"শোন রামসেবক,

এত দিন গ্রামের মধ্যে কি কথা বলিয়া বেড়াইয়াছ, মনে আছে কি ?"

রামসেবকের মাতা বলিলেন,—ও মা! তুমি কেমন ভদ্দর নোক গো ? আপন দোষ কেউ কি সাধ ক'রে বলে ? এটা জান না! তবে কি জান, এখন একান্ত ফাঁসির দায় এড়াবার জন্যে না বল্‌লে নয়, তাই যা' বল ?

এইবার দারোগা ধমকাইয়া উঠিলেন—রামসেবকের মা ম্রিয়মাণ হইয়া সরিয়া গেলেন।

রামসেবক বলিল,—"আজ্ঞে আছে বৈকি! আমি ব'লেছি, একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে।"

বি। সে কি মিথ্যা কথা ?

রা। হ্যাঁ, মিথ্যা কথা।

বি। কোন্ কথা মিথ্যা ?

রা। আগেকার কথা।

বি। আগেকার কথা মিথ্যা কি পাছেকার কথা মিথ্যা—তার প্রমাণ কি ?

রা। প্রমাণ আমার পিসীমা। 'যে রাত্রে আমি তাকে কথা কহাইবার জন্য জিদ্ করি, সে রাত্রে সে আমার পিসীমার নিকটে গিয়ে আমার নামে নালিশ করে—কত কাঁদে। পিসীমা তার প্রতিকার করেন নি। আমারও তখন ভারি লোভ জন্মে—তার পরে আমি—'

বি। "বস্ আর বলিতে হইবে না"—এই কথা বলিয়া বিষ্ণুসরকার একটি ছেলেকে বাটীর মধ্যে যাইয়া নিস্তারকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। নিস্তার দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে হাজির হইল। বিষ্ণু সরকার বলিলেন,—তুই কি এখানেই ছিলি ?"

নি। হ্যাঁ আমি সব শুনেছি।

বি। মেজ বউমাকে তবে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,রামসেবক সত্য কথা বলিতেছে কি না?

নিস্তার চলিয়া গেল,—সকলেই তাহার আগমন-কাল-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিস্তার ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"মেজ মাঠাকুরুণ বলিলেন,—আমি জানি ন'বউর কোন দোষ নাই। রামসেবকের অত্যাচার ভয়েই সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। আমি সময়ে সাবধান হইলে, এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না।"

তখন বিষ্ণু সরকার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা জানেন, সতী লক্ষ্মীর নামে কলঙ্ক রটিয়াছে!—তিনি জীবিত থাকুন আর অমূল্য নিধি সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবন নষ্ট করিয়াই থাকুন,—আপনারা সকলে জানুন, সকলে ভাল করিয়া শুনুন,—তিনি সতী। দানবের অত্যাচারে—পাপীর পাপ-কবল হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন।—শাশুড়ীকে বলিয়া—মেজ জাকে বলিয়া যখন তিনি প্রতিকার পান নাই—স্বামীকে জানাইবার উপায় করিতে পারেন নাই—তখন নিরাশ্রয়ে হতভাগিনী অমূল্য ধন হারাইবার ভয়ে অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন।"

কথা শুনিয়া সকলেরই চক্ষু কোণে জল আসিল। দারোগা বাবুর আদেশে একজন চৌকিদার রামসেবকের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। সকলেই রামসেবকের নামে অভিসম্পাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রামসেবক সজলনয়নে হাতকড়ির দাগ দেখিতে দেখিতে কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বৈকালের রৌদ্র হৈমকিরণ বিকীর্ণ করিয়া বৃক্ষপত্রে, গৃহের ছাতে এবং বাঁশের ঝাড়ের মাথার উপরে বিরাজ করিতেছিল। বায়ু শীতল হইয়া আসিতেছিল, এবং পক্ষীগণ ভূতলে নামিয়া আহারান্বেষণে ব্যস্ত ছিল।

ওপাড়ায় রায়দের মেয়ে সারদা আসিয়া সেজবৌকে ডাকিল—"শিবু, কোথায় আছিস্? কতদিন দেখা হয় নি; আমি কা'ল শ্বশুর বাড়ী যাব, তাই একবার দেখ্‌তে এলাম।"

সেজবৌ তখন সন্ধ্যার প্রদীপ গুছাইতেছিল। সে বলিল,—"আয় ভাই কতদিন তোকে দেখিনি! শ্বশুরবাড়ী যাবি?—রমণীর মহাতীর্থ শ্বশুরবাড়ী যাবি?—তোকে দেখ্‌লেও পুণ্য আছে।"

সেজবৌর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। আগে হইতেই তাহার মুখ ম্লান, চক্ষুজল ভারাক্রান্ত, প্রাণ বিষাদিত ছিল।

সারদা বলিল,—"তুই আবার শ্বশুরবাড়ীর এত ভক্ত কবে হলি? চিরকাল্‌টা যে সে নামেতে চটা ছিলি! তোর শরীর অত কাহিল হ'ল কেন?"

সে। চল্, ঘরে চল্—কত দিন তোর দেখা পাইনি। এপ্রাণে কত জ্বালা, তুইও শুনিসনি—যদি এলি, তবে একটু শুন্‌বি চল।

সারদারও মুখখানা একটু ম্লান হইল বলিল,—"চল্ ভাই! তোর ভাব দেখে, আমার ভয় হ'চ্চে। ব্যাপার কি খুলে বল্‌বি চল্ দেখি।"

সেজবৌ তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করিয়া, সারদাকে লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিল।

সারদা বলিল,—"তোমার দিদি আসিয়াছেন না? প্রায় এক মাস এসেছেন শুনেছি;—তা' একবার এসে দেখা করিতেও পারিনি।"

সে। হ্যাঁ, দিদি প্রসব হ'তে এসেছেন। তিনি বড় চাকুরের বৌ—নড়িয়াও বসেন না। আমি হতভাগিনী—আমার স্বামী গরীব—তাঁর কাজ, তাঁর ছেলেমেয়ের কাজ, সবই আমাকে করিতে হয়। একটু না পারিলে, তিনি রাগ করেন,—মা কত অবজ্ঞা বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করেন। সারদারে, আগে জানিতাম না, যে পতি দেবতার চরণ পার্শ্বেই রমণীর সব সুখ-স্বচ্ছন্দ নির্ভর করে। সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে খাটিয়া মরি—কেহ একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করে না—একটু জল খাইলাম কি না খোঁজ করে না। হায় রে.—অভাগিনী আমি—পাপিনী আমি—তখন বুঝি নাই, যে ভাই হউন, মা হউন, বোন্ হউন,—তেমন যত্ন, তেমন স্নেহ, তেমন করুণা, জগতে কেহই করিবে না। তখন বুঝি নাই যে, স্বামীর মানে রমণীর মান, স্বামীর খাতিরে রমণীর খাতির, সেবার আমার অসুখ হইলে প্রাণ দিয়া চিকিৎসা, শুশ্রূষা করিয়াছিলেন,—কিন্তু আমি হতভাগিনী, তখন তাঁহার গৌরব বুঝি নাই! এখন বুঝিয়াছি। সে দিন ভারি জ্বর হইয়াছিল,—দশ দিন ভুগিলাম, উপবাস দিলাম—জল আর কয়েক টুক্‌রা মিছরী, তাহাও কেহ ঠিক সময় মত দিত না!—বাস্তবিক ভাই, আর সহ্য হয় না,—আর কি তাঁহার দেখা পাব না?

সমীর-সঞ্চালিত বর্ষার কুসুম হইতে জল পতনের ন্যায় তাহার দুই চক্ষু হইতে জল ঝরিয়া পড়িয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। তারপরে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল,—"শোন্ সারদা, আমি হতভাগিনী—বড় পাপিনী—পাপের জ্বালায় বড় জ্বলিতেছি। আমার অবস্থা মনে রাখিও—স্বামী আর শ্বশুরবাড়ী, ইহাই রমণীর ইহসংসারে সুখ-সম্পদের আগার! স্বামী

ও তৎসংস্পৃষ্ট যাহা কিছু---যে কেহ, সকলে যত্নবতী—ভক্তিমতী হইও---সে সকলের উপর প্রাণ ঢালিয়া দিও তাহা হইলেই সকল ব্রতের—সকল তীর্থের ফল পাইবে !'

সারদারও চক্ষুকোণে জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রায় মহাশয়ের কি কোনও খবর পাস্‌নি ?"

সে। না ! ভগবান্ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন ! আমাকে তিনি প্রাণ হইতেও ভালবাসিতেন ! কিন্তু আমি হতভাগিনী—আমার ভাগ্যে অত সহিবে কেন ? আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছি, তিনি তাহাই করিয়াছেন,—আমার সুখের জন্য বর্ষার ধারা, নিদারুণ রৌদ্র-তাপ, সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়াছেন ! আমি বলিয়াছিলাম বলিয়া, মাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া সব পরিত্যাগ করিয়া, আমার বাপের বাড়ী আসিয়াছিলেন ! আমি সুখে আছি ভাবিয়া তিনি কত অপমান, কত অবহেলা, কত ঘৃণা সহ্য করিয়াছেন। তারপর আমি কি করিয়াছি ? তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করা—তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা—দূরের কথা !—আমি যাহা করিয়াছি তাহা আর তোকে বলিব না সারদা ! তবে এই বলি যাহা করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই অবজ্ঞা, আর অসহ্য প্রাণের জ্বালা ! সারদা,---আর দেখা পাবনা---আর তেমন করিয়া কেহ স্নেহ করুণা করিবে না ! সে সব যাক্,---কিন্তু তাঁহার একটি খবর পেলেও সুখী হ'তাম,---সেই যে ছল ছল নেত্রে বিদায় হইয়াছেন---আর আসিলেন না ! আমি অভাগিনী যে, সে সময়ও একবার কথা কহি নাই !

সেজবৌ আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সারদা সমবেদনার স্বরে বলিল,—"এ সময় তুই শ্বশুরবাড়ী যা। সেখানে গেলে কতকটা শান্তি পাবি।"

গলা ঝাড়িয়া সেজবৌ বলিল,—“সারদা, আমারই পাপে সে সুখের সংসার পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে, নন্দনকানন মরুভূমে পরিণত হইয়াছে! সেখানে এখন গিয়া কি করিব?”

সারদা বলিল,—অত উতলা হ'স্ না। ভগবানকে ডাক—তিনি সদয় হবেন। আবার রায় মহাশয় বাড়ী আস্‌বেন। তুই যা—শ্বশুর বাড়ী যা।”

সে। ভগবানকে ডাকিবার অধিকার আমার নাই। পাপিনী স্বামীকে অভক্তি, অশ্রদ্ধা করিয়াছে,—যে পাপিনী, স্বামীকে অনন্ত জ্বালায় জ্বালাতন করিয়াছে,—সে ভগবান্‌কে ডাকিবার অধিকারি নয়! যাক্ আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফলভোগ করিয়াছি—করিতেছি,—আরও না জানি কতই করিব!

এই সময় হরিচরণ একখানা পত্র হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। মাতা ও ভগিনী শিবুকে ডাকিলেন; তাঁহারা আসিলেন, এবং মাতার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, শিবমোহিনীর সঙ্গে সারদা প্রভৃতিও সেখানে উপস্থিত হইল।

হরিচরণ সেইরূপ হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন,—“ভাগ্যি ফিরেছে মা,—তোমার ছোট মেয়েকে নিতে ওঁর শ্বাশুড়ী গাড়ী আর পত্র পাঠিয়েছেন।”

হরিচরণের মাতা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“আমার ভাগ্যি! কেন, মানীলোকের বেটা বাড়ী এসেছেন নাকি?”

“না। এই পত্র শোন”—এই কথা বলিয়া হরিচরণ পাঠ করিলেন;—

“হরিচরণ;—বাবা, আমার অদৃষ্ট ও দুর্ঘটনার কথা বোধ হয় সমস্তই শুনিয়াছ। রামসেবক ও রামসেবকের মাতা এখান হইতে

চলিয়া গিয়াছে। রামসেবকের মাতা ইদানীং দুটো দুটো রাঁধিয়া দিতেছিল। এখন এক মুটা ভাত রাঁধিয়া দেয়, এমন লোক নাই। যে কয়দিন যন্ত্রণা আছে—যে কয়দিন পাপের ভোগ আছে—যে কয়দিন জীবিত আছি—সে কয়দিন পোড়া উদরে দুটো দিতেই হবে। কিন্তু করে কে?—মেজবৌমা শোকাতুরা!—তাই গাড়ী পাঠাইলাম, সেজ বৌমাকে এই গাড়ীতে অবশ্য অবশ্য পাঠাইবে। নিস্তারও সঙ্গে গেল; যতীশের সংবাদ পাইয়াছি,—সে প্রাণে আছে মাত্র। ক্ষিতীশ, দানীশ ও পেঁচোর কোন সংবাদ নাই। আমি কিরূপ অবস্থায় আছি, ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ।

চির আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার "মাউই মাতা।"

হরিচরণের মাতা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"যাচ্চে আমার মেয়ে তাঁর রাঁধুনিবৃত্তি দাসীপনা কর্ত্তে। কই নিস্তার কৈ—তাকে ভাল কোরে একবার দশকথা শুনিয়ে দিই,—ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিই—দাঁড়াও ত।"

সারদা বলিল, "না খুড়ী মা, পাঠিয়ে দেবে বৈকি! শ্বাশুড়ী—গুরুলোক, তাঁর সেবা কর্‌তে যাবে বৈকি!"

উচ্চগ্রামে সুর তুলিয়া হরিচরণের মাতা বলিলেন,—"ওরে আমার গুরুলোকের সেবা!—এত দিন ছিলেন কোথায়? এখন আমার বড় মেয়েটা এসেছে—আজ বাদে কা'ল সে প্রসব হবে. এখন কিনা আমি ওকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দি! ও গেলে কে কি কোর্ব্বে।"

মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে সেজবৌ বলিল,—"আমি যাব।"

মা। যাবি?—তা যা', কিন্তু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আবার ছুটে তখন যে আস্‌বি, তা আর হ'চ্চে না!—এ বাটীতে আবার তোমার স্থান হ'বে না, মা!—তা বেশ মনে জেনো!

সেজবৌ সে কথার কোন উত্তর করিল না। মনে মনে বলিল,—"তাই হবে মা! যদি সেখানে—সেই পবিত্র তীর্থে স্থান না হয়, নদীতে স্থান হবে।"

নিস্তারিণী পুকুরে হাতমুখ প্রক্ষালন করিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই, দেখিয়া সারদা বলিল,—"শিবু, তবে যাই?"

সেজবৌ ছলছল নেত্রে তাহার দিকে চাহিল, সে নয়নেঙ্গিতে জানাইল,—"যাস্, কিছুতেই বারণ শুনিস্ না।"

সপ্তম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘ দিবসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নিষ্ফল প্রয়াস-ক্লেশ যুথিকার হৃদয়ে যে বেদনা জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে পাঁচকড়ির বক্ষরক্ত পতিত হইয়া তাহা একেবারে অসহ্য,—সুতীক্ষ্ণ—ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। সে এতদিন নারকীয় বিলোল লালসা-সেবায় প্রমত্ত হইয়া কোমল-স্বর্গীয় পবিত্র-প্রবৃত্তিচয়কে অকাতরে অবিচারে চরণে দলিয়া চলিয়া গিয়াছে, অবশেষে কেবল পাঁচকড়িকেই বুকে তুলিয়াছিল; তথাপি কিন্তু স্থির বুঝিতে পারে নাই, যে তাহাকে কতটা ভালবাসিয়াছে। পাঁচকড়ি বিহনে যে উন্মাদ হইতে হইবে, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝে নাই। বুঝিলে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিত না। তখন সে ভাবিয়াছিল,—পাঁচকড়িকে সরাইয়া দিলে তাহার সকল জ্বালার অবসান হইবে! অথবা প্রত্যাখ্যান হইলেই প্রতিহিংসার আগুন লইয়া ছুটিতে হয়, উপন্যাসাদিতে এইরূপ লেখে তাই বুঝি সে ছুটিয়াছিল;—সে আগুনে যে পাঁচকড়ি ধ্বংস হইবে—পৃথিবী হইতে সে চলিয়া যাইবে—সঙ্গে সঙ্গে সেও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা বিবেচনা করিতে পারে নাই। সাপিনী হয় ত মানবের জীবলীলা সাঙ্গ করিবার মনস্থ করিয়া সেই উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া দংশন করে না,—হয় ত তত বিবেচনাও করে না। রাগ হইলেই দংশন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়!

যুথিকা কিছুতেই হৃদয় স্থির করিতে পারিতেছে না। ভৃত্য স্নান করিতে অনুরোধ করিল, পাচক আহার্য্য লইয়া সাধিল,—সে স্নান বা আহার করিল না। তাহার চক্ষু তখন ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; বেশ আলুথালু—কেশপাশ অযত্ন বিন্যস্ত!

দানীশ চলিয়া গেলে, ভৃত্যকে রাজাসাহেবের বাড়ীর সংবাদ জানিতে পাঠাইল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"রাজাসাহেবের স্ত্রী গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছেন!"

যুথিকার উদ্বেলিত হৃদয় আরও উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ভৃত্যের অনেক সাধাসাধি ও সবিশেষ চেষ্টায় সামান্য আহারীয় দ্রব্য ও এক গ্ল্যাস জল তাহার উদরস্থ হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; ভৃত্যকে থানায় পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল,—এখনই যেন ইন্‌স্পেক্টার বাবু এখানে আসেন। খুনের বিষয় আমি অনেক কথা জানি,—তাঁহাকে বলিব।"

সম্বাদ পাইবামাত্র পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুথিকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মূর্ত্তি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর বুঝিলেন,—এ রমণী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নাই। হয় এ নিজেই খুন করিয়া এখন হৃদয়ের অশান্তিতে খুন স্বীকারে উদ্যত হইয়াছে, নয় খুনের ষড়-যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

যুথিকা গম্ভীর মুখে উদাস স্বরে বলিল,—"দারোগাবাবু, সে নাই—আর আসিবে না—যাহাতে তাহার হত্যাকারী ধৃত হয়, দণ্ড পায়, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

ই। আমাদেরও সেই ইচ্ছা। তবে কোনরূপ সূত্র না পাইলে, হত্যাকারীকে ধৃত করা কঠিন।

যু। সূত্র কেন? আমি হত্যাকারীর সংবাদ পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছি।

ই। বলুন, না। এখনই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইব। কে সে?

যু। রাজাসাহেব।

ই। মাড়োয়ারী?

যু। হ্যাঁ।

ই। নিজে?

যু। হয় নিজে—নয় কোন লোকদ্বারা। তাঁহাকে ধৃত করিলেই সকল কথা প্রকাশ পাইবে।

ই। ঘটনাটা কি বলুন দেখি?

যু। রাজাসাহেবের স্ত্রীর সহিত পাঁচকড়ির ভালবাসা ছিল,—রাজাসাহেব তাহা জানিতে পারিয়া পাঁচকড়িকে খুন করেন, এবং স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রহার ও তাড়না করায় অভিমানে, রোষে, ক্ষোভে তিনি আত্ম-হত্যা করিয়াছেন।

ই। আমরাও তাহাই অনুমান করিয়াছি। কিন্তু প্রমাণ ব্যতীত মোকদ্দমা রুজু বা গ্রেপ্তার করা চলে না!

যু। প্রমাণ—প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

ই। কি কি বলুন?

তখন যুথিকা ইন্‌স্পেক্টরের নিকট প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। যুথিকার হৃদয়ে যে নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই। এই সমস্ত মিথ্যা কথা, সেই নরকের সুতীব্র উচ্ছ্বাস। মানুষের প্রাণে একবার পাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে!

সকল কথা মনঃসংযোগে শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,—"আমি আপনার কথিত সূত্রগুলি ধরিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম। অনু-সন্ধান ফল যথাকালে জানাইব।"

তার পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দানীশচন্দ্র শেষ রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। যুথিকা যে গৃহে শয়ন করিত, সে গৃহে গিয়া দেখিলেন, যুথিকা উন্মাদিনীর বেশে একখানা সোফার উপরে পড়িয়া আছে। তখন সে নিদ্রিতা! কিন্তু সে নিদ্রা সুখ-নিদ্রা নহে। দানীশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, বিবিধ স্বপ্ন দেখিতেছে,—সে স্বপ্ন যন্ত্রণাদায়ক। তাহার মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। শিরা প্রশিরা অস্বাভাবিক রূপ স্ফীত, কুঞ্চিত ও বক্র হইয়া উঠিতেছে। দানীশ বুঝিলেন পাপচিন্তারস্রোত স্বপ্নরূপে বিকাশ পাইয়া যুথিকাকে দহন করিতেছে।

দানীশচন্দ্র যুথিকাকে ডাকিলেন। সে জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। উদাস-উন্মাদ নয়নে চারিদিকে চাহিল। বক্র কঠিন দৃষ্টিতে দানীশের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"তুমি ত পাঁচু নও। তবে কেন আসিয়াছ? যুথিকার ভালবাসা লইতে? হাঃ হাঃ, ভালবাসা—মিছে কথা! ইন্দ্রিয় সংগ্রামের বাদ্যকর তোমরা—তোমরা ভালবাসার কি ধার ধার? পাঁচু জানে—জীবনের ধ্রুবতারায় লক্ষ্য রাখিয়া কেমন করিয়া মরিতে হয়—সে জানে। তাই ত সে মহৎ, সে পবিত্র! তুমি যাও—আর আসিও না। আমার সাধের ধ্যান ভাঙ্গিলে কেন?"

দা। যুথিকা,—তুমি কি যথার্থই পাগল হইলে?

যু। হাঃ হাঃ,—পাগল হইলাম?—না, এতকাল পাগল ছিলাম, এত দিনে প্রকৃতিস্থ হইলাম! যে স্বরূপ বুঝিতে পারে না, সেই ত পাগল! তুমি এখনও পাগলই আছ। পোষা কুকুরের মত এখনও

তাই আমার পিছু পিছু ছুটিতেছ!—কেন ছুটিতেছ?—ভালবাসা লোভে? হাঃ—হাঃ—বলিয়াছত,—ভালবাসিতে জানিতাম না। পাঁচুর কাছে শিখিয়াছি,—কিন্তু সে শিখাইয়াই তার মূলশুদ্ধ কাটিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে! অনেক দিন তার ভালবাসা গোপনে গোপনে হৃদয় মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছিলাম, তুমি অজ্ঞান-অন্ধ তাই দেখিতে পাও নাই! সে মহৎ—পবিত্র -শুদ্ধ, সে এ অপবিত্র হৃদয় লইবে কেন? তোমার মত লোকে ভুলে! সে ভুলিবে কেন? মহৎ শোণিতে হৃদয়ের ক্লেদ ধুইয়াছি—আর তোমাকে ছুইব না। তুমি পিশাচ,—তাই পিশাচীর প্রেমের লোভে পিছু পিছু ঘুরিতেছিলে!

বলিতে বলিতে যুথিকার নয়নদ্বয়ে জ্বলন্ত বহ্নিতেজ বিনির্গত হইল। সে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া আবার—হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল!

এতদিনে দানীশের প্রাণে অনুতাপের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল! মনে হইল—"যথার্থই আমি পিশাচ! যথার্থই আমি যাহা পবিত্র, যাহা শান্ত, যাহা সুশীতল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নরকের পিছু পিছু ছুটিতেছি। তাই বুঝি ভগবান ইহার শাস্তি দিয়াছেন!—তাই বুঝি আমার শান্তি, আমার বুকে অশান্তির নরকাগ্নি জ্বালাইবার জন্য কুলত্যাগ করিয়াছে! সত্যই কি, সত্য কলঙ্কিনী?—না না, সে অত্যাচার বিষে অস্থির হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। রামপ্রাণবাবু বলিয়াছেন—'পাপী মরিতে সাহস করে না!' সে কথা সত্য! অজ্ঞান অবস্থাতেও শান্তি আমাকে ডাকিয়াছে। রামপ্রাণবাবু শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, বহুদর্শী, তিনি মিথ্যা কথা বলিবেন না, তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন না! তবে ত আমার শান্তি আমারই আছে!

এখন যুথিকা? যুথিকা আমাকে ছলনায় ভুলাইয়া রাখিত। ইন্দ্রিয়-দাস আমি—আমি তাহার হৃদয় বুঝি নাই। পাপিষ্ঠা তাহার ছলনা-

কুহক সহায়তায় আমারই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—সে বুদ্ধিমান্, সে বুঝিয়াছিল, ইহা পাপ—ইহা প্রতারণা! আহা-হা!—সে এই পাপ-প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়াতেই তাহার অমূল্য জীবন হারাইয়াছে!

যুথিকা তাহার রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—"কি ভাবিতেছ? আমার কথা? মনে কর, যুথিকা মরিয়াছে। আমার কাছে আর আসিও না। শুনিয়াছি, তোমার স্ত্রী আছে, তার কাছে যাও। ডাক্তারখানা আমি চাহি না—তুমি যত্ন করিয়া করিয়াছ উহা তুমি নাও। আমার যে টাকা আছে, তাহা হইতেই জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব। স্পষ্ট বলিতেছি,—আর আসিও না। হতভাগীর জ্বলন্ত হৃদয়ের কাছে আর আসিও না। আমি নিশ্চিন্ত মনে সেই পবিত্র চরিত্র চিন্তা করিব। আসিলে তোমার ভাল হইবে না।"

দানীশের হৃদয় তখন অনুতাপের ভীম বহ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল! সে মুহূর্ত্ত বড় জ্বালাময়! মানুষ তাহার মায়া-জীবনের পাপরাশি মনে করিয়া মুহূর্ত্তে অবসন্ন হইয়া পড়ে, মায়া-জীবনের জ্বালান আগুণে এক দণ্ডে পুড়িয়া মরে—সমস্ত জীবনব্যাপী সংগ্রহ করা তীব্র হলাহল এক মুহূর্ত্তে পান করিয়া অস্থির কাতর হইয়া পড়ে! সে শুভ মুহূর্ত্ত কখন আসে কেহ বলিতে পারে না। যখন আসে, তখন মানুষে পুড়িয়া খাঁটি হয়, —সে বহ্নিকে—দিব্যবহ্নি বলে!

দানীশের জীবনের সেই শুক্রমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। সে সেই দিব্যবহ্নিতে পুড়িয়া পবিত্র হইল; দানীশের চক্ষে তখন যুথিকা রাক্ষসী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। দীর্ঘ দিনের সাজানো বাসনা বিদগ্ধ বিধ্বংস করিয়া দানীশচন্দ্র ডাক্তারখানার চলিয়া গেলেন। সেখানে বিনীদ্র-রজনী অতিবাহিত করিয়া ভোরের গাড়ীতে কামারহাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কামারহাটী পঁহুছিতে বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। সেখানে গিয়া শুনিলেন, শান্তির অবস্থা খুব ভাল। অন্য দিন সে সময় জ্বর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে দিন আর তাহা হয় নাই। রোগিণী বসিয়া সকলের সহিত গল্প গুজব করিতেছে!

সে দিন সে বাড়ীতে দানীশের "জামাই আদর"। দানীশের শ্বাশুড়ী (তাঁহার স্ত্রীর মাসী) জামাতাকে কত যত্ন আদর, মিষ্টভাষ আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়া, আর কখনও যাহাতে মেয়ে জামাই বিচ্ছিন্ন না হন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন!

বসন্তর প্রভাতে মধুরমলয় বহিলেও কুজ্ঝটিকা থাকিলে যেমন উত্তেজনার মধ্যে অবসন্নতার কম্পন অনুভূত হয়, এই সুখ মিলনেও শান্তির কোন দোষ ছিল না। এই অলীক আশঙ্কা আসিয়া দানীশের হৃদয়ে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ত্রাস কম্পিত করিতেছিল। রামপ্রাণবাবু সংসারে থাকিয়া পলিতকেশ হইয়াছেন। সুতরাং দানীশের মনোভাব বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না! আহারাদির পরে দানীশকে বলিলেন,—"বাবাজী এখন একটা কাজ করিতে হইবে।"

দা। কি?

রা। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। এখানে বিশ্বাস অতিশয় দৃঢ় থাকা চাই—অবিশ্বাসের বা সন্দেহের লেশমাত্র থাকিলেও একান্ত অসুখের কারণ হয়। অতএব আমি একটা প্রস্তাব করিতেছি।

দা। আজ্ঞা করুন।

রা। শান্তির চরিত্র পবিত্র সে তাহার অমূল্য নিধি সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল। তত্রাচ কিন্তু তোমার মনে সন্দেহ হইতে পারে; সে সন্দেহের পরিণাম মনোকষ্ট; অশান্তি।

দা। আপনি জ্ঞানী; আপনার অনুমান অসত্য হইতে পারে না।

এখন তোমাদের হিতৈষিগণের কর্ত্তব্য—তোমাকে শান্তির পবিত্র চরিত্রের প্রমাণ দেওয়া। তজ্জন্য আমি তোমাকে লইয়া অদ্যই গঙ্গারাম-পুরে যাইতে চাহিতেছি।

দা। সেখানে গেলে কি হইবে?

রা। শান্তি তাহার মাসীর নিকট যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্ত সত্য কি না, আমাদিগকে তাহার অনুসন্ধান লইতে হইবে।

দা। আপনি পরমাত্মীয় উভয়েরই হিতৈষী। এস্থলে আপনি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। বলা বাহুল্য ভ্রাতৃশোকের বিষম অগুণে আমার অন্তর নিরন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। উপরন্তু এ জ্বালাও নিতান্ত সামান্য উপেক্ষনীয় নহে, সুতরাং আমার মাথার বড় স্থিরতা নাই।

নদীতে রামপ্রাণ বাবুর নৌকা সজ্জিত ছিল—আজ্ঞামাত্র ভৃত্যগণ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া আসিল। পরে নিমুর অঙ্গরাখা গায়ে আঁটিয়া চারিজন পশ্চিমদেশীয় বলবান বরকন্দাজ ও একজন পাচক ও এক জন ভৃত্য নৌকায় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই রামপ্রাণ বাবু ও দানীশচন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিলেন, দাঁড়িগণ নৌকা খুলিয়া দিল।

দানীশচন্দ্র এবার আসিয়া পর্য্যন্ত একবারও শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রামপ্রাণ বাবু বা রামপ্রাণ বাবুর স্ত্রী সেজন্য

চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা যুক্তি করিয়া স্থির করিয়াছেন যে,—যখন দানীশ প্রমাণ পাইয়া শান্তির চরিত্রে শ্রদ্ধাবান্ নিঃসন্দীহান হইবেন, তখনই দেখা শুনা করা ভাল। সন্দেহ বাঁধে যে উচ্ছ্বসিত আবেগ রুদ্ধ আছে, সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে অদম্য বেগে তাহা উদ্বেলিত প্রবাহিত হইবে। চিকিৎসার ভার রামপ্রাণ বাবুর নির্দ্দেশ মতে দানীশের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থানীয় ষষ্ঠী ডাক্তারই লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কামারহাটী হইতে গঙ্গারামপুর নৌকাপথে যাইতে হয়,—সে প্রায় তিন দিনের পথ। দুই দিন দিবারাত্রি অবিরাম নৌকা চলিয়া তিন দিনের দিন বিকালবেলা গঙ্গারামপুরে পঁহুছিল।

রামপ্রাণবাবু দানীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তীরে উঠিলেন। দুবে ও চোবে দুই ঠাকুর দুই লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাঁহাদের অগ্র পশ্চাতে গমন করিল। অপরেরা নৌকায় রহিল।

তাঁহারা গোপালদের বাড়ীর সন্ধান করিয়া তথায় উপস্থিত হই-লেন। দে মহাশয় তখন একটা থেলো হুঁকায় তামাক সাজিয়া ধূম-পানে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ লাল পাগড়ী আঁটা বৃহৎ যষ্টিস্কন্ধে দুই জন বরকন্দাজ ও দুই জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভীত হইয়া হাতের হুঁকা মাটিতে ফেলিয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রামপ্রাণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বাপু?"

ঢোক গিলিয়া দে মহাশয় বলিলেন,—"আজ্ঞে গোপালচন্দ্র দে।"

রা। আ'জ কয়েক দিন হইল—একটি মেয়ে তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিল?

গো। আজ্ঞে না,—না,—আমরা গরীব—

রা। মিথ্যা বলিও না।—কোন ভয় নাই, কিন্তু মিথ্যা বলিলে বিপদে পড়িবে।

গোপালচন্দ্র প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"মহাশয়, সেই মেয়েটির জন্যই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রা। কি হইয়াছে?

গো। তবে শুনুন,—আমি ত যাইতেই বসিয়াছি। রায় মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—আমার ভিটে মাটি চাটি করিয়া, জান বাচ্ছা একগাড়ে না পুঁতিয়া ছাড়িবেন না।

রা। ভয় কি তোমার, বল না।

গো। সেই মেয়েটি এক দিন খুব ভোরের বেলা নদীর কিনারায় বসিয়া কাঁদিতেছিল,—আমার স্ত্রী আর মণ্ডলদের মেজবউ জল আনিতে গিয়া তাহাকে দেখিতে পায়,—আমার স্ত্রী সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনে। পথে রায় মহাশয় মেয়েটিকে দেখেন। তাঁহার স্বভাব ভাল নয়,—ভদ্র মানুষের অমন স্বভাব হবে কেন? তিনি এক বিধবাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠান—আমার স্ত্রী সেই কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—মেয়েটা খুব ভাল - সতীলক্ষ্মী, সে শুনে হাপুস্ নয়নে কাঁদতে লাগলো—আর ভগবান্‌কে ডেকে রায় মহাশয়ের নামে অভিসম্পাত কর্‌তে লাগলো।

দানীশ একটী উষ্ণ রুদ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একটু সরিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন:

গো। বৈষ্ণুমী ফিরিয়া গিয়া সে কথা রায় মহাশয়কে বলিলে রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়ে পাঠান। আমি গেলে আমাকে বলেন—মেয়েটিকে আমায় দাও। আমি তোমার পুরস্কার দেব—আর যদি না দাও, তোমার বিশেষ অনিষ্ট কর্‌বো। তা ছাড়া এ কথাও বল্লেন যে, তুমি না দিলেও আমি লোক পাঠাইয়া জোর করিয়া আনিব। আমি বাড়ী আসিয়া সে কথা বলি। সেই সতী লক্ষ্মীর কান্না দেখিয়া আমার স্ত্রী সর্ব্বস্ব পণ করে। তখন রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড—কিন্তু তার পরে আর সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম না।

রা। তুমি বলিতেছিলে, সেই মেয়েটার জন্ম তোমার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে—সেটা কি ব্যাপার?

গো। তারপর দিন রায় মহাশয় বলিলেন,—আমিই তাহাকে কোথায় সরাইয়া দিয়াছি। সেই রাগে তিনি আমার নামে কতকগুলি টাকার মিথ্যা দাবী দিয়া এক নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছেন।

রা। তোমার ভয় নাই,—আমি কামারহাটীর রামপ্রাণ চৌধুরী। সে পাপাত্মার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিব না,—তোমার মোকর্দ্দমার আমিই তদ্বির করিয়া দিব এবং যাহাতে পাষণ্ড উপযুক্ত শাস্তি পায়, তাহা করিব।

যদিও গঙ্গারামপুর হইতে কামারহাটি তিন দিনের পথ, কিন্তু রামপ্রাণ বাবুর ন্যায়-নিষ্ঠা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ না জানিত কে? গোপালচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং বসাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি বসিলেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া রামপ্রাণ বাবু দানীশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —"তুমি আইস, কখন গঙ্গারামপুরের নাম শুনিয়াছিলে কি? আমার বোধ হইতেছে, এ গ্রাম হইতে তোমাদের গ্রাম বড় অধিক দূর নহে। শান্তি একরাত্রে কত পথই আসিতে পারিয়াছিল!"

দা। এক রাত্রে কি প্রকারে জানিলেন?

শা। শান্তি বলিয়াছে।

দা। আমি ছোট কাল হইতে কলিকাতায়,—এদেশের গ্রাম বড় চিনি না।

তখন রামপ্রাণ বাবু দুবে ঠাকুরকে, গোপালচন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইয়া সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই

দুবেঠাকুর দে মহাশয়কে আনিয়া হাজির করিল। রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"এখান হইতে শোণপুর কত দূর জান?"

গো। শোণপুর—এই ত নিকটেই; বড় জোর তিন ক্রোশ পথ হবে।

রা। নৌকায় যাইতে হইলে কতক্ষণ লাগিবে?

গো। এই একই নদী,—নৌকা এখন ছাড়িলে সন্ধ্যার কিছু পরেই পঁহুছিবে।

শেষে তাঁহার মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে সবিশেষ আশ্বাস দিয়া রামপ্রাণ বাবু নৌকায় আরোহণ করিলেন, এবং দাঁড়ি-মঝিকে শোণপুর যাইতে আদেশ করিয়া দানীশের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৈকালের স্নিগ্ধ বাতাসে পাইল ভরে নৌকা নাতিমন্থর গমনে ভাসিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। শোণপুর পল্লী সুপ্ত,—মৃদু সমীরণে বন্য-কুসুম-বাস-সুরভিত ঝিল্লীরব মুখরিত ও তরঙ্গ রজত-শুভ্র চন্দ্রকিরণে অলঙ্কৃত ধরা বক্ষে হিল্লোলিত হইতেছিল। ক্বচিৎ বিরহ পীড়নে বিগত-নিদ্র কোন পাপিয়া বৃক্ষচূড়ে বসিয়া সপ্তমে সুর চড়াইয়া বিষণ্ণ-বিফল অনুরোধ করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছিল।

ঘাটে নৌকা লাগিলে দানীশ ও রামপ্রাণ বাবু তীরে অবতরণ করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন বরকন্দাজ নৌকায় থাকিল। অপর সকলে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

নিশীথ নিস্তব্ধ পল্লী-পথ দিয়া তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল না,—ক্বচিৎ কোন গৃহস্থের দরোজায় শায়িত কুক্কুর তাঁহাদের সাড়া পাইয়া সন্ত্রস্তভাবে দুই এক বার ডাকিয়া আবার নিস্তব্ধ হইল।

বহুদিন পরে দানীশ তাঁহাদের পৈতৃক জীর্ণ-দীর্ণ অবসন্ন আলয়চত্বরে উপস্থিত হইল। সঙ্গে রামপ্রাণ বাবু ও অপর লোকজন।

সদর দরজা বন্ধ ছিল,—আঘাত করিয়া চীৎকার স্বরে দানীশ ডাকিল,—"মা!" নৈশ-সমীরণে সে মধুর ধ্বনি সমস্ত বাড়ীটি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

বাড়ীর মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। দানীশের মাতা, মেজবৌ, সেজবৌ, নিস্তার সকলেই তখনও জাগ্রত ছিল, তাহারা দশহরার গঙ্গাস্নানে যাইবে বলিয়া উদ্যোগ করিতেছিল। শোকে-তাপে সকলেই জর্জ্জরিত,—বিষ্ণু সরকার তাঁহার স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীকে গঙ্গাস্নান

করাইতে লইয়া যাইবেন,—সেই সঙ্গে ইহারাও যাইবে। এত কালের পর যতীশচন্দ্র সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছেন, গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতে তিনিও অমত করিলেন না; এবং তিনিও সে সঙ্গে যাইবেন। তাহাদের সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া চুর-মার হইয়া গিয়াছে,—মনের আশা, তাহারা এই ত সীরথ দশহরার যোগে গঙ্গাস্নান করিয়া জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাতক ক্ষয় করিয়া আসিবে। ইহকালে ত এই সুখ—এখন পরকালের কাজটা ত চাই। হিন্দুর পরলোকে বিশ্বাসই তাহাদিগের পক্ষে ধর্ম্মার্জ্জনের সরল সোপান। তাঁহারা নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইবেন। শেষরাত্রে বিষ্ণু সরকার আসিয়া ডাকিবেন। সেই কারণে তাঁহারা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গিয়াই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। যতীশ তখন নিদ্রিত,—সময়ে উঠিবেন।

সহসা সেই চিরপরিচিত মধুর স্বরের "মা" শব্দ গৃহিণীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বৎসহারা গাভী যেমন হঠাৎ বৎসের সাড়া পাইয়া উৎকর্ণ হয়, দানীশের মাতাও তেমনি একবার মাত্র সে শব্দ শুনিয়া উৎকর্ণ হইলেন। অশ্রুরুদ্ধ নয়নে নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ ত নিস্তার; আমার দানীশ বুঝি এসেছে। তারই মত গলায় আমায় যেন 'মা' বলিয়া কে ডাকিল!"

সেই সময় দানীশ আবার ডাকিলেন,—"মা!"

বড়বৌ বলিলেন,—"ন-ঠাকুরপোই ত বটে!" নিস্তার ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দানীশ সকলকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিস্তার যথাযোগ্য স্থানে বসিবার জন্য বিছানাদি বিস্তারিত করিয়া দিল। দানীশ গিয়া মাতৃ-চরণে প্রণাম করিল। মাতা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দানীশও কাঁদিলেন। মাতা কাঁদিলেন, শচী ও ন'বৌর জন্য। দানীশ কাঁদিলেন

পাঁচকড়ির জন্য। কিন্তু দানীশ মাতাকে তাহা জানিতে দিলেন না। মাতা ভাবিলেন, শচী ও ন'বৌর জন্যই দানীশ কাঁদিয়াছে। শেষে পাঁচকড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দানীশ কম্পিত-কণ্ঠে বলিল— "ভাল আছে!"

গোলযোগে জাগরিত হইয়া যতীশচন্দ্রও উঠিয়া আসিলেন। রামপ্রাণ বাবুর পরিচয় পাইয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও আপ্যায়নাদি করিলেন। তাঁহাদের সংসারের অবস্থাও আভাসে সমস্ত জানাইয়া নীরবে অশ্রু-মোচন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"এই বিশৃঙ্খলা—এই অশান্তি উদ্ভবের এই সাজান সংসার বিধ্বংস হইবার মূল কারণ স্বয়ং তোমরাই। সংসারে ধৈর্য্য, বিবেচনা ও দৃঢ়তার সহিত কার্য্য না করিলে এইরূপ বিষম ফল ফলে। যাহা হউক, অতঃপর সাবধান হও।

যতীশচন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"নির্ব্বাপিত দীপে তৈলদানে আর ফল কি?"

এই সময় বিষ্ণু সরকার একজন মাজী সঙ্গে করিয়া সে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সহিত দানীশকে বাটী প্রত্যাগত দেখিয়া তিনি ভাবিলেন —বাড়ীতে চাবিবন্ধ করিয়া গঙ্গাস্নানে যাওয়া ইহাদের ঘটিল না।

বিষ্ণু সরকারকে দেখিয়াই যতীশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"খুড়ো মহাশয়, ইনি কামারহাটীর জমিদার বাবু রামপ্রাণ চৌধুরী।"

নাম শুনিয়া বিষ্ণু সরকার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,— "উনি এখানে?"

য। উনি দানীশের মা'সুশ্বশুর।

বি। বটে! কৈ এ সংবাদ ত আমরা আগে জানিতাম না! আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য—আমাদের গ্রামের সৌভাগ্য—যে. উঁহার আগমন হইয়াছে। তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়—

বাধা দিয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"আমাদের মেয়ে আমার বাড়ী গিয়াছে। সে জন্য পরিতাপ করিতে হইবে না। আমি ঐ জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই পুলকিত হইলেন। রামপ্রাণ বাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া বিষ্ণু সরকার আনন্দে করতালি দিয়া বলিলেন,—"যে ধর্ম্ম রাখে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। জগৎ শিখুক যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে কখনই পরিত্যাগ করেন না!

তারপর রামসেবকের সমস্ত কুক্রিয়ার কথা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"দানীশ শুন্‌লে?"

সকল কথা শুনিয়া দানীশ মস্তক অবনত করিলেন;—কোন কথা কহিলেন না! দানীশের মাতা ও বড়বৌ প্রভৃতি সকলেই সে কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলেন। নিস্তার এই দুর্ঘটনার মূল রামসেবককে উদ্দেশ করিয়া শত সহস্র অভিসম্পাৎ করিল।

বিষ্ণু সরকার যতীশচন্দ্রকে বলিলেন,—"গঙ্গাস্নানে তবে কেবল তোমার মা আমাদের সঙ্গে চলুন, তোমাদের আজ আর যাওয়া হইবে না।

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"সকলেরই যাওয়া হইবে। এই ত উত্তম সুযোগ উপস্থিত। নৌকাপথে কলিকাতায় যাইতে হইলে কামারহাটীর নীচে দিয়াই যাইতে হয়। আমরাও নৌকায় আসিয়াছি.—এই রাত্রেই সকলে রওনা হইব। শান্তির এখনও অসুখ সারে নাই. আমরা বিলম্ব করিতে পারিব না। বাড়ীতে গিয়া সকলে এক দিন

আনন্দ করিব, তারপরে আপনারা কলিকাতায় যাইতে হয় যাইবেন। কামারহাটীর নীচেও গঙ্গা আছেন, দশহরার স্নান সেখানেও হইতে পারিবে। তখন সেই যুক্তিই স্থির হইয়া গেল।

তখনকার মত কিছু জলযোগ করিয়া রাত্রিশেষে সকলে নৌকারোহণ করিলেন। অগ্রপশ্চাৎ হইয়া দুইখানি নৌকা চালিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সে বড় আনন্দের দিন। নৌকা দুইখানি যখন আসিয়া কামার-হাটীর ঘাটে পঁহুছিল, তখন নিদাঘ-নিশা অবসান প্রায়। সকলে উঠিয়া রামপ্রাণ বাবুর বাটিতে গমন করিলেন।

শান্তির তখন জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল,--সে পথ্য করিয়াছিল। সকলের আগমন সংবাদ শুনিয়া উদ্দম আকুল হৃদয়ে তাঁহাদের নিকটে ছুটিয়া একে একে সকলের চরণ বন্দনা করিয়া বড়বৌর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ভাসাইল। বড়বৌও চক্ষুর জল ধারণ করিতে পারিলেন না। তারপরে শ্বাশুড়ী, মেজবৌ, সেজবৌ ও বিষ্ণু সরকারের স্ত্রী প্রভৃতি, ক্রমে ক্রমে সকলের সহিত নানা কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামপ্রাণ বাবুর স্ত্রী তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং সকলের নিকট বসিয়া বিবিধ গল্প-গুজব করিয়া, বাকি রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলেন।

দানীশের প্রাণে তখনও আনন্দ স্থান পায় নাই,—পাঁচকড়ির শোক সে সামলাইতে পারে নাই। অধিকন্তু যখন তাহার মা এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন, তখন না জানি কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হইবে। দানীশচন্দ্র এই চিন্তায়ই আকুল!

দানীশ তাহাদের নিকট হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতেছিলেন, মাতা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখান থেকে কলিকাতা কত দূর?"

দা। বড় বেশী নয়। কেন?

মা। পেঁচোকে একটা খবর দিতাম। কত দিন দেখিনি।

দা। দিব।

মা। আচ্ছা, তোর সেজ দাদার কোন খোঁজ-খবর পাস্‌নি?

দা। না। কলিকাতার মধ্যে যেখানে যেখানে আমাদের দেশের লোক বা আত্মীয়-স্বজন আছেন, সে সকল জায়গায় খবর লইয়াছি। কোথাও তিনি আসেন নাই।—বোধ হয়, কলিকাতাতেই আসেন নাই। মাতার নয়নদ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা আমার আছে কি না, তাই বা ঠিক কি?"

অদূরে থাকিয়া সেজবৌ সে কথা শুনিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। দানীশ বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেকক্ষণ চিত্তস্থির করিতে পারিলেন না।

ক্ষিতীশের কথা মনে উঠিল,—হায়! তিনি কি আর জীবিত নাই? কিন্তু পাঁচকড়ির কথা মা শুনিলে যে কি করিবেন,—মায়ের বুকে যে কি আগুণ জ্বলিবে, ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়।"

রামপ্রাণ বাবুর এই কয় দিনের দৈনিক ইংরাজী খবরের কাগজগুলা আসিয়া জমা হইয়া পড়িয়াছিল। ভৃত্যের নিকটে সেগুলা চাহিয়া লইয়া দানীশচন্দ্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নৈদাঘী প্রভাত;—ঘরের ছায়াকে অবাধ প্রচুর আকাশের আলো আসিয়া যেন ভাসাইয়া ধুইয়া মগ্ন করিয়া দিতেছিল; সে গৃহ তখন জনশূন্য, এবং একটি ঘড়ি কেবল টীক্‌ টীক্‌ করিয়া শব্দ করিতেছিল।

দানীশচন্দ্র একখানা কাগজ খুলিয়া তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিতে ছিলেন; সহসা একস্থানে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি চঞ্চলিত হইয়া উঠিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার তাহা পাঠ করিলেন। তৎপরে কাগজখানা হাতে করিয়া বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানার প্রধান গৃহে গমন করিলেন। সেখানে,রামপ্রাণ বাবু, যতীশচন্দ্র, বিষ্ণুসরকার প্রভৃতি সকলে বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিলেন।

দানীশ কাগজখানা রামপ্রাণ বাবুর সম্মুখে ধরিয়া সেই প্যারা-টিতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—একটী আশ্চর্য্য সংবাদ দেখুন।

রামপ্রাণ বাবু উত্তেজিত হইয়া তাহা পাঠ করিলেন। দানীশের মুখের দিকে আনন্দসস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"ক্ষিতীশচন্দ্র তোমার কে ?"

দা। আমার তৃতীয় অগ্রজ।

যতীশচন্দ্র ক্ষিতীশচন্দ্রের নাম শুনিয়া কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, বিবেচনা করিয়া দানীশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ক্ষিতী-শের কি হইয়াছে রে ?"

দা। তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই, তবে ইহা তাঁহারই সম্বন্ধীয় ঘটনা শুনুন।

দানীশ সেটুক পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

"আমরা গভীর দুঃখের সহিত গত সংখ্যক কাগজে আমাদের সহকারী সম্পাদক মিঃ জন্‌ষ্টোন্ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছি। তিনি এ যাবৎ বিবাহ করেন নাই—কর্ম্মবীর, জগতের কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। দরিদ্রের সেবা করিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে,—আশী হাজার টাকা। মৃত্যুকালে তিনি একখানি উইল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত টাকা ও উইলখানি তাঁহার এটর্ণিগণের নিকট আছে। আশী হাজারের মধ্যে চল্লিশ হাজার তাঁহার জন্মভূমি লণ্ডনের দরিদ্রাবাসের অধ্যক্ষকে দরিদ্র পোষণের জন্য দিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাগণকে দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক মাঠের মধ্যে সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক আহত হন,

সেই সময় নিঃস্বার্থভাবে একটি বাঙ্গালীবাবু তাঁহাকে শুশ্রূষা করেন, তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় তিনি সে-ক্ষেত্রে জীবন প্রাপ্ত হয়েন. সেই বাঙ্গালী বাবুকে বিংশ সহস্র মুদ্রা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সেই বাঙ্গালী বাবুর নাম ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, নিবাস বঙ্গদেশের শোণপুর। আর বক্রী কুড়ি হাজারের মধ্যে দশ হাজার দুর্ভিক্ষ-সমিতির হস্তে ও দশ হাজার মিশনারী ফণ্ডে দান করিয়া গিয়াছেন!"

পাঠ সমাপ্ত হইলে, যতীশচন্দ্র বলিলেন,—"ক্ষিতীশ কোথায়? সে কি টাকা লইয়া গিয়াছে?'

দা। ইহা পাঠে সে সকল বুঝিবার কোন উপায় নাই। আমি দুপুরের গাড়ীতে কলিকাতায় যাই,—এই কাগজের আফিসে যাইলে তিনি আসিয়াছিলেন কি না, যদি আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ঠিকানা কোথায় এ সকল সহজেই জানিতে পারিব।

য। তবে আর বিলম্ব করিস্ না। না হয় আমিও তোর সঙ্গে যাই চল্।

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"একটি ভদ্রলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন তিনি ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"বিদেশী?"

ভৃ। হবে—আমি চিনি না।

রা। ভিতরে ডাক্।

ভৃ। আমি ভিতরে আসিতে বলিয়াছিলাম, তিনি আসিলেন না। বলিলেন,—দেখা করিয়া এখনই যাইব।

দানীশচন্দ্র উঠিয়া ভৃত্যের সহিত গমন করিলেন। সদর দরজার নিকট একটি ভদ্রলোক ডাক্তার বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ

ফিরিয়া সিংহদরজার কারুকার্য্য দর্শন করিতে ছিলেন। দানীশ নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে মহাশয় ?"

ভদ্রলোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নিমিষ মধ্যে দানীশচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"সেজদাদা, সেজদাদা, আমাদিগকে ছাড়িয়া আপনি কোথায় ছিলেন ?"

ক্ষিতীশচন্দ্রের চক্ষুও জলভারাকীর্ণ হইল। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, —"অনেক দূর ঘুরিয়াছি। অর্থ কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধানেই এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, বহুবাজার ষ্ট্রীটের উপরে তোমার নামযুক্ত সাইনবোর্ড দেখিয়া মনে কৌতুহল হইল —তুমি কি না। ভিতরে গিয়া সন্ধান করিয়া জানিলাম তুমিই বটে। কিন্তু সেখানে একি ভীষণ সংবাদ শুনিলাম! হ্যাঁরে আমাদের স্নেহ মমতার আধার পেঁচো নাই ? আহা-হা, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

দা। সেজদাদা চুপ করুন। মা, বড়বৌ, মেজদাদা প্রভৃতি সকলেই এখানে আসিয়াছেন,—তাহার এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলে এককালে অধীর—শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন। বিশেষ সে মায়ের কোলের ছেলে মাকে বাঁচান দুর্ঘট হইবে।

ক্ষি। সে কি ? মা প্রভৃতি এখানে কেন ?

দা। এই বাড়ীর—অধিস্বামী রামপ্রাণ বাবু আমার মাস্-শ্বশুর।— ব্যাপার ঘটিয়াছে অনেক,—ক্রমে সব শুনিতে পাইবেন। বাড়ীর মধ্যে চলুন। আপনি এখানকার সন্ধান আমার বাসাতেই পাইয়াছেন বুঝি!

ক্ষি।—হাঁ। আমি গত পরশ্বঃ প্রথমে তোর বাসায় যাই,—আবার কা'ল যাই। একজন কম্পাউণ্ডার বলিল—ডাক্তারবাবু কয়েক দিন হইল কামারহাটী রামপ্রাণবাবুর বাড়ী রোগী দেখিতে গিয়াছেন,

আজও ফিরেন নাই। নূতন কোন বিপদের আশঙ্কা করিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছি।

দা। সেজদাদা—আপনি কি উড়িষ্যার দিকে গিয়াছিলেন?

ক্ষি। কেবল উড়িষ্যা কেন ভারতে অনেক স্থানই ঘুরিয়াছি।

দা। উড়িষ্যার কোন পল্লীর মাঠে কোন সাহেব সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, আপনি জানেন?

ক্ষি। জানি,—আমিই তাঁহাকে তুলি। তার পরে দুজনে সে রাত্রে এক পল্লীতে গিয়া থাকি। সকালে তাঁহাকে পুরীতে পাঠাইয়া দেই।

দা। সে সাহেব হঠাৎ মারা পড়িয়াছেন!

ক্ষি। আহা, তিনি বড় ভদ্রলোক! মারা পড়িয়াছেন, আমারই অদৃষ্ট-দোষ। তিনি আমার দরিদ্র অবস্থার কথা শুনিয়া কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। বোধ হয় একটা চাকুরীর যোগাড় করিয়া দিতেন। কিন্তু আমি ভাবিলাম কিছুদিন তীর্থ দর্শন করিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলে তারপরে কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কলিকাতায় আসিয়াই তোমার বাসার সন্ধান পাইয়াছি,—সাহেবের নিকট "যাব-যাচ্ছি" করিয়া আর যাওয়া ঘটে নাই। এখন বুঝিলাম, সে আশাও শেষ হইয়াছে, কিন্তু দানীশ, তুই কি করিয়া উড়িষ্যার সংবাদ সব জানিতে পারিলি; সাহেবের সঙ্গে বুঝি তোর আলাপ ছিল? সাহেব বুঝি তোর কাছে কথায় কথায় ঐ গল্প ও আমার নাম করায় বুঝ্‌তে পেরেছিলি?

দা। আজ্ঞে না। তিনি মৃত্যুকালে কুড়ি হাজার টাকা আপনার নামে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এইমাত্র আমরা তাহা কাগজে পড়িতেছিলাম। তাহাতেই আপনার নাম ও উড়িষ্যার ঘটনা লেখা আছে।

ক্ষি। ধন্য হৃদয়।—এই সামান্য দরিদ্রের কথা—সেই সামান্য উপকারের কথা, মৃত্যুকালেও তাঁহার স্মরণ ছিল! এমন না হইলে জাতি কখন জগতের মধ্যে এত উচ্চ, এত উন্নত—এত সম্মানিত হয়?

দা। আপনি আসুন,—মেজদাদা, বিষ্ণু খুড়া সবাই বৈঠকখানায় আছেন, দেখা করুন। মাকে দেখা দিন—তিনি আপনাদের জন্যে বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তারপরে আহারাদি অন্তে আপনি ও আমি দুপুরের গাড়ীতে কলিকাতায় যাইয়া আপনার সেই কুড়ি হাজার টাকা বাহির করিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিব।

ক্ষিতীশচন্দ্র দানীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈঠকখানায় গমন করিলেন। দানীশ দরোজার কাছে পৌঁছিয়াই বাষ্পাকুলিত লোচনে ডাকিয়া বলিলেন,—"মেজদাদা দেখুন সেজদাদা আসিয়াছেন।"

"ক্ষিতীশ!"—এই কথা বলিয়াই যতীশচন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠিতেছিলেন ক্ষিতীশ গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। উভয় ভ্রাতা উভয় ভ্রাতাকে স্নেহ-ভক্তির বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। সেস্থান তখন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। রামপ্রাণবাবু ও বিষ্ণু সরকার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

তারপরে ক্ষিতীশ বাড়ীর মধ্যে গিয়া মার চরণে প্রণাম করিলেন। মাতার রুদ্ধ অশ্রুজলে দৃষ্টিরোধ হইল,—বহু দিবসের সঞ্চিত শোকবারি-প্রবাহ আসিয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। অবশেষে ক্ষিতীশের মস্তকে হস্তামর্শণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামপ্রাণ বাবু যেমন বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক, তাঁহার স্ত্রীও তদ্রূপ। তিনি বুঝিলেন এই দীর্ঘ দিবসের বিরহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনাকাঙ্ক্ষা কিরূপ প্রবল। তাঁহার বাড়ী—বিরহ-ব্যথিত দম্পতির পক্ষে পরের বাড়ী; এখানে সে সুযোগ তাঁহাকেই করিয়া দিতে হইবে।

ক্ষিতীশ যখন মাতৃচরণে, দানীশের শ্বাশুড়ীর চরণে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূদ্বয়ের চরণে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন এক দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল,—"আপনাকে একবার আসিতে হইবে।"

ক্ষি। আমাকে ডাকিতেছ?—তোমার বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে!

দা। বড় লোকের বাড়ী চাকৃরী করি,—ভুলের দণ্ড আর জানি না? আপনি আসুন,—আপনাকেই ডাকা হইতেছে।

ক্ষিতীশচন্দ্র গৃহপ্রবেশ করিলেন। উন্মাদিনীর মত মেজবউ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল। পদদ্বয় ধরিয়া সরোদনে আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"আমায় ক্ষমা করিবে কি?"

ক্ষি। মেজবউ; তুমি? তুমি আমার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছ কেন? দাদার অবস্থা ভাল,—আমি দরিদ্র, বোধ হয় আমার নিকট আসিতেও তোমার কুণ্ঠা—ঘৃণা—অপমান বোধ হয়!

সে। আমি স্ত্রীলোক, বুদ্ধিহীনা—আমি আগে অত শত বুঝি নাই! তখন বুঝি নাই, যে স্বামীর পদছায়ায় রমণীর সকল সুখ রক্ষিত—স্বামীর অনুগ্রহদৃষ্টির উপরই রমণী ইহজগতে ও পরজন্মের যাহা কিছু ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। আমি তোমার আশ্রিতা, সেবিকা। আমি জ্ঞানহীনা—আমায় ক্ষমা কর। আবার সেইরূপ স্বরে বল—'মেজবউ, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।'

ক্ষি। এ সকল তোমাকে কে মুখস্থ করাইল?

সে। না দেব, এ সকল মুখস্থ কথা নহে! এ সকল আমার প্রাণের কথা। আমি তোমার অভাব বুঝিয়াছি,—শ্বশুরবাড়ীর মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি,—তাই বাপেরবাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম। বুঝি সেই পুণ্যফলেই আ'জ তোমার দেখা পাইলাম।

ক্ষি। কিন্তু আমি সেই গরীব।

সে। তুমি, আমার রাজরাজেশ্বর। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া দুইজনে পরিব; এক বেলা রাঁধিয়া বাড়ীর সকলে মিলিয়া আহার করিব; তাহাও সুখের—তাহাও মানের। রমণীর শ্বশুরবাড়ী আর স্বামী—ইহাই মান ও সুখের আস্পদ—প্রীতি-প্রেমের আগার—পুণ্য-পবিত্রতার তীর্থক্ষেত্র।

ক্ষিতীশচন্দ্র বহুদিনের বিরহ-বিকার বিদীর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না,—পত্নীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া তাহার গোলাপ কুসুম গণ্ডে দাম্পত্যের মিলনচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দানীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র সেই দিন দিবা দুইটার সময়ে সেই খবরের কাগজের আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষিতীশের পরিচয় দিয়া এটর্ণির আফিসের ঠিকানা জানিয়া তথায় গমন করিলেন। টাকা সাহেবের এটর্ণির নিকট গচ্ছিত ছিল।

সেখানে গিয়া ক্ষিতীশের পরিচয় ও কলিকাতাবাসী একজন ভদ্রলোক দ্বারা তাঁহার সনাক্ত করাইয়া ব্যাঙ্কের উপর কুড়ি হাজার টাকার চেক লইয়া ফিরিলেন।

দানীশের ইচ্ছা হইতেছিল, একবার ডাক্তারখানার অবস্থাটা দেখিয়া যান। আবার ভাবিলেন, সেইখানে গেলে দাদার সম্মুখে আসিয়া হতভাগিনী যুথিকা যদি সেই সকল কথার আলোচনা করে, তবে বড়ই লজ্জা পাইতে হইবে। তখন স্থির করিলেন,—পরদিন একাকী আসিবেন; সে দিন কামারহাটী যাইবেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে দুই ভ্রাতায় আরোহণ করিলেন। গাড়ী যথাসময়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন,—আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘের উদয় হইয়াছে। দিগন্ত মেঘ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

রামপ্রাণ বাবু তাঁহারা আসিবেন বলিয়া ষ্টেসনে দুইটি অশ্ব রাখিয়াছিলেন। দুই ভাই অশ্বে আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কষাঘাত করিলেন। বলবান্ অশ্ব দুইটি কশাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া বাতাসের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছিতে পারিলেন না।

যখন তাঁহারা কামারহাটী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন মেঘ ডাকিয়া জল আসিল,—আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জন প্রবল হইতে প্রবলতর হইল,—বায়ু প্রবাহ ভীষণাকার ধারণ করিল,—বৃষ্টিও মুষলধারে পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এইরূপে দৈব-দুর্য্যোগের পর প্রকৃতি আবার স্থির মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু আকাশের মেঘ তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই,—বৃষ্টি বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছিল,—মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ বিদ্যুৎ বিকশিত হইতেছিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র ও দানীশচন্দ্র তখনও ঠাকুর বাড়ীর একটা গৃহ মধ্যে উপবেশন করিয়া অন্যান্য নানা কথার পরে পাঁচকড়ির মৃত্যু-প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। সহসা বাহির হইতে কে ডাকিয়া বলিল,—"ঘরে কে আছেন মহাশয়, একবার দরজা খুলুন,—আমি বড়ই বিপন্ন!" সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র অতি বিস্ময় চকিত নয়নে দানীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। বিস্ময় চকিত-স্বরে বলিলেন,—"দানীশ, দানীশ,—পেঁচোর গলা না?"

দানীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। গৃহের আলো বাহিরে পড়িল। দরজার নিকটে অভাবনীয়-অচিন্তনীয় দৃশ্য!---ভয়ে বিস্ময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট—অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন, দরজার নিকটে পাঁচকড়ি—তাহার বক্ষোদেশে শচী! উভয়েই জলে ভিজিয়াছে।

দানীশচন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"পাঁচকড়ি, আমরা কি তোমাদের প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি? তোমরা কি পরলোকের রাজ্য হইতে আমাদিগকে দেখা দিতে না ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

পাঁচকড়ি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"না দাদা, আপনি এই গ্রামে আছেন শুনিয়া কলিকাতা হইতে দেখা করিতে আসিতেছি। বুকে আমাদের হারাধন শচী। সব কথা বলিতেছি,—সমস্ত বৃষ্টিটা আমাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। আপনাদের শুকনো কাপড় দিয়া শচীর গাটা মুছাইয়া উহার গায়ে শুকনো কাপড় দিয়া দিন।"

পাঁচকড়ি গৃহপ্রবেশ করিল। শচীকে কোল হইতে নামাইল। দানীশের কম্পিত হস্ত শচীর গাত্রস্পর্শ করিল,—শচী ছুটিয়া গিয়া সেজো-কাকার কোলে উঠিল, ন'কাকাকে সে বড় চিনিত না।

তখন ক্ষিতীশ ও দানীশ বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুকদ্বয়ের রক্তমেদ অস্থি-মাংস সমন্বিত পার্থিব দেহ,—তাহারা ছায়াশরীরী প্রেতমূর্ত্তি নহে।

দানীশ বলিলেন,—"পাঁচকড়ি, প্রাণাধিক; আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

পাঁ। না দাদা, স্বপ্ন নহে। আমি মরি নাই।—ঘটনা শুনুন; যুথিকা আমাকে হত্যা করাইবার ষড়যন্ত্র করে। রাজা সাহেব তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণকে দুইহাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া, আমার হত্যার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। সে ব্রাহ্মণ দুই হাজার টাকাও লইব, অথচ নরহত্যার পাতকীও হইবে না, এই স্থির করিয়া গভীর নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশ করে। আমাকে জাগাইয়া কিছু দিন গোপনে থাকিতে বলে। আরও বুঝাইয়া দেয় যে, এখন কিছুদিন গোপনভাবে না থাকিলে যুথিকার হাতে আমার নিস্তার নাই,—আমি সব বুঝিয়া দেখিয়া তাহার কথায় স্বীকৃত হই। কেন হই, জানেন?—আমার দ্বারা পাছে আপনার কোন অনিষ্ট ঘটে। সে আমাকে গৃহ হইতে বাহির

করিয়া দিয়া, একটা ছাগল কাটিয়া আমার শয্যায় ও গৃহতলে রক্ত ঢালিয়া ছাগদেহ লইয়া চলিয়া যায়।

দা। কি সর্ব্বনাশ! সে ব্রাহ্মণ এখন কোথায়?

পাঁ। সে তৎপরদিবস প্রাতঃকালেই রাজাসাহেবের নিকট অর্থ লইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে।

দা। যাক্,—ও সকল কথা পরে শুনিব। শচীকে কোথায় পেলি? আমি শুনিয়াছি—শচীর মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আশা হইয়াছিল!

পাঁ। হাঁ, সেই কথাই বলিতেছি,—আমি সেই শেষ রাত্রে রাস্তা বাহিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলাম; একবার ভাবিলাম বাড়ী যাই—আবার ভাবিলাম, বাড়ী গেলেও নানা অশান্তি—দিনকতক দেশভ্রমণ করিয়া আসি। কিন্তু কোথায় যাইব? ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া বেলেঘাটার দিকে গেলাম। খালধারে গিয়া বেড়াইতেছি, সেই সময় একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল, তিনি বাদা অঞ্চলে যাইবেন—নৌকা ভাড়া করিবার জন্য ঘুরিতেছিলেন। আমিও তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া দুইজনে তাহাতে আরোহণ করিলাম। নৌকা বাদা অভিমুখে চলিল।

"আপনারা সংগ্রামপুরের নাম শুনিয়াছেন কি? এই স্থানে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সহিত দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে দিল্লীর সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। আমরা যে দিন সেই সংগ্রামপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, সেই দিন রাত্রে আজিকার মত দৈবদুর্য্যোগ ঘটিয়াছিল,—সেই দুর্য্যোগে আমাদের নৌকা ডুবিয়া

সে ভদ্রলোকটি, দাঁড়ী মাঝী সব কে কোথায় গেল জানি না;

আমি সাঁতরাইয়া কূলে উঠিলাম—যেখানে উঠিলাম সে স্থানটায় অতি ভীষণ জঙ্গল। চারিদিকে বন্য পশুচয় ভীষণ রব করিতেছে—দেখিয়া শুনিয়া আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম। অদূরে একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়া মনে একটু আশা জন্মিল। পরক্ষণেই মৃদু ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল ;—বুঝিলাম ঐ স্থানে মানুষ আছে!

"তখন সেই আলোকরশ্মি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি, সে একটী দেব মন্দির। মন্দিরের অর্গল উন্মুক্ত—মুক্ত দ্বার-পথে দেখিলাম, মন্দির আলো করিয়া কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন ; সম্মুখে পদ্মাসন করিয়া এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। ধূনাচি হইতে ধূনার ধূম উঠিয়া দিগন্ত সুগন্ধীকৃত করিতেছে। আমি ভক্তিভরে মাতৃ-চরণে প্রণাম করিলাম।"

দা। শচীকে কোথায় এবং কি প্রকারে পেলি তা'ত বল্‌ছিস্ না!

পাঁ। তাই বলিতেছি। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর সমাধি ভঙ্গ হইল। আমি আর্দ্রবস্ত্রে দরজার সম্মুখেই বসিয়াছিলাম,—সন্ন্যাসী পূজা সমাপণ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত কথা বলিলাম। মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি গৃহ, সন্ন্যাসী ডাকিবামাত্র তথা হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিলে তাঁহাকে একখানি শুষ্কবস্ত্র আনিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য বস্ত্র আসিয়া দিল, আমি পরিধান করিলাম। সন্ন্যাসী প্রসাদ দিলেন, আমি আহার করিলাম,—তারপরে সে রাত্রে সেই-স্থানেই নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। পরদিন উঠিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইতে গিয়া দেখি, তাঁহার নিকট শচী। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল,—এ কি শচী? জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। "ঐ আমার ছোট কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া

শচী আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং "বাড়ী চল্ বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

"এই ঘটনা কি বিস্ময়কর, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। যে শচীর মৃতদেহ নিজ হস্তে শ্মশান-ভূমে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম—সে আবার ছোটকাকা বলিয়া গলা জড়াইয়া বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদিতেছে। এই সুদূর বিজন বনে—মায়ের মন্দিরে সন্ন্যাসীর পার্শ্বে সে কোথা হইতে আসিল ?

"আমি বিস্ময়-গদগদকণ্ঠে সন্ন্যাসীর চরণে পতিত হইয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—ইচ্ছাময়ী মা; কোন্ ইচ্ছায় কি কার্য্য করেন, কিছুই বলা যায় না! তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে দিন তোমরা শ্মশানে ফেলিয়া যাও, আমি সে দিন সেই শ্মশানে উপস্থিত ছিলাম। সে দিন অমাবস্যা রজনী, দেশভ্রমণ করিতে করিতে তোমাদের দেশে গিয়া পড়িয়াছিলাম—অমাবস্যার সাধনজন্য সে দিন ঐ শ্মশানেই আসন করিয়াছিলাম।

"একটি শবের প্রয়োজন ছিল,—তোমরা যেই চলিয়া গেলে, আমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের শবদেহ তুলিয়া আনিতে গেলাম! তুলিয়াই দেখি, অপান বায়ু সেই দেহে অবিকৃত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। সর্প দংশনের রোগী—বিষে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—অপান রহিয়াছে, প্রাণ গিয়াছে! কিন্তু রজ্জুবদ্ধ শ্যেনপক্ষী ঊর্দ্ধদেশে উড়িয়া গেলেও যেমন রজ্জু ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নামান যায়, তেমনি অপান বায়ু থাকিলে তৎসাহায্যে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়;—অর্থাৎ অপান আসিলে প্রাণ আসিতে পারে! আমি সর্পবিষের ঔষধ জানিতাম, তখনই সেই ঔষধ ইহার শরীরে প্রবিষ্ট করাইলাম এবং জল চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—রোগীর প্রাণ আসিল, সে জীবিত হইল। একবার ভাবি-

লাম, অনুসন্ধান করিয়া যাহাদের ছেলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া যাই—আবার ভাবিলাম, তাহারা ইহার মায়া কাটাইয়াছে,—অথচ আমার একটী ছেলের প্রয়োজন। আমি মায়ের সেবক—আমার দেহত্যাগের পর আর একজন সেবকের প্রয়োজন—এই ছেলেটীকে পালন করিয়া, কালে ইহাকে তন্ত্র দীক্ষা দিয়া মায়ের সেবক করিয়া রাখিয়া যাইব, এই ভাবিয়া ইহাকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম।

"আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম,—'প্রভো! যদি শচীর জীবন দিয়াছেন, আমাদের জীবন দিন—ইহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করুন। শচী আমাদের বাড়ীর সকলের জীবন সর্ব্বস্ব!'

"সন্ন্যাসী প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—মায়ামুগ্ধ মানব, এখনও এত ভ্রান্তি! কে কাহার? শচী গিয়াছিল, রাখিতে পার নাই?—আবার আসিয়াছে তোমাদের সাত ডাকেও আসেনি। তবে অহং জ্ঞান কেন?"

"আমি নিরুত্তর রহিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন,—'শচীকে লইয়া যাও; আমার আপত্তি নাই।' আমিও যাইব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোথায় প্রভু?'

"সন্ন্যাসী বলিলেন.—'পরলোকে।' আজ রাত্রেই আমি এই মরদেহ ত্যাগ করিব। আমার এ জন্মের পরমায়ু ফুরাইয়াছে। শচীকে পালন করিয়াছি তাহাকে কিছু অর্থ দিতে ইচ্ছা করি।"

আমি। শচী আপনার দাস—যাহা ইচ্ছা হয় করুন। কিন্তু আমি বড় ব্যথিত হইলাম,—আপনার দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আমার প্রাণ বিচলিত হইতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, আপনার চরণপ্রান্তে বসিয়া কিছু ক্রিয়াযোগের উপদেশ লইব।

'সন্ন্যাসী। আমি তোমাকে অদ্যই দীক্ষিত করিব,—আর এই মায়ের ভার, তোমাকেই দিয়া যাইব। বুঝি, মায়েরও ইচ্ছা তাই। তাই তুমি আজ অভাবনীয়রূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।'

আমি। আপনার কথায় আমি পুলকিত হইলাম। কিন্তু আমার দুইটি মাত্র কথা আছে।

সন্ন্যাসী। 'কি বল?'

আমি। প্রথম কথা,—আপনার কথায় বুঝিতে পারিতেছি, মৃত্যু আপনার ইচ্ছায়ত্ত—অতএব আর কিছুদিন দেহত্যাগ না করিলে হয় না?

'সন্ন্যাসী। মৃত্যু আমার ইচ্ছায়ত্ত নহে,—অরিষ্ট * দর্শনে অদ্য মৃত্যু হইবে, স্থির করিতে পারিয়াছি। তবে মৃত্যুকালে যাহাতে জীবাত্মা স্মৃতিযানের পথে না গিয়া দেবযানের পথে যায়, তজ্জন্য যোগাবলম্বন করিতে হয়,—সন্ধ্যার পরে তাহাই করিব। আর কি কথা বলিতে যাইতেছিলে?'

আমি। আপনার নিকট দীক্ষিত হইয়া মাতৃ-চরণ সেবা করি, ইহা আমার মানব জন্মের সার্থক সাধনা। কিন্তু প্রভু, আপনার ন্যায় আমার কোন ঐশ্বর্য্য নাই—এই জনহীন ভীষণ জঙ্গলে আমি থাকিব কি প্রকারে?

* মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের অল্পে অল্পে স্বভাবের বৈপরীত্য হইতে থাকে। তৎসঙ্গে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার বা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সে সকল বিকার বা সে সকল মরণ-লক্ষণ সকলে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সাধক—যাঁহারা যোগী, তাঁহারা সমস্তই বুঝিতে পারেন। সেই সকল মরণ-সূচক বিকার বা মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ শাস্ত্রীয় ভাষায় "অরিষ্ট" নামে অভিহিত হয়।

"সন্ন্যাসী। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই দেখিতেছি, যে তাঁহার মূর্ত্তি লোকালয়ে যায়। তুমি এ মূর্ত্তি তোমার বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্থাপন করিও। আইস শচীকে আমি যে অর্থ দিব, ও দেবতার যে অর্থ আছে, তাহা তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

"এই বলিয়া সন্ন্যাসী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আরও অধিকতর জঙ্গল মধ্যে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া একটী অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল খনন করিয়া সাতটা পিত্তলের কলসী দেখাইয়া বলিলেন, উহার পাঁচটা দেবতার ও দুইটা আমার নিজের। আমার নিজের দুইটা শচীকে দিও, আর দেবতার পাঁচটা দেবকার্য্যে লাগাইও।"

'তারপরে সেগুলা আবার সেইরূপ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলাম।"

"মন্দির সন্নিধানে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী আমাকে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। আমি স্নান করিয়া আসিলাম,—মাতৃ-চরণ সন্নিধানে বসিয়া তিনি আমাকে পূর্ণাভিষিক্ত দীক্ষাদান করিলেন,—আমি নবজীবন পাইলাম।"

"তারপর মায়ের পূজা সমাপ্ত করিয়া আমার নামধাম, পিতার নাম প্রভৃতি জানিয়া সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া গেলেন, এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে একখানি রেজেষ্টারী করা দানপত্র প্রদান করিলেন,—সেই দলীলে দেবতা ও দেবধন আমাকে দান করিয়া গেলেন, তাহাই লিখিত হইয়াছিল।"

"সন্ধ্যার পর মায়ের আরতি সমাপ্ত করিয়া, সন্ধ্যা ভোগ নিজ হস্তে নিবেদন করিয়া দিয়া আমার গুরু—মায়ের সেবক সেই সন্ন্যাসী—পদ্মাসন করিয়া বসিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় দেখা গেল, তাঁহার পূত-আত্মা দেহত্যাগ করিয়া মাতৃ-ধামে চলিয়া গিয়াছে!"

"পরদিন সকালে উঠিয়া তাঁহার পবিত্র দেহের সৎকার করিলাম। তারপরে কি করি, কি প্রকারে শচী, মাতৃ-মূর্ত্তি তত ধনরত্ন লইয়া বাড়ী যাই, এই সকল চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। অবশেষে পুলিশের সাহায্য লইলাম, আমার দানপত্র দেখাইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যের কয়েক দিনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুলিসের উপরে দিয়া শচীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম,—উদ্দেশ্য, আপনাকে সেখানে লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিব। উপরন্তু সেখানে নৌকাও মিলে না, কলিকাতায় আসিবার অন্যতম উদ্দেশ্য তথা হইতে নৌকা লইয়া গিয়া তাহাতে সমস্ত তুলিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

"কলিকাতার বাসায় গিয়া শুনিলাম, আপনি কামারহাটী বাবুদের বাড়ী আছেন। যুথিকা সে বাড়ী ছাড়িয়া তাহার মাতার বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। রাজাসাহেবকে লইয়া পুলিসে বড় টানাটানি করিতেছে। ভদ্রলোকের কষ্ট দেখিয়া আমি পুলিসে গিয়া দেখা দিয়া আসিলাম। আমি যখন করি নাই, তখন আর তাঁহার দায় কি?"

"সমস্ত কথা আপনাদিগকে বলিলাম, এখন যাহা ভাল হয়, করুন। মেজদাদা, এখানে কবে আসিলেন?"

ক্ষি আমি আজ সকালে আসিয়াছি,—সন্ন্যাসীর গুপ্তধনও কি পুলিসের লোককে দেখাইয়া আসিয়াছি?

পাঁ। না।

ক্ষি। কেবল আমি নই এখানে মা, মেজদাদা, বড়বৌ, মেজবৌ, সেজবৌ, ন'বৌমা সকলে অসিয়াছেন।

পাঁ। কেন?

ক্ষিতীশচন্দ্র যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাদের পারিবারিক যাবতীয় দুর্ঘটনার কথা হইতে তাঁহার বিংশসহস্র মুদ্রাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত কথা

পাঁচকড়ি শচীকে কোলে লইয়া বাড়ীর ভিতর উপনীত হইল—৩৭৩ পৃষ্ঠা।

The Emerald Printing Works,
6, Simla Street, Calcutta.

বলিলেন। শুনিয়া পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল,—"মা আমার জগতের জীবকে যে কি প্রকার ভাবে নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না! বাহিরে জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইয়াছে, বৃষ্টিও থামিয়া গিয়াছে। তবে চলুন, পুত্রহারা জনক জননীর ক্রোড়ে তাঁহাদের স্নেহের শচীকে দিই গে।"

পাঁচকড়ি শচীকে কোলে করিয়া লইল। তখন তিন ভ্রাতায় রামপ্রাণ বাবুর বাটী অভিমুখে গমন করিলেন।

শচীকে পাইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সেই পরিবারের মধ্যে সেদিন যে কি আনন্দ উচ্ছ্বাস ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। কল্পনায়—মনে মনে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

রামপ্রাণ বাবু সেই রাত্রেই দুইখানি নৌকা করিয়া দিলেন, যতীশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র পাঁচকড়িকে লইয়া কালীমূর্ত্তি ও ধনরত্ন বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বাগানে গমন করিলেন।

শচী পাঁচকড়ির সঙ্গে যাইবার জন্য বায়না লইয়াছিল, শচীর মা বলিলেন—"ঠাকুরপো তুমি লইয়া যাও—শচী আমার নয়, তোমার। একবার আমার বলিয়া হারাইয়াছিলাম—তুমি মরা ছেলে ফিরাইয়া আনিয়াছ; আর আমার বলিয়া অনর্থ ঘটাইব না। ও সকলের ধন। আমি একা আর কখনও উহাকে দাবী করিব না।" যাহা হউক শচী কষ্ট পাইবে বলিয়া পাঁচকড়ি আর তাহাকে লইয়া গেল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রামপ্রাণ বাবু অসীম পুলকিত হইলেন। দুইদিন সে বাড়ীতে মিলন মহোৎসব চলিল। বিষ্ণু সরকার সে উৎসবের প্রধান ঋত্বিক্।

চারি পাঁচ দিন পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন,—"তবে আমরা এখন বাড়ী যাই। গঙ্গাস্নান এবং একটি বিচ্ছিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুখ-

সম্মিলন হইল। ওদিকে তাহাদের নৌকা বোধহয় এতদিন বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমাদের এখানে আর আপাততঃ বিলম্ব করা উচিত নহে।"

রামপ্রাণবাবু সাশ্রুলোচনে বলিলেন,—"জগদীশ্বরের কৃপায় এমন ভাবে যে সকলের সম্মিলন হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এমন অসম্ভাবিত ঘটনা, মানুষ কল্পনাতেও আনিতে পারে না। সকলই মায়ের ইচ্ছা,—সকলেরই সংসার আছে, অতএব তোমাদের গমনে বাধা দিতে পারি না, কিন্তু এরূপ আনন্দ বুঝি জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই "

তৎপর দিবস দুই নৌকা প্রস্তুত হইল।

সকাল সকাল আহারাদির উদ্‌যোগ হইল। সকাল সকাল গঙ্গাস্নান সমাধা করিয়া ভোজন করিলেন। যাইবার সময় পরস্পর বিদায়ের সম্ভাষণ করিলেন। অবশেষে যতীশের মাতা, রামপ্রাণ বাবুও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"শুনিলাম, পাঁচকড়ি কালী-মূর্ত্তি আনিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিবে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা যাঁহাদের পবিত্র ও পুণ্যময় প্রভাবে আমাদের শুভমিলন ঘটিল, সেই বৈবাহিক ও বৈবাহিকা এতদুপলক্ষে যেন সে বাড়িতে পদার্পণ করেন।"

রামপ্রাণ বাবু স্বীকৃত হইলেন। শান্তি তাহার মাসী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাসী তাহার শিরঃচুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দানীশ রামপ্রাণ বাবুকে প্রণাম করিলেন। রামপ্রাণ বাবু একখানি রেজেষ্টারী করা দলিল দানীশের হাতে দিলেন দানীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,—"কন্যা জামাতার যৌতুক পত্র। তোমা-

দের দেশে তরফ মহিষবাথান, পনরখানা গ্রাম আমার জমিদারী ছিল,—কালেক্টরীর খাজনা দিয়া উহার বার্ষিক উপসত্ব পাঁচ হাজার টাকারও কিছু উপরে ; ঐ সম্পত্তি আমি তোমাকে যৌতুক দিলাম,—ওখানা সেই যৌতুক দান-পত্র।”

দানীশ বিস্ময় চকিত ও কৃতজ্ঞ নেত্রে রামপ্রাণবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিষ্ণু সরকার নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন,—“আপনার মত মহাপ্রাণের কার্য্যকলাপও অনুপম !”

রামপ্রাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—“আমি মহৎ কিসে? পথের লোককে যদি এ সম্পত্তি দিতাম, তাহা হইলে যাহা হয়, বলিতে পারিতেন। আমার পুত্র কৃতি, সে মাসিক তিন চারি হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা,—পঁচিশ হাজার পুত্রের জন্য রাখিলাম। দুই মেয়েকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার, আর শান্তিকে পাঁচ হাজার, এই পোনের হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়াছি।”

তারপর তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকূল বায়ুভরে নৌকা চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শোনপুরের সেই অসংস্কৃত অবসন্ন রায়বাড়ী আজ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। সমস্ত বাড়ীর সংস্কার হইয়াছে; সমস্ত বাড়ী শুভ্রোজ্জ্বল-কান্তি ধারণ করিয়াছে। চারি ভ্রাতা একপ্রাণ হইয়া সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছেন। পাঁচটি বধূ একই স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া সাংসারিক সমস্ত খাটুনী খাটিতেছে। সতীর দাম্পত্য-প্রণয় অসীম কাণ্ডার মধ্যপ্রবাহিতা নিঃশব্দবাহিনী নদীর ন্যায়, প্রতি দম্পতীর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। কর্ম্মের উদ্দীপ্ত চেতনা সেখানে পূর্ণরূপে প্রতি নরনারীর জীবনের হিল্লোলে কল্লোলে স্পন্দমান।

এইবার পাঁচকড়ির বিবাহের জন্য সকলে জিদ করিতেছিলেন। পাঁচকড়ি কিন্তু কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। সে বলিল—"মা যখন কামিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অর্থাৎ মাতৃ-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন, তখন আর নয় দাদা;—আর বাঁধিও না। আমি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছি,—মায়ের চরণ সেবা করিয়া আমাকে কৃতার্থ হইতে দাও। শচী আমার বংশধর।"

সন্ন্যাসীর সেই সপ্তকলসী স্বর্ণ মুদ্রার দুই কলসী শচীকে দেওয়া হইয়াছে,—শচীর পিতা তদ্দ্বারা জমীদারী কিনিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চকলস স্বর্ণমুদ্রা মায়ের! পাঁচকড়ি তাহা হইতে প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করাইল,—মন্দির-সংলগ্ন অতিথিশালা, দরিদ্রাবাস, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও এক বেদান্তের চতুষ্পাঠী খুলিয়া যথোপযুক্ত লোকজন রাখিয়া দিল। নিজে গৈরিক বসন পরিধান করিল, রুদ্রাক্ষমালা গলদেশে ধারণ করিল, অঙ্গে বিভূতি মাখিল, মাথায় জটা ধরিল।

মায়ের স্থায়ী সেবা চলিবার জন্য সেই অর্থ হইতে কিছু জমিদারী কিনিয়া দেবোত্তর সম্পত্তি করিল। আর নিজে দরিদ্র সেবাব্রত গ্রহণ করিল।

তাহাদের বিচ্ছিন্ন পরিবারের—বিশেষ শচীর—মিলন-স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই মন্দিরের পাদদেশে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া দিল—

"মিলন-মন্দির"

এক বৎসরের পরে মিলন-মন্দিরের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সে মহোৎসবে রামপ্রাণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আগমন করিলেন। যেখানে যে আত্মীয় কুটুম্ব ছিলেন, সকলকেই আনা হইয়াছিল। হরিচরণ, হরিচরণের স্ত্রী, হরিচরণের মাতাও আসিয়াছিলেন।

রামপ্রাণবাবু কালীভক্ত—তিনি সে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। মিলন-মন্দির মহামেঘপ্রভা দিগম্বরী মুক্তকেশী করালবদনা লোলরসনা চতুর্হস্তা কালী। মায়ের সম্মুখে পদ্মাসন করিয়া নবীন সাধক পাঁচকড়ি, —পাঁচকড়ির কেশ রুক্ষ জটাবদ্ধ, পরিধানে গৈরিকবসন, অঙ্গে বিভূতি, গলে রুদ্রাক্ষ, কপালে রক্তচন্দন। পাঁচকড়ির দক্ষিণে পুষ্পপাত্রে রক্ত-শ্বেত পীত বিবিধ বর্ণের পুষ্প-স্তূপ। বামভাগে পূজাদ্রব্য, দক্ষিণে সুবাসিতাম্বুপূর্ণ কুম্ভ। চতুর্দ্দিকে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। যজ্ঞধূপ ও ধূনার সুগন্ধী ধূমে মন্দির আমোদিত। বাহিরে নাটমন্দিরে—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মাতৃযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন,—কেহ হোম করিতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ জপ করিতেছেন, কেহ প্রাণায়াম-ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ সুরলয়-সংযোগে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে কুলনারীগণ হুলু ও শঙ্খধ্বনিতে দিগন্ত

মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। সিংহদ্বারে বাদকগণ বাদ্য করিতেছে, গায়কে মল্লারে মাতৃগাথা গাহিতেছে। রামপ্রাণবাবু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সকল দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন; বেড়াইতে বেড়াইতে একটা থামের নিকট এক ভক্তব্রাহ্মণ নয়নজলে বক্ষ্য ভাসাইতে ভাসাইতে মেঘমল্লারে একটি গান গাহিতেছে, শুনিতে পাইলেন! তিনি স্থিরকর্ণে সেখানে দাঁড়াইয়া গানটির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গাহিতেছিল,—

স্বরূপে বিরাজে বামা রসে নিমগন।
চেয়ে দেখ থেক না'ক' মুদে দু' নয়ন।
কেন মন—কেন ভ্রান্তি,
ল'য়ে তুচ্ছ কড়াক্রান্তি,
ল'য়ে পাপ ঈর্ষাদ্বেষ সদা অচেতন।
ভ্রমে মত্ত দৈত্য সব
কি ভীষণ জয়োৎসব,
দেব-নর-রক্তে বিশ্ব রক্তিম বরণ!
কুলকুণ্ডলিনী মা গো,
উঠ উঠ জাগো জাগো,
ধর ধর হৃদি-চক্র রক্ষ ত্রিভুবন।
রণে নাচে কে রূপসী
করে ছিন্নমুণ্ড অসি,
উলাঙ্গিনী মুক্তকেশী পদে ত্রিলোচন।

গান শুনিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া রামপ্রাণবাবু প্রসাদ বিতরণ দেখিতে গেলেন। দীন দরিদ্রে সে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র-সেবার

ঘরে স্তূপাকার অন্ন ব্যঞ্জন রক্ষিত। বড়বৌ, মেজবৌ সেজবৌ, ন'বৌ গাছকোমর বাঁধিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা, যতীশ, ক্ষিতীশ ও দানীশ সে অন্ন ব্যঞ্জন বিতরণ করিতেছে।

এইরূপ মহামহোৎসবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ স্ব স্ব আলয় প্রতিগমন করিলেন। আজ রামপ্রাণবাবু যাইবেন। তিনি তাহাদিগের কয় ভ্রাতা ও বধূদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি বাড়ী চলিলাম। তোমাদিগকে লইয়া বড় সুখেই ছিলাম, কিন্তু সেখানেও না গেলে নয়। যাই হোক্,—তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিব, মন দিয়া শুনিও। দেখ, তোমরা কেবল আপন আপন স্বার্থসিদ্ধি করিতে গিয়া এই সংসারটা কিরূপে ছারেখারে দিতে বসিয়াছিলে? লোকে মনে করে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলেই সুখে থাকিবে, তা নয়। পাঁচটা তৃণ একত্রে রাখিলে, একটা হাতী বাঁধা যায়। কিন্তু একটার বল অতি তুচ্ছ। মনে করিও না, তোমাদের সেই ঈর্ষাদ্বেষ—স্বার্থপরতার ফলে এই উন্নতি। হয় ত সে ভ্রান্তি আসিতে পারে। হয় ত কেহ মনে করিতে পার, আমরা যদি ছিন্ন ভিন্ন না হইতাম—কুটিল স্বার্থসাধনার জন্য তেমন কষ্টে না পড়িতাম, তবে হয় ত প্রত্যেকের এত অর্থপ্রাপ্তি, এত উন্নতি ঘটিত না। সে ধারণা কিন্তু ঘোর ভ্রান্তিধারণা। তোমরা যে পাপ করিয়াছিলে, তাহার উপযুক্ত কষ্ট পাইয়াছ—অনুতাপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তারপরে যাহার প্রাক্তনে যাহা ছিল সে তাহাই লাভ করিয়াছ।"

শচী মরিয়া দেখাইয়াছিল,—কাহার জন্য সঞ্চয়? যাহার জন্য সঞ্চয় করিয়া অপরকে কষ্ট দিবে—সে যে, মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইতে পারে; শত চেষ্টাতেও তাহাকে যে ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে না, শচী

তাহাই দেখাইয়াছে। তারপর, অদৃষ্টই সকলের মূল,—যাহার যেমন অদৃষ্ট সে তেমনিই লাভ করিবে। নতুবা শচী দুই কলসী স্বর্ণমুদ্রা পাইবে কেন? তোমরা কি কেহ তাহার জন্যে অত সঞ্চয় করিতে পারিতে?

পাঁচকড়ি তোমাদের বংশের তিলক। তাহারই সংযম-বলে আজি জঙ্গলের কালী তোমাদের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাহারই মাতৃ-সাধনার বলে,— মা তোমাদের বাস্তুভিটায় প্রতিষ্ঠিত!

অতঃপর সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। তখন তিনি সস্ত্রীক ভৃত্যাদি লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বড়বৌ স্থায়ীভাবে ঠাকুরবাড়ীর কার্য্যভার গ্রহণ করিল। যদিও দেবীমন্দিরে অনেকগুলি দাস দাসী ছিল; তথাপি বড়বৌ সর্ব্বত্র। মন্দির মার্জ্জনা, নাটমন্দির পরিষ্কার করা, নির্ম্মাল্য ফেলা, রোগীদিগের পথ্য রাঁধা সকল কার্য্যই বড়বৌ স্বহস্তে করিত।

পাঁচকড়ি মায়ের নিত্য উপাসনা করিত,—তদ্ব্যতীত—একজন পূজক ব্রাহ্মণও নিযুক্ত হইয়াছিল।

পাঁচকড়ি দানীশকে বলিল,—"ন'দাদা, মায়ের ইচ্ছায় বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি পাইয়াছ। বাসনাটা বড় বদ জিনিষ, তাকে যত বাড়াইবে, সে ততই বাড়্‌তে থাক্‌বে,—আর চাক্‌রী-বাক্‌রি কোরে কি হবে? মায়ের টাকা কিছু নিয়া কলিকাতায় যান—কিছু ওষুধপত্র আর যন্ত্রপাতি এনে মন্দিরে সমাগত মায়ের পীড়িত সন্তানগণের সেবা করুন।"

দানীশ স্বীকৃত হইলেন, এবং কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে দানীশকে গৃহমধ্যে পাইয়া, মৃদু হাসিয়া ন'বৌ বলিল, "রাত্রের গাড়ীতে নাকি কলিকাতায় যাওয়া হবে?"

দানীশ মৃদু হাসিলেন। বলিলেন,—"হাঁ, আপত্তি আছে নাকি?"

ন। আপত্তি নাই, ভয় আছে!

দা। কিসের?

ন। কলের জলের। সে নাকি বড় পরিষ্কার।

পা দা। কলের জল পরিষ্কার বটে, কিন্তু অন্তর সার-শূন্য। তবে নদীর জল কূল ভাঙ্গিয়া কোথায় কখন ছুটিয়া যায়, সেই যা ভাবনা!

ন। যখন তার সমুদ্র তার পানে ফিরিয়া না চায়, তখন সে কাজেই কূল ছাড়িয়া সমুদ্রের জন্য ছুটিয়া বাহির হয়। না গেলে, কে আনিত? কলের জলের লোভ থেকে ছাড়িয়ে আনিবার সাধ্য কাহারও ছিল না!

দানীশ সেই অনন্দি-সুন্দর প্রফুল্ল গণ্ডে একটা প্রীতি-চুম্বন দিয়া বলিলেন,—"ঝাড়ে যদি কলা না পড়িত, তবে ফকিরের ফুঁকের গুণ কোথায় থাকিত!"

ন'বৌ হাসিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কবে আসিবে?"

দা। কা'ল রাত্রের গাড়ীতে আসিব।

ন। তোমার সেই ডাক্তারখানায় যাবে নাকি?

দা। অবস্থাটা একবার দেখিয়া আসিব—আর পারি যদি একটা ব্যবস্থা করিয়া আসিব।

ন। সেখানে যে রোগী আছে,—সে রোগীর ওষুধ দিতে হবে ত?

দা। সে এখন ডাক্তারী ওষুধ চায় না—পেঁচোর অবধৌতিক ওষুধ চায়।

ন। (হাসিয়া) শচীর কাছে নেবে না? যাই হোক্, শিক্ষার কুহকে আবার যেন ভেড়া না বানায়।

দানীশ হাসিয়া বলিলেন,—"আর নেড়া বেল তলায় যায় না। এখন গাড়ীর সময় হইল,—চলিলাম।"

দানীশ বিদায় হইলেন। ন'বৌর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল!

ঠিক প্রভাত কালে যে গাড়ীতে দানীশ ছিলেন, তাহা কলিকাতায় গিয়া পৌঁছিল। দানীশ গাড়ী হইতে নামিয়া বহুবাজারে গমন করিলেন। তাঁহার ডাক্তারখানায় কেবল মাত্র দরজা খোলা হইতেছিল

ভৃত্য সেলাম করিল। একজন কম্পাউণ্ডার অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

দানীশ তাহাকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঔষধালয়ের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল,—"আপনি আসিলেন না,—দুই তিন খানা পত্র লিখিয়াও উত্তর পাইলাম না, তখন অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিয়া কেবল ঐ ভৃত্যটিকে রাখিয়া আমি একরূপ করিয়া ঔষধালয়টি চালাইয়া আসিতেছি। আমাদের খরচা ও বেতন বাদে টাকা শ' আষ্টেক লাভ হইয়াছে। আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, যুথিকা বিবি সেই সময়ই তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"

দানীশ ঔষধালয়ে সন্ধান করিয়া দেখিলেন, যে সকল ঔষধ যে সকল অস্ত্র শস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা তাহাদের মিলন-মন্দিরের চিকিৎসালয়ের কার্য্য চলিতে পারিবে। তিনি সেই কম্পাউণ্ডারকে ও ভৃত্যকে ঔষধগুলির সহিত বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন,—তাহারা স্বীকৃত হইল এবং আদিষ্ট হইয়া ঔষধাদি প্যাক করিয়া ষ্টেশনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া দিয়া একখানি গাড়ী করিয়া দানীশচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। স্নানান্তে যখন গাড়ীতে উঠিবেন, সেই সময় দেখিলেন,—গঙ্গাতটস্থ বাঁধাঘাটের এক পার্শ্বে এক উন্মাদিনী বসিয়া আছে, অনেকগুলি বালক বালিকা তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। দানীশ তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন—সে যুথিকা।

পা যুথিকা উন্মাদিনী—তাহার চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট এবং অনলবর্ষী। সেই চম্পকসদৃশ বর্ণ এখন নিমলিন হইয়া গিয়াছে। নবনীত কোমল-

দেহ শুকাইয়া কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সাহিত্য-জ্ঞান, সঙ্গীত-জ্ঞান—রূপ রস শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত! দানীশ তাহার নিকটে গেলেও সে চিনিতে পারিল না।—চিনিতে পারিলে অবশ্য তাহার কিছু ভাবান্তর ঘটিত, অবশ্যই কিছু না কিছু বলিত।—কিন্তু সে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিল না—তাঁহার পানে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলও না।

সেই পবিত্র বারিকল্লোল মুখরা ভাগীরথি-সৈকতে বহুজনসমাকীর্ণ তট সন্নিধানে দাঁড়াইয়া যুথিকাকে দেখিয়া দেখিয়া দানীশের মনে এক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল! তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—কোথায় গেল সেই ভালবাসা? যে রূপ দেখিয়া, গান শুনিয়া বাহ্যিক গুণে মুগ্ধ হইয়া যুথিকার প্রতি আমার যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? যুথিকার রূপ ছিল, গুণ ছিল, বয়স ছিল, মন মজান নয়ন-ভঙ্গী ছিল, কথার মাধুর্য্য ছিল,—তাই তাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতাম,—এখন সে সকল চলিয়া গিয়াছে! রূপ গিয়াছে—গুণ গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালবাসাও গিয়াছে! তবে? 'তবে কি ভালবাসার স্থায়িত্ব নাই?' গঙ্গাতট হইতে উদাস সমীর 'তপ তপ' শব্দায়মান হইয়া সে কথার উত্তর প্রদান করিল। সমীরণ বলিয়া দিল—"রূপ জড়, গুণও জড়। চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে জড়ে আকর্ষণ করিতে পারিবে কেন? সুন্দর মুখ দেখিয়া পাগল হইয়াছিলে, গুণের জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলে,—উভয়ই জড়, প্রকৃতি জড়াত্মিকা। গোটাকতক জড় পরমাণু কি জীবাত্মাকে বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত করিতে পারে? কখনই নহে! ঐ জড়ের অন্তরালে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত আছে—ঐশ্বরিক প্রেমের লহর বহিয়া যাইতেছে। মানব! তপস্যা কর বুঝিতে পারিবে, সে যেন এক বৃহৎ চুম্বক পাথর,—আর তোমরা যে

লৌহচূর্ণ! তোমরা সবাই সদা সর্ব্বদা তদ্দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছ! সকলেই তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু অর্গল ঐ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়ী প্রকৃতি। প্রকৃতিকে যত দিন কামিনী বলিয়া মনে করিবে—তাঁহাকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে, তত দিন সেই জড়বাহুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের অনুকম্পাহীন ক্ষমতাধীন হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা সহিবে। তারপরে যে দিন জায়াকে জননী বলিয়া ডাকিবে—সেই দিন তাঁহারও কার্য্য শেষ হইবে। তখনই স্বরূপ প্রেমের স্বরূপানন্দ লাভে সক্ষম হইবে।”

বাতাস ফিরিয়া গেল। দানীশ পাগলিনীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

যুথিকার বাহ্যজ্ঞান আদৌ ছিল না। সে আপন মনে কত কথা বলিতেছিল। কখন হাসিতেছিল, কখনও কাঁদিতেছিল, কখনও বা নিস্তব্ধ থাকিতেছিল। দানীশ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সে বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার উন্মাদ-নয়নদ্বয় হইতে জলধারা বহিল। সে উদাস-উন্মাদ স্বরে বলিয়া উঠিল,—“পাঁচকড়ি, প্রাণের পাঁচকড়ি,—আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি। আমি পিশাচী,—এস বঁধু, এস এস। আঁচল চিরিয়া তোমার বসিবার আসন করিয়াছি। তোমাকে ভালবাসি—ফুলের মত ভালবাসি, পাখীর মত ভালবাসি—ক্ষুদ্র শিশুর মত ভালবাসি,—কিন্তু তবু খুব ভালবাসি, বোধ হয় এত ভালবাসা আর কাহাকে বাসিনি। আর তোমার কি যত দুষ্টুমি কেবল আমারই কাছে? আবার দোষও চাপাইয়া গেলে আমার ঘাড়ে? হাঃ হাঃ যাচ্চি যাচ্চি—ধচ্চি তোমায়, দাঁড়াও—পালাবে কোথায়?”

যুথিকা তট বহিয়া ছুটিয়া চলিল। অশান্ত বালকেরা “ঐরে পাগলী পালাল”—বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বা কাদা তুলিয়া ছুড়িল।

দানীশ তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। ক্ষুণ্ণ-কাতর প্রাণে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

সেই দিন রাত্রেই তাঁহারা ডাক্তারখানার ঔষধাদি লইয়া শোণপুর যাত্রা করিলেন। অতঃপর দানীশ পাঁচকড়ির মিলন-মন্দিরের রোগীর চিকিৎসা করিবার জন্য জীবনের সমস্ত শক্তি সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের স্ত্রীশিক্ষামূলক, নানা উপদেশপূর্ণ

আর একখানি নূতন মূল্যবান গ্রন্থ

কুললক্ষ্মী।

কি করিয়া আমাদের বালিকারা লক্ষ্মীস্বরূপা হইতে পারেন, এবং স্বামী-গৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন করিয়া কুললক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া যে রমণী ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাঁহাকে আর শ্বশুরগৃহে গমন করিয়া কাহারও অনাদর সহ্য করিতে হইবে না। পুস্তকখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে, স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে, কাহাকে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলে তাহাও বুঝান হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে, স্ত্রীলোকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তৃতীয় ভাগে তাহাদের কি কি দোষ সতর্কতার সহিত পরিত্যাজ্য, চতুর্থে, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনের প্রতি কি কি কর্ত্তব্য এবং স্বামী-স্ত্রীর কি সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চমে, মূল মহাভারতে যে সকল স্ত্রীধর্ম্মের ও স্ত্রীনীতির উল্লেখ আছে, (যাহা কাশীদাসে নাই) তাহা অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি পড়িলে স্ত্রীলোকেরা আর আধুনিক সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া যাইবেন না। উত্তম এণ্টিক কাগজে, উত্তম ছাপা। মূল্য অতি সুলভ, ‌॥৵০ দশ আনা মাত্র। কাপড়ে বাঁধা ৸০ বার আনা।

সাবিত্রী-সত্যবান্ !

এতদিন উত্তর, এত নৈরাশ্য ফল আকাঙ্ক্ষার পরে প্রাণে

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত ভূমিকাসহ

বাহির হইল ! পুর

বঙ্গ-ললনাদের মনোরঞ্জনার্থে অনেক অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও চেষ্টা

করিয়া আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

এরূপ আর হয় নাই, এত নূতনত্ব আর দেখেন নাই।

সত্বর গ্রহণ করুন—বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—প্রকাশক।

যদি আপনার গৃহিণীকে রমণীকুল-শিরোমণি দেখিতে চান,

যদি আপনার কুল-লক্ষ্মীদিগকে পতিব্রতা, সুশিক্ষিতা

এবং আদর্শচরিত্রা করিতে ইচ্ছা থাকে,

তবে এই গ্রন্থ সত্বর উপহার দিন।

বিবাহ অথবা অন্যান্য উৎসবাদি

উপলক্ষে

উপহার দিবার এতদপেক্ষা সুলভ ও সর্ববজনপ্রিয় সামগ্রী নাই।

গ্রন্থের আগাগোড়া চিত্রমণ্ডিত-ছবির উপর ছবি !

চিত্রমণ্ডিত চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কাপড়ে বাঁধা মলাট !

এই পুস্তকের আকার—১৬ পেজী ডবল ক্রাউন ২২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ !

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ-ব্লু কালিতে ছাপা !

যেরূপ আয়োজন, তৎপরিমাণে মূল্য অতি সুলভ,

দেড় ১॥০ টাকা মাত্র।